উত্তর মেরু

দক্ষিণ মেরু

ভূ-পর্যটক

বিমল দে

উত্তর মেরু
ও
দক্ষিণ মেরু

ভূ-পর্যটক বিমল দে

পরিব্রাজক
এ্যান্ড্রুজ পল্লী, শান্তিনিকেতন
বীরভূম

ভূমিকা

ছোটবেলায় প্রথম ভূগোল ক্লাসে শুনেছিলাম যে, এই পৃথিবীটা গোল, পৃথিবীটা ঘুরছে, ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কখনো সূর্যের মাথার ওপর উঠছে আবার ঘুরতে ঘুরতে সূর্য্যের নীচের দিকে নেমে আসছে। সোজা কথা সূর্য একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীটা তার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরছে। পৃথিবীটা একটু হেলে আছে তাই চারপাশে ঘুরলেও সূর্যের উত্তাপ সবজায়গায় সমানভাবে পড়ছে না, সেই কারণে বছরের এক সময় পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সূর্যের তাপ বেশি পড়ছে, আর উত্তর গোলার্দ্ধে সেই সময় সূর্যের তাপ কম পড়ছে। আবার একই বছরে ঠিক উল্টো অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সূর্যের তাপ কম পড়ছে আর উত্তর গোলার্দ্ধে তখন সূর্যের তাপ বেশি পড়ছে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে হচ্ছে দিন-রাত আর ঋতু পরিবর্তন, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

মাস্টার মশাইয়ের কাছে ব্যাপারটা অতি সোজা অঙ্কের মত সহজ। এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই, আর আমার কাছে ঠিক উল্টো। বার বার গঙ্গার ঘাটে সূর্যাস্ত দেখার সময় মাস্টার মশায়ের কথাটাকে আমি কিছুতেই মানতে পারিনি। চোখের সামনে দেখছি সূর্যাস্ত—সূর্য্য উঠছে আর নামছে অথচ ভূগোলে পড়ছি সূর্য দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী চলছে। মনের সন্দেহ ও দ্বিধাকে দূর করবার জন্য মাস্টার মশাইকে আর বিরক্ত করিনি। অবশ্য ভয়ও ছিল কারণ প্রায়ই আমার বোকামী প্রশ্নের জন্য ক্লাসের ছেলেদের কাছে আমি বেকুব হয়েছি।

বেশ কিছুদিন পর ট্রেনে করে যাচ্ছি। একটা স্টেশনে ট্রেন থেমে আবার চলতে শুরু করল। আমি বসেছিলাম জানলার ধারে। আশ্চর্য হয়ে দেখি যে স্টেশনটা যেন হঠাৎ চলতে শুরু করেছে। আমি তাড়াতাড়ি জানলার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। চোখের সামনেই দেখছি স্টেশন শুদ্ধ সব মানুষগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, অদ্ভুৎ বটে! তারপর যখন স্টেশনটা শেষ হয়ে গেল তখন ট্রেনের শব্দে ও ঝাকানিতে বুঝলাম যে স্টেশন নয় আমাদের ট্রেনটাই এগোচ্ছে। ট্রেনটা এত স্মুথ স্টার্ট নিয়েছে যাতে মনেই হয়নি যে ট্রেনটা চলছে। সেইদিনই সূর্যাস্তের ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝলাম। ধরে নিলাম আমাদের পৃথিবীটা বিনা শব্দে খুব স্মুথ স্টার্ট নিয়েছে এবং চলছে তাই মনে হচ্ছে সূর্যটাই যেন যাচ্ছে।

কি আনন্দ একটা নতুন দিক পেলাম। স্কুলে ভূগোল ক্লাসটাই ছিল আমার কাছে একঘেয়েমীর। মনের শত প্রশ্নের কোন জবাবই পেতাম না। সূর্যের আলোর অভাবে শীত ও বরফে ঢাকা পড়েছে নর্থপোল ও সাউথ পোল। ভূগোল ক্লাসে অবাক হয়ে

শুনতাম ভারী আশ্চর্য লেগেছিল সেদিনকার কথাগুলো। দুঃখের বিষয় যে সে সময় কোন ভূমণ্ডলের মডেল আমাদের স্কুলে ছিল না।

তারপর আস্তে আস্তে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। পরিণত বয়সে সঠিক ব্যাখ্যা ও মনের মতো উত্তর খুঁজে পেয়েছি তা সত্ত্বেও বার বার টেনেছে সেই অবাক করা বরফে ঢাকা দুই কেন্দ্র—নর্থ পোল ও সাউথ পোল। নিজের চোখে দেখা আর সেই আবহাওয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার জন্য বার বার সেদিকে পা বাড়িয়েছি।

আমার এই লেখা ভুগোল শিক্ষার জন্য নয়, কাউকে উপদেশ বা জ্ঞান দেবার ক্ষমতাও আমার নেই। এই লেখাটা আমার অন্যান্য লেখার মতোই পর্যটকের ডায়েরি মাত্র। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই লিখেছি। এটা আমার অভিযান বা বাহবাধর্মী লেখা নয়। কিন্তু উপযুক্ত ভাষার অভাবে আমি অভিযাত্রী কথাটাকে উপেক্ষা করতে পারিনি তার জন্য নিজের কাছে নিজেই অপরাধী।

উত্তর খণ্ডে বেশ কয়েকবারই গিয়েছি। আলাস্কা, আইস্‌ল্যান্ড, গ্রীণল্যান্ড সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমার ডায়েরির বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক কথাই না-বলা থেকে গেছে তাই আমি উত্তরমেরুর আরও কিছু তথ্য এই লেখায় যুক্ত করলাম।

দক্ষিণ মেরুর অভিজ্ঞতা ও বিবরণ এই লেখার মূল উদ্দেশ্য। ভ্রমণপিপাশু বন্ধুদের জন্য তাই প্রকাশিত হ'ল "দুই মেরু"। একই বইয়ে পাওয়া যাবে দুই মেরুর কিছু তথ্য।

সূচীপত্র

উত্তর মেরু
সাইবেরিয়া

[পথ : জেনেভা - ওয়ার্শ - এখতারিণবুর্গ (রাশিয়া) - ইর্কুট্‌স্‌ক (সাইবেরিয়া)
নোরিল্‌স্‌ক্‌ (সাইবেরিয়া) - নোভোসিবিরিস্‌ক্‌ (সাইবেরিয়া)
ফ্রাংকফুর্ট - জুরিখ্‌ - জেনেভা]

[GENEVA–WARSAW–EKHTARINBURG (RASSIA) –
IRKUTSK (SIBERIA) – NORILSK (SIBERIA) –
NOVOSIBIRKS (SIBERIA) –
FRANKFURT – ZURICH – GENEVA]

অক্টোবর ২৮, ১৯৯৭ — নভেম্বর ২৭, ১৯৯৭
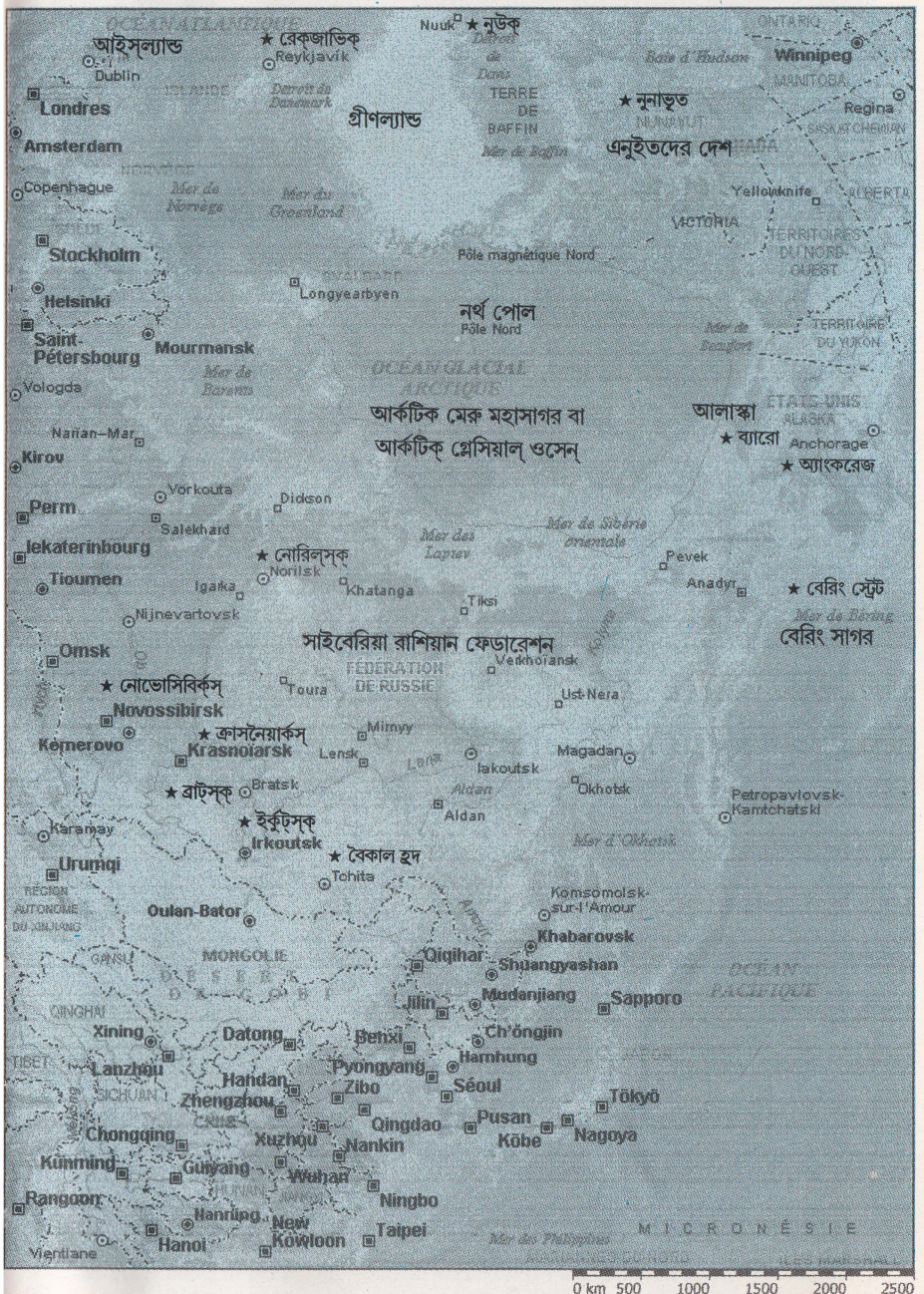
সাইবেরিয়া ও উত্তর মেরু-বিভিন্ন সময়ে ভূ-পর্যটক বিমল দের ভ্রমণস্থান

বরফে ঢাকা নোরিল্‌ক্‌স্‌ এর একটি ইস্পাত কারখানা

দারুণ শীতে যখন সাইবেরিয়ার নদীগুলো জমে যায় তখন নদীগুলো পরিণত হয় রাস্তায়। বড় বড় প্লেন ও হেলিকপ্টার এবং স্কীইং ট্রাক যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করে
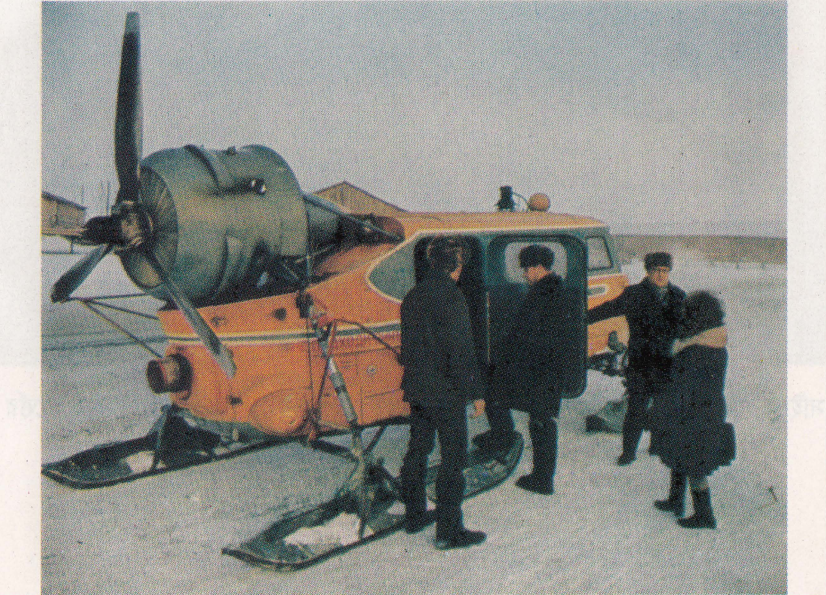
সাইবেরিয়ায় যখন নদীর জল জমে বরফে পরিণত হয় তখন সেই বরফ ফুটো করে গর্তের মুখে বসে তারা মাছ ধরে। ছবিতে একটি দোল্‌গান এস্কিমো ট্রাউট মাছ ধরছে
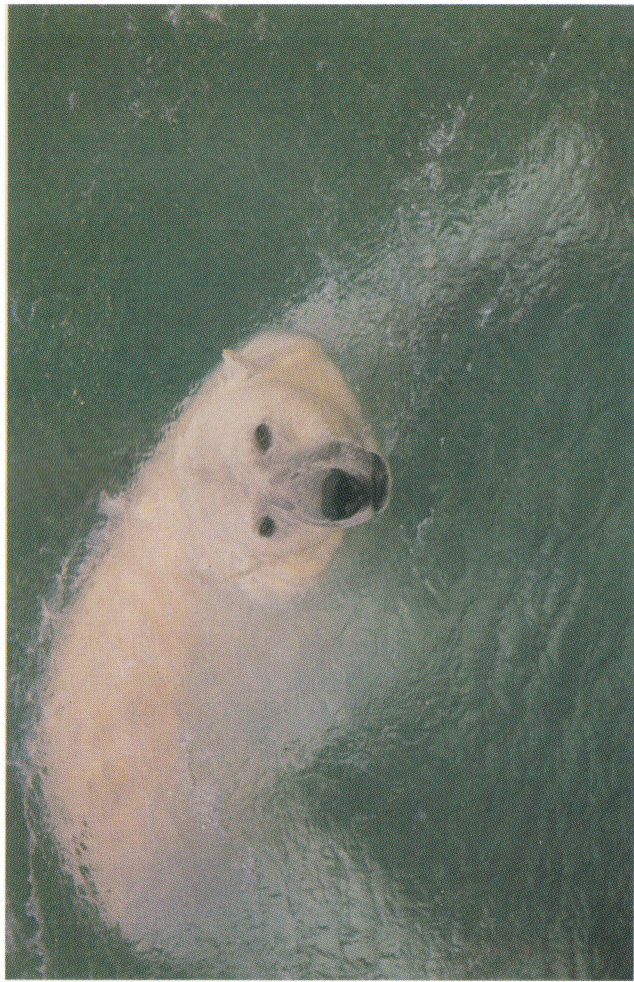
মাছের সন্ধানে বরফগলা জলে সাঁতার কাটছে শ্বেত ভল্লুক
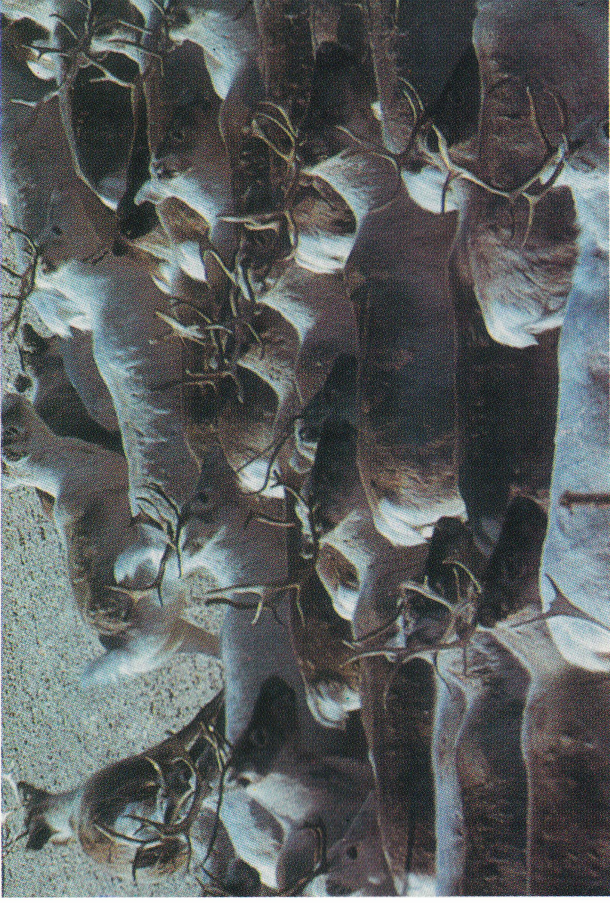
সাইবেরিয়ায় একটি বল্গা হরিণের ফার্ম

উত্তর মেরু ও তার বাসিন্দা

উত্তর মেরু বা আর্কটিক সারকেল। উত্তর গোলার্দ্ধে ৬৬.৩২ ডিগ্রীতে। দ্রাঘিমাংশের ৬৬° থেকে শুরু করে তার উত্তরে সাধারণতঃ কোনো গাছপালা নেই। এই আর্কটিক সারকেলের আরও উত্তরে ৮০° দ্রাঘিমাংশে রয়েছে পোলার সারকেল। এই পোলার সারকেল থেকেই কল্পিত অক্ষাংশ রেখা শুরু হয়েছে। আমি আর্কটিক সারকেলকে বলবো উত্তর মেরু রেখা, পোলার সারকেলকে বলবো মেরুবৃত্ত আর নর্থপোলকে বলবো মেরুকেন্দ্র। উত্তরের আর্কটিক সারকেল (৬৬.৩২° ল্যাটিচুড) পৃথিবীর চারদিকে ঘুড়ছে আর যে সব দেশ এই মেরুরেখাকে স্পর্শ করেছে তাদেরই সাধারণতঃ বলা হয় এস্কিমোদের দেশ। এই দেশের বাসিন্দাদেরই এক কথায় বলা হয় এস্কিমো। চিরতুষারের যাযাবর।

উত্তরের এই মেরু রেখা নিম্নলিখিত দেশগুলো স্পর্শ করেছে, ইউরোপের আইস্ল্যান্ড, গ্রীণল্যান্ড, নরওয়ে ফিনল্যান্ড, রাশিয়া, আলাস্কা ও কানাডা। নর্থপোলে সাধারণতঃ চারমাস পুরো রাত্রি, চারমাস পুরো দিন আর চারমাস দিনরাত্রি প্রায় সমান। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়া সরাসরি উত্তর মেরু রেখা স্পর্শ করেছে বলে সেখানে যাতায়াত করার সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু দক্ষিণ মেরু রেখা বা মেরুবৃত্ত কোন স্থলভাগ সরাসরি স্পর্শ করেনি। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর দক্ষিণ মেরুকে সম্পূর্ণ দেশ ও জাতির আওতার বাইরে রেখেছে। দক্ষিণ মেরুতে এস্কিমোদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তিমি মাছ, সীল, সিন্ধুঘোটক দুই মেরুতেই আছে আর আছে অফুরন্ত মাছ। পেংগুইন দক্ষিণ মেরুর এক প্রধান আকর্ষণ। সরাসরি কোন দেশ দক্ষিণমেরু স্পর্শ না করাতে আজও যাতায়াত ব্যবস্থা সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। দক্ষিণ মেরুতে যেতে হলে চাই ব্যক্তিগত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা। উত্তর মেরুতে যাতায়াত সমস্যা অর্থাৎ যানবাহন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বহু বছর আগেই। আমি নিজেও গিয়েছি কয়েকবার। আইসল্যাণ্ডের উত্তরাংশ আর্কটিক সারকেল ছুয়েছে যেখানে সেখানে দুবার গিয়েছি। গ্রীণল্যাণ্ড ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের এক্সিমোদের সাথে থাকারও সৌভাগ্য হয়েছিল। বলতে গেলে নর্থপোল আজকাল অটোরুটে পরিণত হয়েছে। নর্থপোল আমাদের মুখস্ত কিন্তু এক্সিমোদের কথা আমরা খুব বেশী বলি না।

নর্থপোলের অধিবাসী এস্কিমোরা চিরতুষারের বাসিন্দা। সহজ, সরল ও শিকারী। দক্ষিণের ক্ষমতা ও রাজ্যলোভী মানুষগুলো আস্তে আস্তে উত্তরের দেশগুলোকে করায়ত্ব করে এস্কিমোদের উদ্বাস্ত করেছে। তাই আজকাল এস্কিমোরা আছে বটে কিন্তু তাদের নিজস্ব দেশ বলে কিছু নেই। এস্কিমোদের নিজস্ব দেশ, রাজ্য, রাজধানী

সেনাবাহিনী কোনোদিনই ছিল না। তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাতের কথাও কেউ শোনেনি। মাছ আর বরুফে জন্তু শিকার করাই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। শিকারের জন্যই তাদের স্থান পরিবর্তন। বরফ কেটে ইগ্‌লু তৈরী করতো থাকার জন্য। আসল কথা এস্কিমো মাত্রেই যাবাবর। এস্কিমোদের নিজস্ব সীমাবদ্ধ জায়গা না থাকলেও তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় আজও আছে। স্থানভেদে তাদের নামও আলাদা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় গুলোর নাম আমার চোখে যেমন ধরা পড়েছে তেমনি লিখছি।

গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমোদের নাম ইনুইট (INUIT), আইস্‌ল্যাণ্ড আর্কটিক সারক্‌ল স্পর্শ করেছে বটে কিন্তু সেখানে কোন এস্কিমোদের বসবাস ছিল না আর আজও নেই। উত্তর কানাডার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড অঞ্চলের এস্কিমোরাও এই ইনুইট্ সম্প্রদায়ভুক্ত। কানাডার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এস্কিমোরা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা এ্যাসোসিয়েসন তৈরী করেছে। তার নাম ডেনে নেশন এ্যান্ড মেটিস্ অ্যাসোসিয়েসন (DENE NATION AND METIS ASSOCIATION) তাদের মধ্যে আছে চিপেউইয়ান (CHIPEWYAN), ডোগ্রিব (DOGRIB), হারে (HARE), লুচো (LUCHEUX) এবং ইনুভিয়ালুইত (INUVIALUIT) সম্প্রদায়।

আলাস্কার এস্কিমোদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তানানা কুচিন (TANANA KUTCHIN), কোইউকোন (KOYUKON), ইউপিক (YUPIK), আলেউত্ (ALEUT) এবং ইনুইপিয়াত (INUIPIAT)। আলাস্কার পর বেরিং স্ট্রেট পাড় হয়েই পড়ল রাশিয়া। বেরিং স্ট্রেটের দক্ষিণাংশে বেরিং সী আর উত্তরাংশের নাম চুক্‌চি সী (CHUKCHI)। পেনিনসুলাকে বলে চুক্‌চি পেনিনসুলা আর এস্কিমো সম্প্রদায়ের নাম চুক্‌চি (CHUKCHI)। রাশিয়ার আর্কটিক্ সারকেল ধরে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ইয়াকুট (YAKUT) ও ইউকাঘির (YUKAGHIR) সম্প্রদায়। তারপর দল্যান ও নেনেত (DOLAN, NENET) অর্থাৎ সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ থেকে আরম্ভ করে ফিন্‌ল্যাণ্ড পর্যন্ত নেনেত্ এস্কিমোদের বিরাট এলাকা। ফিন্‌ল্যাণ্ড ও নরওয়ের উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ডের আদিবাসীরা আসলে সবাইই এস্কিমো। তাদের মধ্যে সামি (SAAMI) সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

আর্কটিক সারকেল ধরে কেউ যদি পৃথিবীর উত্তরাংশ প্রদক্ষিণ করে তাহলে এই সব এস্কিমো সম্প্রদায়ের সাথে পরিচিত হতে বাধ্য। তাদের ভাষাও আলাদা তবে আগেই বলেছি যে তারা বরফের যাযাবর তাদের নির্দিষ্ট দেশ নেই। আগে ছিল কিনা সে বিষয়ে মতান্তর আছে। আজকাল এ বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে।

আমি এস্কিমোদের প্রসঙ্গে আমার ডায়েরী সুদূরের পিয়াসীতে লিখেছি তাতে শুধু তাদের শিকার ও জীবনযাত্রার সামান্য অংশ স্থান পেয়েছে। তাদের মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না তাই লিখিনি। আমার ভূ-পর্যটন কালীন ডায়েরীতে অজ্ঞতাবশতঃ অনেক কিছুই লেখা হয়নি। তাই এই অংশে

এস্কিমোদের কিছু না বলা কাহিনী লিখবার সুযোগ হারাবো না। আমি ১৯৭২ সালের পর ল্যাপল্যাণ্ড, এলেসমোর দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা ও সাইবেরিয়ার বহু অংশে ঘুড়েছি। এস্কিমোদের সম্পর্কে আরও জেনেছি তাই তাদের অধিকার ও দাবী সম্পর্কে কিছু জানাই। আমার মত যারা পর্যটক এবং এস্কিমোপ্রেমিক তারা এখন সবাইই একমত যে আর্কটিক সম্পর্কে কিছু লিখলে অবশ্যই যেন এস্কিমোদের বর্তমান দাবীগুলোর কথা উল্লেখ করি এটা বিশ্বমানাবাধিকারের পর্যায়েই পড়ে। আমরা পর্যটক—আমরা রাজনীতির ধার ধারি না তবে চলার পথে যা চোখে পড়ে তাকে এড়ানো ঠিক নয়। ১৯৯৪ সালে আলাস্কা থেকে বেরিং স্ট্রেট পাড় হয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য ঘুরে আসি সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত চুক্‌চি পেনিন্‌সুলা। বলাই বাহুল্য যে আজকাল রাশিয়ায় যাওয়া আগের মত কষ্টকর কিছু নয়। ভিসা এবং সীমান্ত সমস্যা অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। উত্তরখণ্ডে এস্কিমোরা আস্তে আস্তে দলবদ্ধ হচ্ছে উত্তর মেরুর বাসিন্দা তথা সমগ্র এস্কিমো সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হয়ে বিরাট এস্কিমোদের দেশ দাবী করছে। তাদের ইচ্ছা এক অখণ্ড এস্কিমো দেশ গঠন করা। আলাস্কার এস্কিমো, কানাডার এস্কিমো এবং গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমোরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের এ্যাসোসিয়েশন তৈরী করেছে। কানাডা সরকার এস্কিমোদের নাম পাল্টে দিয়ে তাদের বলছে ইউকান ইণ্ডিয়ান, কাউন্সিল অফ্ ইউকান ইণ্ডিয়ান, সরকারী সংঘ। এই সংস্থা ইউকান ইণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন ধরনের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়ীত্ব নিয়েছে। উত্তর কানাডার বফর সী (Beaufort Sea) অঞ্চলে কোপে নামে আর একটি সংস্থা, সে অঞ্চলে এস্কিমোদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধার বন্দোবস্ত করেছে। কোপে'র সম্পূর্ণ নাম COPE Committee for Original Peoples Entitlement. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার আলাস্কায় খুঁজে পেয়েছে অফুরন্ত তেলের খনি, আর সেই সাথে গ্যাস ও দুর্মূল্য খনিজ পদার্থ। এস্কিমোরা যাতে কোনদিন প্রতিবাদ না করতে পারে তার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দান করেছে ৯৬২ মিলিয়ন ডলার আর তার সাথে এস্কিমোদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে ৪৪ মিলিয়ন একর জমি। এই সম্পূর্ণ অর্থ ও জমি এস্কিমোদের তৈরি ১৩টি রিজিওনাল কর্পোরেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই বিরাট সহযোগিতার জন্য আলাস্কার এস্কিমোরা মনে হয় কোনোদিনই স্বাধীন রাজ্য দাবী করবে না। গ্রীণল্যাণ্ড স্বাধীন দেশ নয়, এটি ডেনমার্কের অধীনে। ১৯৭৯ সাল থেকে গ্রীণল্যাণ্ডের অধিবাসীরাই (এস্কিমো) সম্পূর্ণ দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশুনা করছে বিশেষ করে মাছের ব্যবসা, বিভিন্ন ধরনের কারখানা ও গবাদি পশুর উৎপাদন আমদানী ও রপ্তানী, সম্পূর্ণ দায়ীত্বই গ্রীণল্যাণ্ডের অধিবাসী এস্কিমোদের হাতে। তবে দেশের বৈদেশিক নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডেনমার্কের অধীনে।

নরওয়ে সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের এস্কিমোদের বলা হয় ল্যাপ্। তাই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তরাংশকে বলা হয় ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড। আদিবাসী এস্কিমোদের নাম সামী। ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সবাই সরকারী উন্নয়ন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে,

তারা সবাইই নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসী হিসেবে গণ্য। খুব শীঘ্রই তাদের সামাজিক ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে যাবে।

উত্তরখণ্ডে, এস্কিমোদের মধ্যে যারা সত্যিকারের অবহেলিত ও সব রকমের সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত তারা হচ্ছে রাশিয়ার এস্কিমোরা। রাশিয়া অর্থাৎ নতুন রাশিয়া সৃষ্টির পরও আজ পর্যন্ত (২০০০ সালের ডিসেম্বর) এস্কিমোরা স্বীকৃতি পায়নি। এস্কিমো বা চিরতুষারের অধিবীসদের সব রকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, তাদের দাবী বা স্বীকৃতির কথা তো দূরের কথা। পেরেস্ট্রয়কার আগে অনেক এস্কিমো সম্প্রদায়কে, হিটলার কর্তৃক ইহুদির মত, অত্যাচার করে মারা হয়েছে। সেই না বলা কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়নি। সেই সহজ সরল পৃথিবীর এক অজানা মানবজাতির করুণ কাহিনী কেউ লেখেনা, কারণ তাদের মধ্যে নেই কোন শক্তিশালী সংগঠন। তাদের উদ্দেশ্যে জানাই আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি।

বেরিং স্ট্রেটের কাছাকাছি রাশিয়ার কোল ঘেষা কয়েকটা দ্বীপ নাম লিট্‌ল ডিওমেডার্স (Little Diomeders)। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগে এই দ্বীপগুলো একটাই বিরাট দ্বীপ ছিল। সেই সময় বেরিং স্ট্রেটে শীতে বরফ জমে থাকত। কাজেই আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে এস্কিমোরা তাদের বল্গা হরিণের দল নিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করত। লিট্‌ল ডিওমেডার্স-এ তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে তাই আলাস্কার সাথে সরাসরি স্থায়ী জলপথে ও আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে। লিট্‌ল ডিয়োমেডার্স-এর সব এস্কিমোরাই আজকাল তেলের খনিতে কাজ করে। ছোট্ট কমিউনিটি—ছোট বড় মিশিয়ে তিন'শ (৩৭৭) সাতাত্তর জন। তেলের খনিতে কাজ করলেও তাদের পুরোনো শিকারের নেশা পুরোপুরি বজায় রেখেছে। সীল, সিন্ধুঘোটক আর বেরিং সীর সুস্বাদু হেরিং ও সালমন এখানকার দৈনিক খাদ্য। ছোট্ট কমিউনিটি হলেও তেলের কারণে তাদের উপেক্ষা করা হয়নি। এখানকার মেয়র প্যাট্রিক ওমিয়াক (Mayor Patrick Omiak) এর বাড়ীতে আমি ৬ দিন ছিলাম। আলাস্কার অয়েল কর্পোরেশনের সরাসরি আর্থিক ব্যবস্থায় এখানকার আলেয়ুট কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। Aleut Corporation কয়েকজন oil expert-এর সাহায্যে নিজেরাই স্বাধীনভাবে দ্বীপের দেখাশুনা করে। বলাই বাহুল্য যে দ্বীপটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। ছোট্ট একটা স্কুল ও খেলাধূলার জন্য রয়েছে বিরাট কমিউনিটি হল।

বিগ ডিয়ামেড্‌ মাত্র তিন কিলোমিটারের ব্যবধানে। অথচ সেখানে কোন এস্কিমো নেই কারণ সেটা রাশিয়ানদের হস্তগত। বিগ ডিয়ামেডের এস্কিমোদের সেখান থেকে সরিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিগ ডিয়ামেডেও তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রাশিয়ান মিলিটারী শাসনাধীন। শীতকালে যখন বেরিং সাগরের এই অঞ্চলটা বরফে জমে যায় তখন দুই দ্বীপের মধ্যে অনায়াসে শ্লেজ নিয়ে যাতায়াত করা যেতে পারে।

কাছাকাছি দুটো দ্বীপ। একটা আমেরিকা মহাদেশে আর একটা এশিয়ায়। মাঝখান দিয়ে ডেট লাইন পাড় হয়েছে। লিট্‌ল ডিয়ামেড (ডিয়ামেডার্সের চলতি নাম) আমেরিকানদের আওতায়। এখানে সপ্তাহে একদিন বা পনেরো দিনে একদিন করে বুশ প্লেন আসে আলাস্কার নোমে (Nome) শহর থেকে রসদ নিয়ে। মেয়র ছাড়াও ছোট্ট দ্বীপের ম্যানেজার হিসেবে আছে ফিলিপ্‌ আহ্‌কিংগা। সেও এস্কিমো অরিজিন। এস্কিমোদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সে খুব খুশি হয়ে উত্তর দেয়। আশ্চর্য বটে দুটো দ্বীপ খুবই কাছাকাছি অথচ একটা দ্বীপের এস্কিমোরা নিজেদের অনিচ্ছায় দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে আর অন্য দ্বীপে দিনের পর দিন তারা ধনী হয়ে উঠছে। বিধাতার সৃষ্টি এই পৃথিবী আর মানুষের সৃষ্টি ভৌগলিক ভাগ আর শাসনব্যবস্থা। মানুষের শাসন ব্যবস্থায় গরীব ও সরল মনের স্থান খুবই কম।

১৯৮২ সালে আমি জেনেভায় ইউনাইটেড্‌ নেশন্‌সে কাজ করতাম তখনই প্রথম পরিচিত হই কয়েক জন I.C.C leader-দের সাথে। I.C.C'র পুরো নাম Inuit Circumpolar Conference। এর আগে এই সংস্থার নামও শুনিনি। Inuit Circumpolar Conference-এর উদ্যোগে অধিবেশন বসে এবং এটাই এদের প্রথম। ডেলিগেট এসেছিল কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রীণল্যান্ডের এস্কিমোদের তরফ থেকে। চলতি কথায় এর নাম "Eskimo Forum 82"। ইউনাইটেড নেশন্‌সে এদের দাবী Non Voting Status in the U.N.O এবং People of arctic heritage হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া। ১৯৮৩ সালে I.C.C. কানাডার অটাওয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সি. এবং গ্রীণল্যান্ডের নুউক (Nuuk) অঞ্চলে অধিবেশন করে বিশেষ সারা তুলেছে। তাদের শ্লোগান—"আমরা এস্কিমো আর্কটিক আমাদের দেশ"। আশা করি রাশিয়ার নতুন সরকার এস্কিমোদের পূনর্বাসন করে নতুন সরকারের উদারতা ও মনের প্রসারতার পরিচয় দেবেন।

আনন্দের বিষয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা National Geographic Eskimo Forum বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাপিয়ে তাদের উৎসাহিত করছে। ১৯৮৩ সালে আমাকে I.C.C.-র অনারারী লাইফ্‌ মেম্বার হিসেবে আপ্যায়ন করে এবং তারপর থেকে ভূ-পর্যটক হিসেবে আমি সর্বত্রই এস্কিমোদের দৈনন্দিন জীবন, শিকার ও তাদের রাজনৈতিক দাবীর কথা সবাইকে জানিয়ে বেড়াচ্ছি। সত্যিই তো—আর্কটিক সারকেলের আদি অধিবাসী হয়েও তাদের নিজস্ব দেশ বলে আজও কিছু নেই।

আর্কটিক সারকেলের বাসিন্দা এস্কিমোদের কথা জানতে হলে তাদের সাথে মিশতে হবে। আজকাল এস্কিমোদের মধ্যে প্রচুর শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের হারিয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চান। আধুনিক জীবন যাপনের সাথে সাথে তারা মাঝে মাঝে বেড়িয়ে পড়েন শিকারে। এই ধরণের আধুনিক এস্কিমো পরিবারদের সাথে পরিচিত হয়ে সহজেই আদিবাসী এস্কিমোদের সাথে যোগাযোগ করা যায়। গ্রীণল্যান্ডের রাজধানী

নুউক (Nuuk), আলাস্কার বেরিং স্ট্রেটের কাছাকাছি স্থানগুলোতে, কানাডা নিউফাউন্ডল্যান্ড অঞ্চলে, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের ল্যাপ (ল্যাপ ল্যান্ডার্স)-এ এদের সাথে যে কোন পর্যটক সহজেই আলাপ করে তাদের ফ্যামিলিতে অথবা তাদের হোটেলে থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

রাশিয়ার এস্কিমোদের সাথে ঠিকমত যোগাযোগ করা আজও কঠিন। তারা শারীরিক গঠন ও মানসিক চিন্তাধারায় এস্কিমো হলেও রাশিয়ার পুরনো কমুনিস্ট রাজনীতির জন্য নিজেদের এস্কিমো বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করেন। উত্তর রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে আজও হাজার হাজার এস্কিমো বসবাস করে এবং পুরনো জীবনধারায় শিকার করে জীবনযাপন করে। ভারতীয় পর্যটকদের রাশিয়া যাওয়ার (১৯৯৭) ভিসা আজকাল অনেক সহজ হয়ে গেছে বটে কিন্তু সাইবেরিয়ার রাশিয়ান এস্কিমোদের অঞ্চলে যাওয়ার খুবই অসুবিধে। তবে যে সব ভারতীয়রা আলাস্কা যাবেন তারা বেরিং স্ট্রেটেই লিট্‌ল ডিয়ামেডার থেকে বিগ ডিয়ামেডার দ্বীপে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং হেলিকপ্টার নিয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকে প্রোভিডেনিয়া যাবার প্লেন, তারপর সেখানে থেকে চেরস্‌কি (Cherski) পার হলেই পাওয়া যাবে অরিজিনাল এস্কিমোদের এলাকা।

এস্কিমোদের বর্তমান দাবী :

১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমি এক্সিমোদের বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিচিত হয়েছি তারই কয়েকটা নমুনা এই প্রসঙ্গে আমার প্রিয় পর্যটক মহলে নিবেদন করছি।

আমরা কলকাতার বা ভারতের পর্যটকরা এস্কিমোদের সম্বন্ধে খুবই কম জানি তার এক নম্বর কারণ দূরত্ব, দু'নম্বর কারণ অভিজ্ঞ পর্যটকরা বাংলার পত্র পত্রিকায় লেখেন না। ১৯৬৭ সালের আগে আমি এস্কিমোদের প্রসঙ্গে যা পড়েছিলাম তার অধিকাংশই কল্পিত অথবা কলকাতায় বসে লেখা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে ঠিক তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। আজ ২০০০ সালের শেষ দিকে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই ডায়েরী লিখছি। পাঠক-পাঠিকা মহলে কেউ যদি আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চান অবশ্যই আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন আমি নিজেই তাদের উত্তর দেব।

আর্কটিক সারকেলের এস্কিমোদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা প্রত্যেক বছরই পাল্টাচ্ছে। তারা রাজনৈতিক অধিকার পাচ্ছে আর হারাচ্ছে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। এস্কিমোরা যে একটা একতাবদ্ধ প্রগতিশীল জাতি সেকথাও কেউ ভাবতে পারেনি। সাধারণ পর্যটকদের কাছে এস্কিমো মানে, যারা বরফের দেশের অধিবাসী, শীতের সময় ইগ্‌লুতে থাকে, তিমি ও মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে, বল্‌গা হরিণের শ্লেজ চালায় অথবা হাস্কি কুকুরের শ্লেজ নিয়ে শিকারে বেরোয়, ব্যস এই পর্যন্তই।

গত কুড়ি বছরের মধ্যে এস্কিমোদের মধ্যে এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যা আজ পর্যন্ত কোন জাতির মধ্যে এই ধরনের দ্রুত উন্নতি আমার চোখে ধরা পড়েনি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রীণল্যাণ্ড। অ্যাড্জাস্টমেন্ট ও ডেভেলপ্‌মেন্টের এক চূড়ান্ত উদাহরণ। ১৯৭০ সালে গ্রীণল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম ছিল গত্‌স্‌হাভ্ (Gotshav), এস্কিমোরা আন্দোলন করে আজ তার পুরোনো এস্কিমো নাম ফিরিয়ে আনল। বর্তমান নাম নুউক্ (Nuuk)। সেই সময় মাত্র ৪টে ট্যাক্সি ছিল আর রাজধানীর সর্বত্রই ছিল ডেনিস ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। এস্কিমোরা সাধারণতঃ দিন মজুর অথবা সহকারী হিসেবে ছোট খাটো কাজ করতো।

আজ গ্রীণল্যাণ্ডের রাজধানী নুউক-এ পাঁচশ ট্যাক্সি, আড়াইশ ট্যাক্সি ব্র্যাণ্ড নিউ মের্সেডেস্, ড্রাইভার প্রায় সবাইই এস্কিমো। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ মাছের ব্যবসা প্রায় শতকরা আশি ভাগ এস্কিমোদের হাতে।

কোপেনহেগেন আস্তে আস্তে তার প্রভাব হারাচ্ছে। আজও গ্রীণল্যাণ্ড ডেনমার্কের শাসনাধীনে কিন্তু মনে হয় কয়েক বছরের মধ্যে এস্কিমোদের মধ্যেই গড়ে উঠবে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা। গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমোরাই বিশেষ করে ইনুইট্ সম্প্রদায় (Inuit) সম্পূর্ণ এস্কিমো জগতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা। আজকাল গ্রীণল্যাণ্ডের সাথে উত্তর কানাডার দৈনিক প্লেন সার্ভিস চালু হয়েছে।

আলাস্কা ও কানাডার এস্কিমোরা ইতিমধ্যেই তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন তেলের খনি, পশুচাষ, মাছের কারবার, বনজ ও খনিজ সম্পত্তির অংশীদার হয়েছে। শিক্ষায় তারা দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।

ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের এস্কিমোরা একবার নরওয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে হাংগার স্ট্রাইক করে জগতে আলোড়ন শুরু করেছে। বনভূমির উচ্ছেদ ও বিভিন্ন হাইড্রোলিক পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তারা সাফল্য লাভ করেছে। এটা একটা বিরাট দৃষ্টান্ত। কানাডা ও ইউ-এস-এর এস্কিমোরা কয়ের বছর যাবৎ আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে যুক্ত হয়ে বিরাট আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য :

Participation in decision making compensation in land and money, and recognition as self-governing entities. They seek also self governing jurisdiction. Finally they are seeking to regain their artic land for Eskimos.

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে আলাস্কা ও গ্রীণল্যাণ্ডে দেখেছি এস্কিমোদের হাতে পয়সা এসেছে আর সেই সাথে সাথে এসেছে কিছু বদভ্যাস। অ্যাল্‌কহল উন্নত এস্কিমোদের দৈনন্দিন জীবনে আনছে অশান্তি ও অঘটন। গ্রীণল্যাণ্ডের রাজধানী নুউক* এর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সারি সারি দোতলা তিনতলা বাড়ীতে ঢাকা

* Nuuk

পড়ে গেছে রাজধানীর সৌন্দর্য। এস্কিমোদের সামাজিক জীবনে ঘটেছে বিরাট পরিবর্তন। ল্যাপল্যাণ্ডের এস্কিমোরা কিন্তু মনে প্রাণে চাইছে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে। তারা সব রকম আধুনিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। তারা চাইছে হারিয়ে যাওয়া শিকার আর বল্গা হরিণের জীবনধারা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, এই আর্কটিক্ সারকেলের মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ তেল, তামা, পিতল, কয়লা ও লোহা। আর রয়েছে জলজ সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা এখানকার সাগর। আর্কটিক সারকেল যদি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায় তাহলে সেই দেশটি হতে পারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ।

জেনেভায় একটি উল্লেখযোগ্য অধিবেশন :

১৯৯৭ সালের ২৮শে জুলাই থেকে ১লা আগস্ট পর্যন্ত ইউনাইটেড নেশন্সের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার দাবী সংক্রান্ত সভা। জেনেভা শহরে দেখা দিল কয়েক'শ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান, পোষাক, ভাষা আর বিভিন্ন ধরনের কালচারাল প্রোগামে ভরে উঠল শহর।

কুড়ি বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করল পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের পাঁচটি আদিবাসী সম্প্রদায়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই এল প্রধান ও ব্যাপক গোষ্ঠী, রেড্ ইণ্ডিয়ান। এস্কিমোদের তরফ থেকে এল সাআমি সম্প্রদায় (Saami), কেনিয়া থেকে এল মাসাই সম্প্রদায় (Masai) আর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের সকলের একই দাবী—আমাদের জমিতে আমাদের থাকবার অধিকার, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার ও কলুষমুক্ত আবহাওয়া আর আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার অধিকার। ইউনাইটেড নেশন্সের হিউম্যান রাইট ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের দাবী ও অনুষ্ঠানের বক্তব্য লিখে নিল উদ্দেশ্য জেনারেল এ্যাসেম্বলিতে পেশ করে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। ঐতিহাসিক এই অধিবেশনটির নাম ইন্ডেক্স অনুযায়ী : 20th Anniversary of the first NGO conference on Discrimination against Indigenious Peoples in the Americas which brought together indegenious representatives from North, South and Central America in 1997.

এই সভায় বিভিন্ন দলনেতারা একই বক্তব্য রাখলেন। আমাদের দাবী মানতেই হবে, আমাদের কথা শুনতেই হবে। ভূ-পর্যটক হিসেবে অবজারভার লবীতে আমি আমন্ত্রিত হলাম।

একটি অদ্ভুদ ঘটনা :

জেনেভা ইউনাইটেড্ নেশন্সের বিল্ডিং-এর চারপাশ সুন্দর পার্ক দিয়ে ঘেরা, পার্ক থেকে দেখা যায় অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য। জেনেভার রাজহাঁসে ভর্ত্তি সুন্দর লেক আর

দূরে আল্পস্। ২৮শে জুলাই সোমবার সকাল দশটায় এই ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু হবে। নটার থেকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের সেরা ট্রাডিশনাল ড্রেসে পার্কে এসে জমা হতে থাকল। অ্যাসেম্বলি হলে শুধু দলনেতাদের প্রবেশপত্র দেওয়া হয়েছে কারণ স্থানাভাব। প্রত্যেকদল দলনেতাদের কেন্দ্র করে ছোট ছোট আলোচনা চক্র বসিয়েছে। আকাশ পরিষ্কার সূর্যের আলোয় তাদের পালক, পুথি ও রঙচঙে বিচিত্র পোষাকে ইউনাইটেড্ নেশনসের পার্কটিকে আনন্দলোকে পরিণত করেছে। এ ধরনের দৃশ্য এখানে বিরল। ইউ-এন-ও-তে বিশ্বের ডিপ্লোম্যাটরা আসেন সরাসরি বিল্ডিং-এ। তাদের সময়াভাব, দামী সুটের বাঁধনে তাঁদের দেহ কারাবদ্ধ, চিন্তাধারার প্যাঁচে তাদের মন ভারাক্রান্ত। মুখে শান্তভাব বজায় রাখার জন্য তাদের মানসিক চেষ্টা আর হাতের ব্যাগে রয়েছে ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রোডাক্‌শনের ভার। তারা মন খুলে কথাবার্ত্তা বলতে পারেন না, যেখানে সেখানে বসতে পারেন না, আর খোলা আবহাওয়ায় থাকলে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

কাজেই প্যালে দে নেশনসের পার্কে আদিবাসীদের এই মিলন এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ দৃশ্য ক্যামেরার গণ্ডির বাইরে। সরল সহজ, বাঁধা ধরার বাইরে আনন্দময় এক পরিবেশ। সবাই হাসছে, সবাই গাইছে, সবাই একই সুরে কথা বলছে। ইউনাইটেড নেশনসে এই পরিবেশ দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারাই বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি। প্রায় পৌনে দশটার সময় পার্কের আকাশে দেখা দিল চারটে চিল। পরিষ্কার নীল আকাশে তাদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক মিনিট পর তারা নেমে এল আরও নীচে তারপর উড়তে লাগল চক্রাকারে। সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষিত হল। সবাই বাক্‌মুগ্ধ। কথা-নাচ সব বন্ধ করে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই উড়ন্ত চারটি চিলের দিকে। তিন মিনিট পর আবার চিলগুলো আলপ্‌সের দিকে চলে গেল। এই সামান্য ব্যাপার অসামান্য হয়ে ধরা পড়ল আমেরিকান রেড্ ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমো সম্প্রদায়দের মধ্যে। কন্দোর উৎসাহিত করল তাদের প্রিয় ভক্তদের।

সত্যি অবাক কাণ্ড। বিস্ময়ে সবাই হতবাক্ হয়ে রইল। বলাই বাহুল্য যে শুধু আমেরিণ্ডিয়ান নয় এস্কিমোদের কাছেও চিল বা ঈগলপাখী সৌভাগ্যদায়ক এবং দৈবশক্তি সম্পন্ন। সকলের কাছেই এই দৃশ্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে সাক্ষী হয়ে রইল। তাদের অধিবেশনে দেবতার আশীর্বাদ আনল।

প্যালে দে নেশন্‌সের বহু আন্তর্জাতিক প্রেস মিডিয়া উপস্থিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তারা সবাইই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেখানে উপস্থিত—তাদের দার্শনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। তাই এই ঘটনা দেখেও তারা তার সঠিক ব্যাখ্যা বা মর্ম্মোদ্ধারের কোনো চেষ্টা করল না—তাদের মতে এটা একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। এ দেশে ঈগল পাখী বিরল হলেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে একসঙ্গে চারটে ঈগল পাখীর হঠাৎ আবির্ভাব ও অদৃশ্য হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানোর মত পক্ষী বিশেষজ্ঞ এখানে কেউ নেই। কাজেই লোকাল সাংবাদিকরাও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করল না।

কারণ ঈগলপাখী সম্পর্কে মন্তব্য এখানকার লোকেরা পয়সা দিয়ে কিনবে না। (পরে U.N. Special September 1997 ম্যাগাজিনে Indigenous at the Palais শীর্ষক প্রবন্ধে Thorpe Millard নামে বিশেষ প্রতিনিধি এই বিষয়ে কয়েক লাইন লিখেছিলেন। সেও এই ঘটনার দু'মাস পর।) সেদিন বিকেল বেলা জেনেভা লেকের ধারে সকাল বেলার সেই দৈব ঘটনাকে উপলক্ষ করে ঈগল নৃত্যের মাধ্যমে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল।

এই অনুষ্ঠানে পরিচিত হলাম ল্যাপল্যাণ্ডের সাআমি এস্কিমোদের সাথে। তাদের মুখেই শুনলাম যে সাইবেরিয়ার এস্কিমোরাও সাআমি সম্প্রদায়ভুক্ত—তবে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য তাদের ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব অবলুপ্তির পথে। তাদের কথাটা মনে ধরে গেল। আমার বহুদিনের সাইবেরিয়া ভ্রমণের ইচ্ছাটা আবার জেগে উঠল। পেরেস্ট্রোয়কার আগে দু'বার চেষ্টা করেছিলাম স্বাধীনভাবে সাইবেরিয়া সফরের। কিন্তু অনুমতির অভাবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারপর বিভিন্ন কারণে আর যাবার চেষ্টা করিনি। আজ হঠাৎ আবার জেগে উঠল সেই পুরোনো পরিকল্পনা। মনে ভাবলাম মনকে কথা দিয়েছিলাম। এখন হয়তো উপযুক্ত সময় হয়েছে কাজেই আবার চেষ্টা করা যাক।

"সাইবেরিয়ার এস্কিমোদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী"—এটাই হবে আমার ভিসা এ্যাপ্লিকেশনের মূল কথা। এস্কিমোদের সাথে প্রথম পরিচিত হয়েছিলাম আমার সাইকেলে ভূ-পর্যটনের সময়। অবশ্য আমার সাইকেল উড়তে জানে না তাই গিয়েছিলাম আইসল্যাণ্ড থেকে গ্রীণল্যাণ্ডে হেলিকপ্টারে। তারপর আরও দু'বার গ্রীণল্যাণ্ড গিয়েছিলাম। কানাডার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও আলাস্কার বেরিং স্ট্রেটের এক্সিমোদের সাথে আমার স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সভা ও সাংগঠনিক কাজে তাদের সাথে আমার প্রায়ই যোগাযোগ হয়। সাইবেরিয়ার কোন এস্কিমো সম্প্রদায়ের সাথে আমার যোগাযোগ নেই কাজেই আমি নিজেই উপযাচক হয়ে জেনেভা কনফারেন্সে আগত সা-আমি প্রতিনিধিদের কথা দিলাম যে, তারা যদি আমার সাইবেরিয়া সফরকে তাদের "এস্কিমো ইন্‌ফরমেশন ও কমিউনিকেশন প্রজেক্ট" হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে আমি সফর শেষে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের বর্ণনা করবো অথবা লিখে জানাবো।

আমার এই প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে গেল, অবশ্য রাজি না হবার কোন কারণই নেই। কারণ তাদের কাছ থেকে আমি কোন আর্থিক সাহায্য চাইছি না। আর স্পন্সরশিপও চাইছি না। শুধু চাইছি তাদের মর‍্যাল ও অফিসিয়াল সাপোর্ট।

পরদিন থেকেই শুরু হ'ল আমার অনুসন্ধান। রাশিয়ার আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক মানচিত্র অন্যরূপ ধরেছে। কমনওয়েলথ্ ইন্ডিপেণ্ডেন্ট স্টেট্স। পুরোনো ফ্ল্যাগ আর মানচিত্র বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। সুইজারল্যাণ্ডের রাশিয়ান এম্বাসীতে গিয়ে অবাক হবার পালা। সব কিছু নতুন হলেও মনে হ'ল সেই পুরোনো ভড্‌কা নতুন বোতলে ঢালা হয়েছে। ওদের সেই পুরোনো

মনোভাবের কোন পরিবর্তন চোখে ধরা পড়ল না। তবুও আমি নাছোরবান্দা তাই হতাশ হলাম না।

পুরোনো সোভিয়েত রাশিয়া এখন পনেরোটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আমার ভাগ্য ভালই বলতে হবে সাইবেরিয়া অঞ্চলটি সম্পূর্ণই রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে পড়েছে। সেন্ট পিটারস্‌বুর্গ ও মস্কো এয়ারপোর্টের ছাপ আমার পাশপোর্টে বেশ কয়েকবারই পড়েছে। সেন্টপিটার্সবুর্গ ও মস্কো থেকে শুরু করে উত্তরের সম্পূর্ণ এলাকা এবং সাইবেরিয়া ও এশিয়ান রাশিয়া ধরে সরাসরি বেরিং স্ট্রেট পর্যন্ত একই রাষ্ট্র। পুরোনো অজুহাতেই পেয়ে গেলাম ভিসা।

আজকাল রাশিয়ায় ইনটুরিষ্ট ছাড়াও অনেক টুরিষ্ট এজেন্সি রয়েছে, যাতায়াতের বিভিন্ন ব্যবস্থা ঠিক করলাম। জেনেভা (সুইজারল্যাণ্ড), ওয়ারশ (পোল্যান্ড), সামেরা (রাশিয়া), একাতেরিনবুর্গ (রাশিয়া)। একাতেরিনবুর্গে থাকতে হবে প্রায় ২৪ ঘণ্টা। তারপর সেখান থেকে ইরকুট্‌স্‌ক (Irkutsk), ইরকুট্‌স্‌ক বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী একটি শহর।

জেনেভা থেকে ওয়ারশ সুইস্ এয়ার, ওয়ারশ থেকে সামেরা (Samera), একতারিন্‌বুর্গ (Ektarinbourg) হয়ে ইরকুট্‌স্‌ক পর্যন্ত এ্যারোফ্লোট। সম্পূর্ণ যাতায়াত ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব নিল কুয়েনি (Kuoni) ট্রাভেল এজেন্সি। ফেরার পথ ঠিক নেই কারণ সাইবেরিয়াতে কোথায় কবে কতদিন থাকতে হবে জানি না তাই টিকিট ওপ্‌ন্ রাখা হল। যাতায়াতের খরচা পড়ল জেনেভা সাইবেরিয়ার ইরকুট্‌স্‌ক পর্যন্ত দুহাজার সুইস্ ফ্র্যাংক। এটা চারটে সিটিতে দুদিন করে ফুডিং লজিং সমতে। দূরত্ব ও অচেনা অঞ্চলের জন্য খুব বেশি খরচ মনে হ'ল না।

সাধারণতঃ জেনেভা মস্কোর যাতায়াত ভাড়া পাঁচশ পচাত্তর সুইস্ ফ্রাঁ। এ্যারোফ্লোটে জেনেভা-মস্কো সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। আমার সময় লাগবে দু-দিনের মত। ফ্লাইট্ টাইম্ মাত্র ৬ ঘণ্টা।

কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আজকাল এস্কিমো কথাটা ইউরোপে অচল তাদের নতুন নাম ইনুইত্।

বরফের দেশ চিরতুষারাবৃত সাইবেরিয়া

সাইবেরিয়া—নামটা শুনলেই হাড়ে কাঁপন লাগে। পৃথিবীতে যত জায়গা আছে তার মধ্যে সাইবেরিয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শীতের দেশ। নর্থপোল ও সাউথ পোলকেও হার মানায়। সাইবেরিয়ার ভেরখৈয়ানস্ক (Verkhoiansk) অঞ্চলটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী শীতের জায়গা, যেখানে তাপমাত্রা -৭০° সেন্টিগ্রেড (-70^0C), অবশ্য জানুয়ারীতে। সেন্টপিটারসবুর্গ-এ জানুয়ারীর তাপমাত্রা -১০° সেন্টিগ্রেড (-10^0C)। বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ বা লেক। তার থেকে বড় হলেই সেটা পড়ে যায় সাগর পর্যায়ে। বৈকাল হ্রদের আয়তন প্রায় তেত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। (33000 km^2)। ইর্কুট্সক্ বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরবর্তী একটি শহর।

আমাকে যেতে হবে মধ্য সাইবেরিয়ায়। সেখান থেকে ধরব উত্তরের পথ। সরাসরি কোন পথ নেই কাজেই আমাকে সব খোঁজ খবর নিতে হবে ইরকুট্স্ক থেকে। দোভাষী ও গাইড ছাড়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, কাজেই আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন দক্ষ গাইডের।

বাইকাল হ্রদ মঙ্গোলিয়ার ঠিক উত্তরে বর্ডার ঘেষা। আমি ইরকুট্সক্ এয়ারপোর্টে এসে পৌছলাম বিকেল তিনটের সময়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ ১৯৯৭। হঠাৎ আসিনি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর ও বিভিন্ন বিষয়ে জানবার জন্য আমার মাসখানেক সময় লেগেছে।

এই ছোট্ট এয়ারপোর্ট থেকে ইরকুট্স শহরে যাবার জন্য বাস ট্যাক্সি দুইই আছে। আমি বাসে করেই এলাম। আমার ব্যাগেজ হিসেবে আছে শুধু পীঠের রুট স্যাক্। আমার সামান্য যা রুশ ভাষা জানা ছিল তাতেই কাজ দিল। মাঝারি ধরনের হোটেল মিরিস্-এ উঠলাম। ইরকুট্স্ক্ আংগারা নদীর ধারে একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিটি। ছোট্ট হলেও এখানকার লোক সংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশি। শহরের বাড়ীঘর, দোকান-পসার আর রাস্তাঘাট দেখে মনে হচ্ছে যে শহরবাসীদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি খারাপ নয়। এটা পাহাড়ি এলাকা লোকজনদের হাটা চলায় পাহাড়ি মন্থরতার ছাপ। তবে রাস্তায় চলতে চলতে প্রায়ই নাকে আসে কাছাকাছি কোনও পেট্রল বা রাসায়নিক কারখানার গন্ধ।

ইরকুট্সক্ টুরিস্ট অফিসটি নামে মাত্র টুরিস্ট অফিস। দেয়ালে একটা বহুদিনের পুরোনো ম্যাপ টাঙানো। তাছাড়া এদের অফিসে কোন রকম কাগজপত্র নেই। তবে

---

* রাশিয়ান নাম বাইকাল বৈকাল নয়।

টুরিস্ট অফিসার আমার সাইবেরিয়া ভ্রমণের কথা শুনে হেসে উঠলেন, তারপর তিনি বললেন, "সাইবেরিয়ায় কেউ বেড়াতে বা ভ্রমণ করতে যায় না আপনি ভুল পথ ধরেছেন। সাইবেরিয়ায় লোকে যায় মরতে।" আমি তার কথায় নিরুৎসাহ না হয়ে বললাম—"আপনি ঠিকই বলেছেন আমি একটু পাগলাটে ধরনের। আসলে সাইবেরিয়া সম্পর্কে অনেক শুনেছি তাই একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।"

ভদ্রলোক এবার আরও সিরিয়াস হয়ে বললেন—সাইবেরিয়ায় ভ্রমণ করতে কেউ যায় না। সেখানে যায় গর্ভনমেন্ট সার্ভের লোকেরা, খনির সন্ধানে যায় বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞের দল, আর কোন কোন সময় জিওগ্রাফিক টীম।

আমি কথা না বাড়িয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। সেদিন রাতেই হোটেলের মালিক আমাকে জানালেন যে, যদি দোভাষীর দরকার হয় তাহলে তিনি বন্দোবস্ত করতে পারেন। আমিও মনে মনে সে কথাই ভাবছিলাম।

—"নিশ্চয়ই কালকের মধ্যে যদি পাই খুব ভাল হয়"।

তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি চিন্তা করবেন না।" কথামত পরের দিন একজন দোভাষী গাইড্ পেলাম। অল্প বয়সী ২৫/২৬ বছরের একজন সুন্দর পুরুষ। হেসে করমর্দন করে পরিচয় দিলেন।

—"আমার নাম মিখায়েল"

—"আমার নাম বিমল"

মিখায়েলের সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘনিষ্টতা হল। মিখায়েল ইংরেজি জানে না। ফরাসী ভাষায় পারদর্শী। আমার অসুবিধা নেই। মিখায়েলের বাবা এখানকার একজন ব্যবসায়ী, তার জামাকাপড়ের দোকান। মিখায়েল বাবার সাথে দোকানে বসে আর মাঝে মাঝে দোভাষীর কাজ করে। তাতে বাইরের লোকেদের সাথে পরিচিত হওয়া যায় আর ভাষাটাও চর্চ্চার মধ্যে থাকে। রাশিয়ার কারেন্সি রুব্‌ল। ইউরোপীয় অর্থের সাথে তুলনা করলে রুব্‌ল এর বাজার দর একদম নিচে। কাজেই আমরা ডলারেই আমাদের কনট্যাক্ট শুরু করলাম। প্রতিদিন ওকে দিতে হবে পাঁচ ডলার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। প্রয়োজনের তুলনায় সস্তাই বটে। ইরকুট্‌স্‌ক্ (Irkutsk) ম্যাপের মধ্যে ছোট্ট একটি বিন্দু। ওয়ার্ল্ড ম্যাপে ইরকুট্‌স্‌কে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথমে দেখতে হবে মঙ্গোলিয়া তারই উত্তরে রাশিয়া, রশিয়ান বর্ডারে পাওয়া যাবে বাইকাল হ্রদ। এবার রাশিয়ান ফেডারেশনের ম্যাপ দেখুন। বাইকাল হ্রদের সর্বদক্ষিণে, পূর্বদিকে একটা নদী এসে পড়েছে, নদীটার নাম আংগারা। এই নদীর ধারেই ইরকুট্‌স্‌ক্ শহর। আংগারা ইয়েনিসেয়ি মহানদের শাখা। ইরকুট্‌স্‌ক্-এ এসেছি আমার সাইবেরিয়া ভ্রমণের যাবতীয় পরিকল্পনা বা সফরসূচী তৈরী করতে। ইরকুট্‌স্‌ক মধ্য সাইবেরিয়ার সর্বদক্ষিণের শহর। উপযুক্ত ইন্‌ফরমেশনে জন্য আমরা পরের দিন এলাম মিখায়েলের একজন জানাশোনা বন্ধুর কাছে। তিনি উত্তর সাইবেরিয়ায় অনেকবার গেছেন এবং এ ব্যাপারে আমাদের

পরামর্শ দিতে রাজি হলেন। একটা চায়ের দোকানে কফি ও ভোদ্‌কা সামনে নিয়ে আমরা বসলাম। দোকানের এক কোণে একটা লোহার আলগা উনুনে কাঠের আগুন। তার ওপর একটা বিরাট লোহার প্লেটে কয়েকটা কেট্‌লি বসানো আর তাতে চা পাতা ও পুদিনা পাতার মিশ্রিত পদার্থের গন্ধে সারা দোকানটা ভরে উঠেছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ কি ষাট হবে। লম্বা চওড়া মুখের গঠন অনেকটা মোঙ্গল ধরনের। নাম লাভশেংকো। লাভশেংকোর সাথে অতি অল্প সময়েই আলাপ জমে উঠল। ভদ্রলোক অনেক ঘুড়েছেন। জাপানেও একবার গিয়েছেন। তিনি চামড়ার ব্যবসায়ী। কথায় কথায় তাকে বললাম যে, আমি এক ভবঘুরে, রাশিয়ায় এই নিয়ে ছ'বার তবে সাইবেরিয়ায় এই প্রথম। কয়েকবছর যাবৎ আমি উত্তরাঞ্চলের এস্কিমোদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছি আর সে কারণেই ঘুড়ে বেড়াচ্ছি আর্কটিক সারকেলের বিভিন্ন অঞ্চলে। সম্প্রতি শুনেছি যে সাইবেরিয়ায় প্রচুর এস্কিমো এখনো আগের মতোই শিকার করে জীবনযাপন করে। তাই আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই আর তাদের সাথে কয়েকদিন থেকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। আমার কথা শুনে লাভশেংকো খুব খুশি হলেন আর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, সংসারের চাপ না থাকলে তিনিও আমার সাথে চলে যেতেন। তিনি আমাকে সাইবেরিয়া সম্পর্কে বলতে লাগলেন—

সাইবেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইউরোপের অংশ, মধ্যাংশ আর এশিয়ার পূর্বাংশ। উরালের সাথে প্রায় সমান্তরাল হয়ে অব্‌ (OB) নদী দক্ষিণ থেকে সরাসরি উত্তরে বয়ে চলেছে। এই অব্‌ নদীই সৃষ্টি করেছে সাইবেরিয়ার বিখ্যাত সমতলের আবাদভূমি। অব্‌ নদী থেকে মধ্যাঞ্চলের ইয়েনিসেয়ি (Ienissei) নদী পর্যন্ত এলাকাকে বলা হয় সাইবেরিয়ার সমতলভূমি। সারা বছর সেখানে বরফ থাকে না। রাশিয়ার সবচেয়ে উর্বর জমি, সেখানে এস্কিমোদের কোন চিহ্ন নেই। ইয়েনিসেয়ি ও লেনা (Lena) এই দুটি নদী মধ্য সাইবেরিয়ার দুই সীমানা। পশ্চিমের ইয়েনিসেয়ি আর পূর্বের লেনা। এই দুটি নদীই সাইবেরিয়ার দক্ষিণের এই অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ইরকুটস্‌ক শহরের পাশ দিয়ে যে আংগারা নদী বয়ে চলেছে সেটা এসেছে সরাসরি ইয়েনিসেয়ি থেকে অর্থাৎ আংগারা ইয়েনিসেয়ির এক শাখানদী। আংগারা ইয়েনিসেয়ি থেকে বেড়িয়ে এসে বাইকাল হ্রদে পড়েছে। ইয়েনিসেয়ি সরাসরি উত্তর দিকে বয়ে গিয়ে কারা সাগরে পড়েছে। আর লেনা সরাসরি উত্তরে লাপ্‌তেভ্‌ সাগরে (Laptev Sea) পড়েছে। লেনা বাইকাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন। ইয়েনিসেয়ি নদী লাব্লোনোভী (Lablonovy Mountain) পাহাড় থেকে উৎপন্ন। আমরা এখন আছি মধ্য সাইবেরিয়ার সর্বদক্ষিণের শহরে। দক্ষিণের এই লাব্লোনোভী (Lablonovy) পাহাড় ডিঙ্গোলেই পড়বে মঙ্গোলিয়া। আমাকে যেতে হবে সরাসরি উত্তরে অর্থাৎ এখানে থেকে আট-ন'শ কিলোমিটার দূরত্বে। এখান থেকে সরাসরি উত্তরে যাবার কোন রাস্তা নেই, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট ছোট শহর ঘুড়ে উত্তরে যেতে হলে প্রচুর সময়ের দরকার। খাঁটি সাইবেরিয়ান এস্কিমোদের পেতে হলে যেতে হবে ওলেকমিন্‌স্‌ ও ইয়াকুট্‌স্‌ক্‌ (Olekminsk, Yakoutsk)। যেমন করেই

হোক আমাকে যেতে হবে আর্কটিক সারকেলের দিকে। পশ্চিমের দিকে অনেক রাস্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সরাসরি উত্তরে যাওয়ার পথ নেই। যাইহোক লাভশেংকোর সাথে পরিচয়ে লাভই হল। ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে ও পানীয়ের দামটা মিটিয়ে দিয়ে আমরা রাস্তায় নামলাম।

সেদিনই বিকেলবেলা আমরা একটা স্থানীয় বাস ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই বাইকাল লেকের ধারে এসে পৌঁছলাম। ইরকুট্স্ক থেকে বাইকাল পার হবার কোন দৈনিক ফেরী নেই। বাইকাল লেকের এপার ওপার দেখা যায় না। পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ—চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। চারপাশে লাব্লোনোভী পাহাড়, পাহাড়ের সর্বোচ্চশৃঙ্গ ৩০০০ মিটার। হ্রদের চারপাশে পাহাড়ের সাধারণ উচ্চতা ৭০০/৮০০ মিটারের মত। এই পাহাড়ের ওপাসেই মোংগলিয়া, স্টেপবাসীর বাস। এই দুর্দান্ত যাযাবরেরা রাশিয়াকে দখল করেছিল যেমন করেছিল সুদূর ভারতকে। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য সেই ইতিহাসের দিকে মনটা যেতে চাইছিল। কিন্তু মিখায়েল লেকের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল ওই দ্যাখ—এক ভদ্রমহিলা লেকের মাছ বিক্রি করছে। মিখায়েলের কথানুযায়ী কয়েক পা এগুতেই ভদ্রমহিলা আমাদের কি যেন বললেন। তার কথার টান কিছুই বুঝলাম না। মিখায়েল আমাকে বুঝিয়ে দিল যে এরা রাশিয়ান ভাষায় না বলে আঞ্চলিক ভাষা কামুকীতে বলে। রাশিয়ান ভাষার সঙ্গে এই ভাষার খুব কমই মিল। মোঙ্গলিয়ান ভাষার সাথে এদের অনেক মিল। তবে এই ভাষার কোন সরকারী মূল্য নেই। আমরা বাইকাল হ্রদের ধার ধরে হাঁটতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম রাজনৈতিক জগতের কি খেলা। কয়েকবছর আগেও ভাবতে পারিনি যে সুদূর এই বাইকাল হ্রদের পাশ দিয়ে স্বাধীনভাবে ঘুড়ে বেড়াতে পারবো। ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য বার বার কৃতজ্ঞতা জানালাম গোরবাশেভ্কে, ধন্যবাদ দিলাম পেরেস্ট্রয়কাকে।

বাইকাল হ্রদের ধারে আর হাঁটা গেল না কারণ হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। কানদুটো অবশ হবার আগেই আমাদের ফিরতে হবে, কাজেই বাস স্ট্যাণ্ডের পথ ধরলাম। হ্যাঁ ডায়েরিতে দুটো কথা লেখা হয়নি। হ্রদের মাছগুলোর মধ্যে দেখলাম ট্রুইট, পেস আর গার্দো। এখান থেকে সরাসরি উত্তরের শহর জলপথে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার।

ইরকুট্স্কের বাজার দেখার মত বিশেষ করে এখানকার চেঁচামেচি। বাইকাল হ্রদের মাছেই বাজারের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ। বিক্রেতারা প্রায় সবাইই মহিলা। এখানকার সব্জি বাজারও দেখার মত। বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, ওলকপির ভ্যারাইটিস, টমেটো আর অনেক রকমের শাক। বাজারের আর একটা অংশে রয়েছে জীবজন্তুর সামাবেশ। বেশীরভাগই শুয়োর, বুনো এবং ফার্মের। গরুর মাংস অপেক্ষাকৃত কম। কারণ এই দারুণ শীতে অর্থাৎ বছরের ছয়-সাত মাস গবাদি পশুর খাবার স্টকে রাখা মুশকিল। শুয়োরের চাষের সে অসুবিধা নেই কারণ শুয়োর সারা বছর অন্ধকারে বন্দী থাকলেও তার কোন অসুবিধা নেই, আর শহরের খাদ্য আবর্জনা দিয়েই তাদের পালন

করা যায়। শুয়োর পালনে খরচা খুবই কম। বাইকাল হ্রদের দক্ষিণের এই অংশে প্রচুর বনভূমি। সেখান থেকে আমদানী হয়েছে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের নাম না জানা পাখী। দেখতে অনেকটা বনমুরগী ও পায়রার মত। এই অঞ্চলের পাখীর মাংস খুব উল্লেখযোগ্য। পাখীর বাজারের পরেই রাস্তার দুপাশে তক্তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খরগোশ জাতীয় শিকার। শিকারীরা নিজেরাই তাদের শিকার নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্য। তবে বুনো খরগোশের দাম খুব বেশি কারণ তাদের মাংস সুস্বাদু আর তাদের পশমী চামড়ায় তৈরি হয় ভাল শীতের পোষাক।

মাংসের বাজারে শুকনো মাংসের বিরাট আমদানী। যাইহোক এই বাজারে দেখলেই বোঝা যায় যে শহরটা গরীব নয়। মিখায়েলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই ও বলল ভুলে যেও না এটা খনিজ অঞ্চল। এখানকার ফ্যাক্টরীগুলো থাকাতে এই অঞ্চলে বেকার সমস্যা নেই। সাইবেরিয়ার এই অঞ্চলে শুধু খনিজ পদার্থই নয় প্রচুর পরিমাণে আছে বনজ সম্পদ। এই অঞ্চলে প্রচুর কাঠের কারখানা আছে। তাদের অধিকাংশই এখানকার কাঠের মজুতদার। হ্যাঁ আর একটা বিষয়ে লিখতেই হবে সেটা হচ্ছে এখানকার বিখ্যাত বল্‌গা হরিণের মাংস, টাট্‌কা ও শুক্‌নো।

বাইকাল হ্রদ ও ইরকুট্‌স্‌ক শহর আমার ভাল লাগলেও এখানে থাকলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে না। এখানে শ্রমিকদের আড্ডাখানা, ক্লাব ও খাঁটি সাইবেরিয়ান ধরনের রেস্ট্রোরেন্ট ও ভদ্‌কার আড্ডাখানা টুরিস্টদের কাছে সত্যি আকর্ষণীয়। আর মেয়েদের প্রাণখোলা হাসি ও ঢলাঢলি সেটাও উল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও আমাকে ছাড়তে হল ইরকুট্‌স্‌ক।

এখান থেকে বাইকাল হ্রদ ধরে ছোট নৌকাতে বা মোটর বোটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু তাতে আমার কাজ হবে না। অনেকে পরামর্শ দিল যে আর পনেরো কুড়ি দিন পর এখানকার নদীগুলো জমে যাবে তখন বল্গা হরিণের শ্লেজ নিয়ে যাওয়া যাবে। বাইকালের ওপর দিয়েই তখন শ্লেজ যাতায়াত করবে। খরচ কম। মনে মনে ভাবলাম পরামর্শটা খারাপ নয়। কিন্তু এ বছরই ডিসেম্বরে আমাকে যেতে হবে ল্যাপল্যাণ্ডে। কাজেই ঠাণ্ডার জন্য অপেক্ষা না করে এখনই যেতে হবে।

ইরকুট্‌স্‌ক একটা পাহাড়ি এলাকা। দক্ষিণে পাহাড়ি দেওয়াল আর পূর্বদিকে বাইকাল হ্রদ, উত্তরদিকে সরাসরি যাবার রাস্তা নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে পশ্চিমের পথ ধরতে হল। পর্যটকদের আর একটা অসুবিধা হচ্ছে যে এখানে টুরিস্ট অফিস থাকলেও কোন সঠিক ইনফরমেশন পাওয়া মুশকিল। একমাত্র ভাষা রাশিয়ান বা রুশ্‌কি। ছোট খাটো হোটেল প্রচুর, সস্তায় থাকা খাওয়া যায়। এখানে ট্রেনপথ নেই, এ্যারোফ্লোট ও বাস একমাত্র ভরসা। অবশ্য কালেকটিভ্ হেলিকপ্টারের সুবন্দোবস্ত আছে।

সাইবেরিয়ার খাঁটি এস্কিমোদের পেতে হলে আমাকে যেতে হবে আরও উত্তরে অর্থাৎ আর্কটিক সারকেলের কাছাকাছি। সেখানে যেতে হলে আর উপযুক্ত টুরিস্ট

ইন্‌ফরমেশন পাবার জন্য আমাকে যেতে হবে ব্রাট্‌স্‌ক (Bratsk) শহরে। এখান থেকে দূরত্ব প্রায় তিনশ ষাট কিলোমিটার (৩৬০ কি.মি.)। বাসে লাগবে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা। দিনে দুটো বাস ওই পথে যায়। একটা সকাল আটটায় ছাড়ে আর একটা দশটায়। আমি দশটার বাস ধরলাম। দূরপাল্লার বাস আমাদের দেশের 'ডিলাক্স' বাসের মত তবে ইঞ্জিন আরও মজবুত। মালপত্র বাসের পেটেই ধরে গেল। আমি সামনের একটা সীটে জায়গা পেলাম। বাসের যাত্রীদের এবং তাদের মালপত্র দেখেই বোঝা যায় যে এরা সবাইই গ্রাম ও শহরতলীর লোক। বাস ঠিক সময়েই ছাড়ল। সুন্দর পাহাড়ি রাস্তা। আংগারা নদীর ধার ধরেই রাস্তা। দূরে পাহাড়ের ঢেউখেলা দৃশ্য আর মাঝে মাঝে পড়ছে বিশাল বিশাল চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি। রাস্তা পাহাড়ি হলেও প্রশস্ত। গাড়ী সত্তর কখনও কখনও আশী কিলোমিটার স্পীড নিয়ে এগুতে লাগল। ডিজেন এঞ্জিন কাজেই শব্দের কথা নাই বা লিখলাম।

প্রথম স্টপেজের নাম আংগারস্‌ক্‌ (Angarsk)। নদীর নামানুযায়ী। রাশিয়ান ভাষায় নদীর নামের সাথে স্‌ক্‌ (Sk) অর্থাৎ এস্‌ ও কে যুক্ত করলে হয় শহরের নাম। যেমন আংগারা নদী, শহর আংগারস্‌ক্‌, লেনা, লেন্‌স্‌ক্‌, ইয়েনিসেয়ী, ইয়েনিসেইস্‌ক্‌ ইত্যাদি। বাস থেকে লোক নামল, উঠল, বাস দাঁড়াল মাত্র দশ মিনিট। পরের শহরগুলো সিব্রিস্‌কয় (Sibriskoy), জালার (Zalar)। আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছেন তিনি গম্ভীর মানুষ। কাজেই কথাবার্তার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। পাহাড়ি রাস্তা আস্তে আস্তে সরু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। রাস্তা একঘেয়েমীতে পরিণত হয়েছে। দুপুরে সিব্রিস্‌কয়ে থামলাম খাবার জন্য। দুপুর মানে প্রায় পৌনে একটা। তারপর আবার চলা। সন্ধ্যার পর আমরা থামলাম জালারে। বাস স্ট্যাণ্ডের আশে পাশে অসংখ্য ছোটখাটো হোটেল। মাত্র তিন ডলারে পেয়ে গেলাম সুন্দর বিছানা, রাতের খাবার ও ব্রেকফাস্ট। রুটি, মাংস আর বাঁধাকপি। সকালে চা, রুটি, মাখন, ফল। রুবল্‌ এর হিসেব করতে হলে খাতা পেন্সিল লাগবে কারণ রুবল নামতে নামতে এখন এক ডলার সমান আট হাজার রুবল। রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট আমলেও ডলারের চাহিদা ছিল কিন্তু ব্যবসায়ীরা ডলার চাইবার আগে এদিক ওদিক তাকিয়ে তারপর কথা বলত। পেরেস্ট্রয়কার পর সব কিছুই খোলা, লুকোচুরির ব্যাপার নেই। পরের দিন সকাল ৮টায় আমাদের বাস ছাড়ল। আমরা ব্রাট্‌স্‌কে (Bratsk) পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারোটায়। ইরকুট্‌স্‌কের তুলনায় এখানে শীতের মাত্রা আরও বেশী। এ্যারোফ্লোটের অফিস খোলাই ছিল। আমার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। রিজার্ভেশনের ভদ্রলোক ভাল ইংরেজী বলেন। তাকে খুলে বললাম। তিনি আমার কথা শুনে উৎসাহিত হলেন আর সেই সাথে সাথে আমার পাগলামির জন্য কিছুটা ঠাট্টাও করলেন—আমার মালপত্রগুলো দেখে বললেন—"আপনার এই ওয়ান্‌ ম্যান এক্সপেডিশনের সরঞ্জাম কিছু দেখছি না তো?

—আমার এটা মোটেই এক্সপেডিশন নয়, এ্যাডভেঞ্চারও না। আমি একজন সাধারণ ট্রাভেলার মাত্র। সাইবেরিয়ান এস্কিমোদের সাথে কয়েকদিন থেকে তাদের

দৈনন্দিন জীবনের সাথে কিছুটা পরিচিত হতে চাই। আমার বিরাট কোন অ্যামবিশান বা লক্ষ্য নেই। আমার মূল উদ্দেশ্য ভ্রমণ আর তারই মাধ্যমে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন। ভদ্রলোক আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন তারপর আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো বিরাট পুরোনো কম্যুনিস্ট আমলের ম্যাপটা দেখিয়ে বললেন—"আপনি আছেন এইখানে। সত্যিকারের সাইবেরিয়ান এস্কিমোদের দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে আরও উত্তরে আর্কটিক্ সারকেলের কাছাকাছি যে কোন শহরে। এখান থেকে এ্যারোফ্লোট সার্ভিস আছে তবে দৈনিক নয় সাপ্তাহিক অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিন।" অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আলোচনা হল শেষে অন্য কোন উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে ভদ্রলোকের উপদেশ মত উত্তর সাইবেরিয়ার নরিলস্ক (Norilsk) শহরের উদ্দেশ্যে তৈরি হলাম। পরের দিন বিকেল তিনটেয় ফ্লাইট। সময় লাগবে প্রায় দু'ঘণ্টা। দূরত্ব এক হাজার তিনশ কিলোমিটার। টিকিটের দাম দুশ (200$) ডলার। ম্যাপেই দেখলাম যে আমাকে যেতে হবে ইয়েনিসেয়ি নদীর সংগম পর্যন্ত। ম্যাপে আমার আর একটা ভুল ধরা পড়ল সেটা হচ্ছে ইরকুট্স্ক শহরটি বাইকাল হ্রদের সর্বদক্ষিণের শহর নয়, হ্রদটি দক্ষিণে আরও প্রায় একশ কিলোমিটার পর্যন্ত নেমে গেছে। দক্ষিণের পাহাড় থেকে নদীগুলো নেমে এসে সৃষ্টি করেছে বাইকাল হ্রদ। সাইবেরিয়ার বিখ্যাত নদী লেনা (Lena) আংগারার আরও উত্তরে এবং লেকের পশ্চিম দিক থেকেই শুরু হয়েছে। এ্যারোফ্লোটের ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন যে এটা দক্ষিণ সাইবেরিয়ার ছোট্ট একটি পার্বত্য শহর কাজেই প্লেনের প্যাসেঞ্জার কম। এখান থেকে মধ্য সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কালেকটিভ্ হেলিকপ্টার সার্ভিস আছে তবে তাতে ফেরার কোন ঠিক নেই।

রাত্রিবেলা একটা ছোট হোটেলে উঠলাম। আমি একাই বিদেশী শুধু তাই নয় আমার শরীরের গঠন দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছে আমি বহুদূর থেকে এসেছি। হোটেলে পাঁচ ডলারে পেয়ে গেলাম বেড এ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট। ছোট্ট শ্রমিক শহর অনেকটা ইরকুট্স্ক এর মতোই। আশে পাশে কয়েকটা কয়লার খনি আছে। রাস্তার ধারেই রয়েছে সারি সারি ট্রাক। আশে পাশে নিশ্চয়ই কোথাও ট্রেন লাইন আছে। নয়তো এত হাজার হাজার টন কয়লা কি করে রাশিয়ার অন্য অঞ্চলে চালান করা হবে।

পরের দিন সময় মতোই প্লেন ছাড়ল। প্লেনের জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকালাম। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে কয়েকটা নদী, মাঝে মাঝে হ্রদ। আর মাঝে মাঝে তীরের মত দাঁড়িয়ে ফার (Fir) এর বনভূমি। মনে হচ্ছে একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষা ধনুকের ছিলায় তীরগুলো অবস্থান করছে। প্লেনটা ডি.সি-১০ এর মতো বেশ নীচু দিয়েই ফ্লাই করছে। প্রায় আধঘণ্টা পরই জানলা দিয়ে প্লেনের ডান দিকের দৃশ্য পরিবর্তন হতে দেখলাম। তারপর শুধুই সাদা—সাইবেরিয়ার প্রকৃত দৃশ্য শুরু হল। পাহাড় এর পরিবর্তে দেখা দিল একঘেয়েমী তুষারাবৃত সমতলভূমি। প্লেন প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পর নীচে নেমে এল। চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত সাদা বরফ তারই

মাঝে একটা বিরাট এয়ারস্ট্রিপ। কোন যাত্রী উঠল না নামল না মনে হল পোস্টাল ব্যাগ সার্ভিস। প্লেন আবার ছাড়ল প্লেনে এবার দেওয়া হল জলপান। বড় স্যান্ডউইচ্ কফি আর মিষ্টি বিস্কুট। এয়ার হোস্টেস সবাইই পুরুষ। প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা হল না।

সাইবেরিয়ায় এস্কিমোদের সাথে :

১৯৯৭ সালের ৩১শে অক্টোবর, শুক্রবার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমরা এসে পৌঁছলাম নোরিল্‌স্‌ক্ (Norilsk)। এয়ারপোর্ট শহর থেকে মাত্র আধঘণ্টা। বাস ট্যাকসির অভাব নেই। আমি বাসেই এলাম। আমার রুশভাষা যতটুকু জানা আছে তাতেই কাজ দিল। বাস একটা হোটেলের সামনে আমাকে নামিয়ে দিল। হোটেলের নাম পুতোরানা (Poutorana)। মাঝারি ধরনের হোটেল, ভেতরে রিসেপ্‌শনের পাশেই বিরাট চিমনিতে আগুন জ্বলছে, তারই পাশে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার। বিভিন্ন পানীয়কে কেন্দ্র করে সবাই গল্পে মশগুল। বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট দশ ডলার। হঠাৎ দামটা চড়ে গেল। রিসেপশনের ভদ্রলোকই মনে হয় ম্যানেজার ও মালিক। ইংরেজী ও জার্মান ভাষা মিশিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ডলারে পে করছি বলেই এত সস্তা, রুবল এ দিলে আরও অনেক দাম। সত্যি ভাগ্যই বটে! ভাগ্যিস যথেষ্ট পরিমাণে ডলার ক্যাশ এনেছিলাম। এই হোটেলে গরম জল সব সময়ই পাওয়া যাবে এটা একটা সান্ত্বনা। পরের দিন অর্থাৎ ১লা নভেম্বর সকাল বেলা বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। তোষক গদি আটা, তার ওপর ভারী কম্বল। লেপটাই আসলে আমাকে বন্দী করে রেখেছিল মনে হয়। কোন পাখীর পালকে তৈরি খুব হালকা আর খুব গরম। বোতাম টিপতেই এক ভদ্রমহিলা হাসি মুখে ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। হাতের ট্রেতে বিরাট স্যাণ্ডউইচ্, কফি, জ্যাম-বাটার।

—"স্‌দোজ্‌দ্‌ভূইতে" অর্থাৎ সুপ্রভাত

—"স্‌দোজ্‌দ্‌ভূইতে"

টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে কাপে কফি ঢেলে বিদায় জানালেন। মুখশ্রী দেখেই বুঝলাম যে ইনি এস্কিমো অরিজিন। জলখাবার খেয়ে, শেভ-করে, দাঁত মেজে প্রস্তুত হয়ে বাইরে বেরোলাম। বেরোতেই প্রথম ধাক্কা খেলাম ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে। হঠাৎ যেন মুখের ওপর কে হাড় কাঁপুনি বাতাস ছুড়ে দিল। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকতে বাধ্য হলাম। শুধু সোয়েটার আনোরাফ্ হলেই চলবে না উলের অন্তর্বাস পড়তে হবে। তাই তো মনেই ছিল না যে আমি এখন আর্কটিক সারকেল পাড় হয়ে এসেছি। আর্কটিক সারকেল শুরু হয়েছে ৬৬ ও ৬৭ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে আর এই শহরটা অর্থাৎ নরিল্‌স্‌ক্ (Norilsk) এর দ্রাঘিমাংশ ৭০ ডিগ্রী। উপযুক্ত পোষাক পড়ে বেড়িয়ে পড়লাম এস্কিমোদের সন্ধানে। কিছুদূর এগুতেই পাশের একটা পার্কে দেখলাম বেশ কিছু সংখ্যক বল্‌গা হরিণ, ফরাসীতে বলে রেন্, ইংরেজিতে বলে রেইনডিয়ার (Rein deer)। দেখতে অনেকটা গরুর মত আর মাথায় হরিণের শিং। বিরাট শিং। তাদের

প্রশ্বাসে মুখের সামনে ধোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। বেশ বড় শহর গাড়ি, ট্যাকসি, বাস। সারি সারি ৩/৪ তলা বাড়ী, চওড়া রাস্তা আর অসংখ্য দোকান। রাস্তায়, ইনটুরিস্ট এর অফিস কোথায় জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে চলেছি। এক ভদ্রলোক পাশের একটা দোকান দেখিয়ে আমাকে বার বার সেখানে যেতে বললেন। প্রথমে ভেবেছিলাম দালাল ধরনের কেউ হবে কিন্তু পরে বুঝলাম যে না ভদ্রলোক আমাকে উপকার করবার জন্যই এগিয়ে এসেছেন।

দোকানে বিদেশী জিনিসে ভর্ত্তি বিশেষ করে ফ্রেঞ্চমেড্ জীন ভেস্ট বিরাট স্টক। আর পেছনে রয়েছে ফরাসী মদ্য, বোজোলে কোত্ দু রোন ইত্যাদি। দোকানদার আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন। আমি তাকে দেখেই ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম

—"পার্লে ভূ ফ্রাঁসে" (আপনি কি ফরাসী বলেন?)

—"বিয়েঁ স্যুর" (নিশ্চয়ই বলি)

শুরু হল আমাদের আলাপ। আমি তাকে আমার উদ্দেশ্য খুলে বললাম, তিনি সব শুনে বললেন—

—আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে না, আপনি সাইবেরিয়ার মূল কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছেন। এই শহরের অধিকাংশই এস্কিমো। এস্কিমোদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। তারা আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করতে পারবে। তবে অসুবিধা হচ্ছে এখানে ইংরেজী বলা লোকের অভাব। জানেন তো সেটা ক্যাপিটালিস্ট ভাষা। তবে ফরাসী ভাষী দু'একজন পেতে পারেন। আর আপনি যদি কলেজের কোন প্রফেসরকে ধরতে পারেন তাহলে তো ভালই।

—আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। তিনি উপযাচক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কোন হোটেলে উঠেছি, কতদিন থাকব ইত্যাদি। ভদ্রলোক প্রায়ই প্যারিসে যান। তিনি সাইবেরিয়ান খড়গোষের চামড়া প্যারিসে বিক্রি করেন। কাজেই ফরাসী ভাষা তার রপ্ত। তারই নির্দেশে আমি ওখানকার কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে এলাম। দু'তলা বাড়ির পুরোটাই দপ্তর। এটা সরকারী দপ্তরখানা। অনেকটা আমাদের দেশের মতোই অবস্থা। সবাই আশে পাশের সহকর্মীদের সাথে কথায় ব্যস্ত। কেউ চেয়ারে বসে আর কেউ টেবিলে বসে বেশ আড্ডা জমিয়েছে। তাদের সকলেরই দেহে এস্কিমো ছাপ। বুঝলাম এরা এস্কিমো হলেও তাদের কালচারাল হেরিটেজ থেকে অনেক দূরে। তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে "রুশ"-এ পরিণত হয়েছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর একজনকে পেলাম যিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন এখানকার আঞ্চলিক ভাষা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি ঠিকানা দিলেন, আমার খুঁজতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এস্কিমো ভাষা পরিষদের "রুশ" নামানুযায়ী না খুঁজে আমি জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—

—"তয়কা গাভারিচ্ পার ডল্গান" আর ভদ্রলোকের নামটা লিখিত কাগজে দেখাতে লাগলাম।

আমার ভাষার অর্থ আপনি কি ডল্‌গান ভাষা জানেন? ভদ্রলোকের নাম—মিশাভ্‌স্‌বায়ো (Mr. Mishavsbaya)। শেষে ঠিক জায়গায় এসে পৌছলাম। ভদ্রলোক সরকারী কর্মচারী। একজন উচ্চপদস্থ এবং সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি এস্কিমোদের ভাষা সমস্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। ফরাসী ভাষা জানেন, ইংরেজীও বলেন। মস্কোতে তিনি সরকারী ল্যাংগুয়েজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। ১৯৯১ সালের পর সরকারের বিরাট পরির্তন হয়েছে এবং তিনি এই অঞ্চলে চলে এসেছেন আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে। তিনি নিজেও অরিজিনালি এস্কিমো। তিনি আমার উৎকণ্ঠা ও উৎসাহ দেখে খুবই খুশি হলেন বিশেষ করে এটা তারই বিষয়। তিনি আমাকে কথা দিলেন, যে কোনদিন বিকেলের দিকে তার ওখানে আসতে পারি। উন্মুক্ত দ্বার। কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দরকার হবে না। হোটেলে ফিরে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কি আশ্চর্য পরিবর্তন! কোথায় U.S.S.R-এর কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ আইন আর কোথায় আজকের C.I.S (Commonwealth of Independent States)। রাশিয়া বহু বিভক্ত হলেও মূল রাশিয়া অর্থাৎ আজকের রাশিয়ান ফেডারেশন যার রাজধানী মস্কো—সম্পূর্ণ সাইবেরিয়া যার অধীনে সেও আজ উন্মুক্ত। দশ বছর আগে ভাবতেই পারিনি যে একদিন রাশিয়ায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘুড়ে বেড়াতে পারবো। বার বার তাই প্রণাম করি স্বাধীনচেতা মহানায়ক গোর্বাশেভ্‌কে, শ্রদ্ধা জানাই তার আন্দোলনকে। আগে আমার মত যারা রাশিয়া সফর করেছেন তারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। আজ যেমন নিজের ইচ্ছায় যখন যার সাথে খুশি দেখা করছি মন খুলে কথা বলছি, যখন যেখানে খুশি যাচ্ছি। ১৯৯১ সালের আগে সেটা ছিল স্বপ্নাতীত।

আমার পোষাকের মধ্যে আছে খাঁটি ফাইন উলের লঙ লেগিং, লং গেঞ্জি, ল্যাপ-সার্ট, ভারী মোজা ও স্নো-প্রুফ জুতো। লেদার হ্যাণ্ড গ্লাভস, উলের কান ঢাকা টুপী, উলের সোয়েটার আর সর্বোপরি প্যাণ্ট ও আনোরাক কমবাইন সুট। পীঠের ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে আছে স্নো-প্রুফ শ্লীপিং ব্যাগ প্রয়োজনবোধে চাদরের মত ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়তি জাংগিয়া, গেঞ্জি, সার্ট, প্যান্ট, টয়লেট ব্যাগ যাতে আছে ব্যাটারী শেভিং সেট, টুথ ব্রাশ, পেস্ট, চিরুণী, ফার্স্টএইড কিড়, ভেজলিন ও হাই অল্‌টিচুড ক্রীম। কাগজপত্রের মধ্যে আছে পাশপোর্ট, কয়েকটা প্রেস ক্লিপিং, আমেরিকান একস্‌প্রেস্‌ কার্ড, পাঁচশ ডলার ক্যাশ, এ্যারোফ্লোটের একটা ওপন্‌ টিকিট। ছোট্ট একটা পকেট ক্যামেরা, ফ্লাস্ক ও কুকিং সেট, আর একটা ভারী ডায়েরি। রাতের জন্য আছে উলের পায়জামা। পীঠের ব্যাগের ওজন পনেরো কিলোগ্রাম মালপত্র সমেত। মিসাভ্‌ সবাই এই নামেই তাকে ডাকে। তারই মাধ্যমে এবং সাহায্যে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে লাগলাম এস্কিমোদের সাথে আর জানতে পারলাম তাদের বিষয়।

নোরিল্‌সক্‌ পৌছবার পর থেকে একটা জিনিস বার বার লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে আমার হাতের আঙ্গুলের অবস্থা। বাইরে বা চায়ের দোকানে বসে আমার লেখার স্বভাব—কিন্তু এখানে কিছুতেই কলম ধরতে পারছি না। দস্তানার থেকে হাত বার

করলেই যেন জমে যায় রক্ত। লেখা তো দূরের কথা ভাল করে কলম ধরতেও পারি না। এমন দুরবস্থা গ্রীণল্যাণ্ডেও হয়নি। এখানকার শীতটা যেন রক্তকেন্দ্রিক। যেমন করেই হোক রক্তটাকে জমাট করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। বার বার ভুলে যাই যে আমি এখন আর্কটিক সারকেলের অনেক ওপরে। এখানকার শীত হাড় কাঁপানো শীত নয়, বুকের রক্ত জমাট করার শীত। হোটেলে আমাকে ছোট হিটার দিয়েছে। হোটেলের সব ঘরই অয়েল হিটারে গরম তা সত্ত্বেও ঠাণ্ডাকে সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনা যাচ্ছে না।

নোরিল্‌স্ক শহরটি মাঝারি ধরনের। সব রকম সরকারি অফিস রয়েছে বিশেষ করে এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিভাগের এটাই মূল কার্যালয়। রাস্তায় বা বারে ঢুকলে দু'একজন ফরাসীভাষী লোক পাওয়া যায়। আমার পক্ষে সুবিধাই হল। শহরতলীতে যাওয়ার জন্য বাস ও ট্যাক্‌সির অভাব নেই। রাস্তাঘাট পরিষ্কার, দৈনিক বরফ পড়ে না, তবে যখন বরফ পড়তে থাকে তখন বরফ গলবার মত উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে বরফ জমে যায়। অর্থাৎ তুষারপাতের দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই সেই হালকা পেজা তুলোর মতো তুষার শক্ত বরফে পরিণত হয়। তুষারপাত হয় সাধারণত ০° সেন্টিগ্রেডে আর এখানকার তাপমাত্রা এখন অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মাইনাস দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-10^0C)।

হোটেলের মালিক খুবই ভদ্র এবং মিশুকে। কিন্তু এই অঞ্চলে উদার বিনয়ী কথাগুলো একমাত্র অভিধান ছাড়া পাওয়া যাবে না। হোটেলের পেছন দিয়ে আর একটা রাস্তা শহরের বাইরের দিকে গিয়েছে। সে রাস্তা ধরেই এগুতে লাগলাম। পনেরো মিনিট চলার পরই রাস্তার রূপ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। পীচের রাস্তাটা আস্তে আস্তে পরিণত হল বরফে। এই অঞ্চলে বরফ গলাবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির লবন (Salt) পড়ে না। এখানে রাস্তাটা শেষ হয়নি কিন্তু পুরো বরফে ঢাকা। চারদিকে ধুধু করছে মাঠ দিগন্ত বিস্তৃত শুধু সাদায় সাদা। আরও এগুতেই চোখে পড়ল একটা শ্লেজ গাড়ির আড্ডা। একটা দুটো নয় পনেরো বিশটা। এক একটা শ্লেজে তিন-চারটে বল্‌গা হরিণ। একটা মাঠের মধ্যে হঠাৎ যেন শ্লেজগুলোকে জড়ো করা হয়েছে আরও একটু এগুতেই নজরে পড়ল একটা সাদা কাঠ ও টিনের ঝুপড়ি। মালিকেরা সেই ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে ধুমপান করছে আর পাশেই গ্যাসের স্টোভে জল ফুটছে চা বা কফির জন্য। আমাকে দেখেই সবাই আমার দিকে তাকাল। আমি সুপ্রভাত জানিয়ে হাতের ক্যামেরাটা দেখিয়ে বললাম "কয়েকটা ছবি তুলব মানে শ্লেজগুলোর"। তারা আমার চেহারা দেখেই বুঝেছে যে আমি খদ্দের নই।

বল্‌গা হরিণ—হরিণ হলেও চেহারায় হরিণের পাঁচগুন। তাদের চীৎকার আর শ্বাসপ্রশ্বাসে সেখানে ধোয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়েছে। মাথায় বিরাট শিং, মনে হচ্ছে গাছের মড়া ডাল মাথায় আটকে দেওয়া হয়েছে। শ্লেজগুলো ভাড়া খাটে। গাড়ীতে পেছনের চাকা নেই, অনেকটা নৌকোর মত বরফের ওপর পিছলে চলে। শক্ত কাঠের তৈরি দুদিকে মূল ফ্রেমের তলা লোহা দিয়ে বাঁধানো, শহরের রাস্তায় চলে না তাই

শহরের বাইরে তাদের স্ট্যাণ্ড। মেইন রোড ছাড়া রাস্তা পরিষ্কার করা হয় না। ট্রাকটারের মত বড় বড় চাকা ছাড়া এ অঞ্চলে গাড়ি চালানো মুশকিল। মোটর বা ট্যাক্সি থাকলেও তাদের স্নো টায়ার বা চেইন ছাড়া উপায় নেই। শহরের বাসগুলো সবই স্নো বাস অর্থাৎ চাকার পরিবর্তে চেনে চলে। দূরপাল্লার বাস বা ট্রাক অক্টোবর মাস থেকে বন্ধ। শুধু প্লেন বা হেলিকপ্টারে যাতায়াত করে। তবে উত্তরে জলপথে আইস ব্রেকার সারা বছরই থাকে, তারাই জলপথ বরফ কেটে পরিষ্কার রাখে। জাহাজ চলাচল বছরের নয়মাস প্রায় অব্যাহত থাকে। আর্কটিক সাগরের রাশিয়ান আইস্ ব্রেকার পৃথিবীবিখ্যাত। বলতে গেলে পৃথিবীর সেরা আইস্ ব্রেকার। উত্তর রাশিয়ার এই সাইবেরিয়ার খনিজ দ্রব্য আর্কটিক সাগরের জলপথেই সুদূর সেন্টপিটারস্বুর্গ হয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দিকে যায়। আমি বল্গা হরিণের কিছু ছবি নিয়ে আবার ফিরলাম হোটেলে।

দু'দিন পর মিশাভ্ আমাকে বিকেলে ভদ্কা পানের জন্য ডাকলেন। আমি যথারীতি তার বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লাম। তাঁর কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে দরজা খুলে আমাকে আপ্যায়ন করল। ঘরে ঢুকে দেখি আরও পাঁচজন ভদ্রলোক এবং দু'জন ভদ্রমহিলা সেখানে উপস্থিত। আস্তে আস্তে সকলের সাথে পরিচিত হলাম। ভদ্রমহিলাদ্বয় একজন শিক্ষিকা, আর একজন কো-অপারেটিভের কর্মচারী। ভদ্রলোকদের মধ্যে শিক্ষক, ব্যবসাদার, কো-অপারেটিভের কর্মচারী। আর দুজন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। মিশাভ্স্কার মুখেই তাঁরা শুনেছেন যে আমি ভারতীয় এবং সাইবেরিয়ার এস্কিমোদের সম্পর্কে জানবার জন্য সেখানে উপস্থিত। তাঁরা সকলেই ভারতের বিষয়ে অল্প-বিস্তর জানে তবে ভারতীয় একজনকে এই শহরে তাঁরা এই প্রথম দেখছেন। সাধারণতঃ ফরাসী, জার্মান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আজকাল দু'একজন উৎসুক পর্যটক এখানে আসতে শুরু করেছে। চার বছর আগে নিকোলা ভানিয়ে (Nicolas Vanier) নামে একজন অভিযাত্রী সাইবেরিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত কুকুরের শ্লেজ নিয়ে অভিযানে এসেছিল, তাকে ফলো করছিল মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার। নিকোলা ভানিয়ে বাইকাল লেক থেকে শুরু করে পায়ে হেঁটে, নৌকোয় ও কুকুরের শ্লেজে জানা (Jana) নদী ফলো করে আর্কটিক সী পর্যন্ত এসেছিল। ফেরার পথে এই শহরে পাঁচ-ছ'দিন ছিল। আমি তাদের নিরাশ করে দিয়ে বললাম—নিকোলার সাথে আমার তুলনা করবেন না। আমি একজন অতি সাধারণ পর্যটক, ট্রাভেলার মাত্র। আমার বিরাট কোন অভিযানের পরিকল্পনা নেই। আমি মনের আনন্দে ভ্রমণ করি আর ভ্রমণকালীন আমার যে পারিপার্শ্বিক যোগাযোগ সেটাই আমার অভিজ্ঞতা, সেটাই আমার লাভ।

টেবিলে ভদ্কা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ফলের রস, কফি ও চা। যার যেমন খুশি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের আলাপ বেশ জমে উঠল। তাদের প্রশ্ন ভারত সম্পর্কে আর আমার প্রশ্ন সাইবেরিয়ার এস্কিমো। আমি তাদের আলোচনার থেকে যা জানতে পারলাম সেটাই লিখলাম।

সাইবেরিয়ার এস্কিমো প্রসঙ্গে :

—"কম্যুনিষ্ট আমলে সাইবেরিয়ার এস্কিমো বলে আলাদা সরকারী ডকুমেন্ট বিশেষ কিছু নেই। রাশিয়ার নাগরিক সবাই রাশিয়ান। তাদের আলাদা এথ্‌নিক্ গ্রপ হিসেব স্বীকৃতি দিলে হয়তো একদিন আলাদা অঞ্চল বা প্রদেশের প্রশ্ন আসতে পারে—তাই সরকার সেদিকে খুব হুঁশিয়ার ছিল।"

আমি তাদের প্রশ্ন করলাম—

প্র:—কিন্তু কম্যুনিষ্ট আমলেও কাজাক্‌স্তানের কাজাক্, তুর্কমেনিস্তানের তুর্ক, উজ্‌বেকিস্তানের উজ্‌বেক্, কিরগিজ্, তাজ্জিক্ ইত্যাদি এথ্‌নিক গ্রুপকে সরকার মেনে নিয়েছিল। এস্কিমোদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হ'ল কেন?

উত্তর—"ঠিকই ধরেছেন, দক্ষিণের ওই সব প্রদেশগুলোর নিজস্ব ভাবধারা, সমাজ গঠন ও ঐতিহ্য ছিল তাই তাদের দাবী এড়ানো যায়নি কিন্তু এস্কিমোদের ক্ষেত্রে সে সব কিছু ছিল না, আজও নেই। তাদের পেছনে কোন সংগঠনিক ক্ষমতা বা রাজনৈতিক নেতা অথবা নিজস্ব স্থায়ী ভূমি কিছু ছিল না। তারা যাযাবর কাজেই কোন দাবী ছিল না। আর যেহেতু দাবী ছিল না সেজন্য সরকার তাদের রাশিয়ান নাগরিক হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাদের প্রতি কোনরকম অবিচার করা হয়নি।

প্র:—আমি একজন সাধারণ পর্যটক হিসেবে যা জানি সেটা হচ্ছে যে সাইবেরিয়ার এই অঞ্চলটা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এলাকা। এখানকার খনিজ দ্রব্যের কথা পৃথিবীর সবাই-ই জানে। এখানকার তেল ও গ্যাসের ডিপোজিট সম্পূর্ণ রাশিয়ান কমনওয়েলথের যত তেল ও গ্যাসের ডিপোজিট আছে তার অর্ধেকেরও বেশি। এই বিরাট ধনী এলাকাকে রাশিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে রক্ষণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা। আমার মতে সেটাই হয়তো কম্যুনিষ্ট সরকারের মূল নীতি ছিল। যাইহোক বর্তমান এস্কিমোদের অবস্থা আমাকে কিছু বলুন। পুরনো কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

উত্তর—এখানকার এস্কিমোরা সংঘবদ্ধভাবে কোনদিন স্থায়ী ভূখণ্ড বা তাদের ঐতিহ্য বাঁচাবার কথা উল্লেখ করেনি। তারা স্বাধীনচেতা এবং শিকার করে জীবনযাপন করেই আনন্দে থাকে। সাইবেরিয়ার এস্কিমোরা দু'ভাগে বিভক্ত। একদল রেন্‌ডিয়ার বা বল্‌গা হরিণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। বল্‌গা হরিণই তাদের সম্পত্তি। একাধারে খাদ্য, আর অন্যদিকে তার চামড়া, মাংস ও শিং-এর ব্যবসা। আর দ্বিতীয় ভাগ মাছ ও জলজ জীবজন্তুর শিকারী।

প্র:—সাইবেরিয়ার এস্কিমো কারা?

উত্তর:—আমাদের মধ্যে একমাত্র ভ্‌লাদিমির ছাড়া সবাইই এস্কিমো। সাইবেরিয়ার এস্কিমোদের চিনবার উপায় এদের ভাষা। এই অঞ্চলে দু'রকম ভাষা প্রচলিত, দোলগান (Dolgan) ও নেনেত্ (Nenett)। এই দুই ভাষার জন্যই এস্কিমোদের দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়। আমাদের এই অঞ্চলে আমরা সবাইই দোলগান

সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ তাইমুর পেনিন্সুলার এস্কিমোদের বলে দোলগান। আমাদের পূর্বে ও পশ্চিমে নেনেত্ সম্প্রদায়। সত্যিকথা বলতে গেলে রাশিয়ার আর্কটিক সারকেলের সবাইই এস্কিমো।

প্রশ্ন :—কবে থেকে আপনাদের অতীতে জীবনধারার পরিবর্তন এসেছে ঠিক করে বলতে পারবেন?

উত্তর :—"(মিশাভ্স্কায়) আমাদের বংশে পরিবর্তন এসেছে আমার ঠাকুর্দার আমলে। আমার বাবা তখন ছিলেন ছোট। আমাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল বল্গা হরিণ চড়ানো। আমাদের সীমানা ছিল জানা ও লেনা নদীর মধ্যবর্তী সমতলভূমিতে। ১৯২৫ সাল থেকে সরকারি সহযোগিতায় ও উৎসাহে বল্গা হরিণের ব্যাপক পালন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। আমার ঠাকুর্দা এখান থেকে কয়েক'শ মাইল দূরে একটা বিরাট জায়গা সরকারের তরফ থেকে ইজারা নেন। প্রায় একহাজার বল্গা হরিণের মালিক ছিলেন তিনি। ১৯৩০ সালে এই পশু ব্যবসা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কিন্তু ভাষা সমস্যার জন্য ব্যবসায়ে অসুবিধা। তাই ঠাকুর্দা আমার বাবা ও দুই কাকাকে এখানে নিয়ে আসেন লেখাপড়া শেখার জন্য। আমাদের বংশে এই প্রথম রাশিয়ান্ ভাষা প্রবেশ করে কিন্তু বাড়ীতে সবসময়ই দোলগান ভাষায় কথাবার্তা হয়। পরে আমার বাবা আমাকে ও মাকে নিয়ে নোরিল্স্কে চলে আসেন। আর কাকারা থেকে যান তুন্দ্রা অঞ্চলে অর্থাৎ পশুপালনক্ষেত্রে। পশু বিক্রি ও সরকারের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ করতেন বাবা। পরে বাবা আমাকে উচ্চশিক্ষার জন্য মস্কো পাঠিয়ে দেন। আমি পড়াশুনা করে মস্কোতেই কাজ পেয়ে যাই। কাজেই বলতে গেলে ১৯৩০ সাল থেকেই বল্গা হরিণের ব্যাপক পশুপালন পরিকল্পনার জন্য সাইবেরিয়ার প্রায় ৮০ ভাগ এস্কিমো তাদের জীবনধারা পালটে ফেলেছে। বল্গা হরিণের পাল নিয়ে তারা আজ আর স্থান পরিবর্তন করে না। একই জায়গায় বসবাস করে।"

প্রায় দু'ঘণ্টা পর আমাদের পরিচয় ও আলোচনাপর্ব সেদিনকার জন্য থামিয়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম মিঃ মিশাভ্কায়কে। আমি যা চাইছিলাম তাই পাচ্ছি। পরের দিন আমি দুপুরে খাবার টেবিলে সঙ্গী পেলাম মস্কোবাসী আলেক্সকে। ভদ্রলোক এসেছেন মস্কো থেকে। পেশায় মেটালার্জিস্ট। ভাল ইংরেজি বলেন। কার্যোপলক্ষে প্রায়ই আসেন। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়ে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—

—"আমি একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। আমি সত্যি ভারতপ্রেমিক। মনে হয় ভারতে সবাইই জ্ঞানী পুরুষ, আর কলকাতার সবাইই কবি তাই না?"

আমি আলেক্স-এর কথায় সায় দিলাম।

—"আপনার কথাটা ঠিকই, ভারতের জাতীয় কবি কলকাতারই লোক আর ভারতে জ্ঞানী পুরুষও চারদিকে ছড়িয়ে আছেন। তবে কলকাতার সবাইই কবি নয় আর ভারতের সবাইই জ্ঞানী নয়। ভাল-মন্দ ছোট-বড় সব মিশিয়েই ভারত। যেমন আপনাদের রাশিয়া।"

ভদ্রলোকের সাথে ভারত বিষয়ে আর না গিয়ে আমি সরাসরি এলাম আমার এস্কিমো প্রসঙ্গে। তিনি সরাসরি জানালেন যে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না তবে এখানকার আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরীতে অনেক এস্কিমো কাজ করে। ওনার মতে এখানে (রাশিয়ায়) এস্কিমো কথাটা ঠিক উপযুক্ত নয়। এস্কিমো না বলে তাদের বলতে হবে সাইবেরিয়ার অধিবাসী, বা সাইবেরিয়ার শিকারী সম্প্রদায়। আলেক্সের মতে সাইবেরিয়ার অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী আর সরল মানুষ। ১৯৩০ সালের পর থেকে সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ পদার্থ দিনের পর দিন আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই বিরাট ইনড্রাস্ট্রির জন্য চাই হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তাই সরকার তুন্দ্রাঞ্চলের অধিবীসীদের সুযোগ দিয়েছে বিভিন্ন খনি ও কারখানায় কাজ করার। তাতে দু'দিক থেকেই লাভ হয়েছে। সরকার পেয়েছে পরিশ্রমী শ্রমিক আর তুন্দ্রার যাযাবররা পেয়েছে স্থায়ী আস্তানা আর সামাজিক সুযোগ সুবিধা। সাইবেরিয়ার অধিবাসীরা স্বভাবে যাযাবর। জীবন ধারণের জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবন ছিল ভীষণ কষ্টকর। সাইবেরিয়ার এই বরফের মরুভূমিতে পদে পদে ছিল জীবনের ঝুঁকি। তাদের কোনরকম স্কুলের বিদ্যা ছিল না কিন্তু তাদের সততা আর পরিশ্রমের ফলে আজ তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য রাশিয়ানদের মত তারাও আজ সম্মানীয় নাগরিক। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশুনা করছে, বড় হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ভাল ভাল পোস্টে কাজ করছে। অস্থায়ী ও বিঘ্ন জীবনযাপন থেকে আজ তারা অনেক দূরে সরে এসেছে। তারা আজ স্থায়ী ও নির্বিঘ্নে, শান্তি ও আনন্দে জীবন কাটাচ্ছে। আলেক্সের মতে এই পরিবর্তন একটা অস্থায়ী সম্প্রদায়কে স্থায়ীত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণভাবে এই থিওরী মানতে পারল না। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, যাযাবরদের অস্থায়ী জীবনে রয়েছে স্বাধীনতার চিরানন্দ, তাতে দৈহিক কষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মুক্তি ও বাঁধনছেঁড়ার আনন্দ। চার দেওয়ালের মধ্যে যারা মানুষ, ডিগ্রীর কাগজে যাদের অ্যাটাচিকেস্ ভর্তি—তারা বুঝবে না সেই মুক্তির স্বাদ। কাজেই আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম।

আলেক্স্ প্রসঙ্গক্রমে জানালো যে এই নোরিল্স্ক্ মস্কো ও অন্যান্য বড় শহরের সাথে রেলপথে যুক্ত। এখানে স্টেশন আছে সে কথা জানতাম না। এই অঞ্চলের জংশনের নাম দুদিনস্কা (Dudinska)। আলেক্স্ আমাকে বার বার করে পরামর্শ দিল নোভোসিবির্ক্স্ (Novssibirsk) যেতে। কারণ সেখানে সাইবেরিয়ান উপজাতি ও শিকারী মানুষদের কয়েকটা ভাল সংস্থা আছে। মাঝে মাঝে তারা সাইবেরিয়ার আঞ্চলিক গান-বাজনা ও নাটকের অনুষ্ঠান করে। নোভোসিবির্স্ক্ একটা বিরাট ইস্পাত নগরী। সেখানে কাজ করে অংসখ্য সাইবেরিয়ান। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধরে রেখেছে তাদের ট্রাডিশন। তিনি যখন শুনলেন যে, আমি আসছি ইরকুট্স্ থেকে তখন টেবিলে বিরাট আঘাত করে বললেন—"আপনি এত কাছে ছিলেন অথচ সাইবেরিয়ার মূল কালচারাল সেন্টার দেখলেন না। আমাদের টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট যে

কি করছে?" আলেক্‌সের মতে এত কষ্ট করে এতদূর না এসে আমি যদি দক্ষিণ সাইবেরিয়ার উল্লেখযোগ্য শহরগুলো ঘুরতাম তাহলেই সাইবেরিয়ার পুরো কালচারাল ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের সাথে পরিচিত হতে পারতাম। উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর নাম ক্রাসনৈয়ার্ক্‌স্ (Krasnoiarsk), নোভোসিবির্ক্‌স্ (Novossibirks), ওম্‌স্‌ক্ (Omsk) ও চেলিয়াবিন্‌স্‌ক্ (Tcheliabinsk)। মস্কো থেকে এই সব অঞ্চলে সরাসরি ট্রেন ও জাতীয় সড়ক রয়েছে। বলাই বাহুল্য এই শহরগুলো সবই কয়লাখনি, ন্যাচারল গ্যাস, তেল-লোহা-তামা-পেতল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ ও কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। আলেক্‌সের থেকে এই তথ্যগুলো পেলাম যেগুলো জানা ছিল না। তবে আমার উদ্দেশ্য আর্কটিকের বাসিন্দাদের সাথে পরিচিত হওয়া—তাই এতদূর আসা। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাঁধাকপির ঝোল আর বল্‌গা হরিণের মাংসের সাথে বিয়ার পান করে আমরা পরস্পরকে বিদায় জানালাম। বেলা দুটোর সময় আমি এলাম এ্যারোফ্লোটের অফিসে। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে অক্টোবরের শেষ থেকে এপ্রিল মে মাস পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্লেনের রেগুলার সার্ভিস বন্ধ। সেন্ট্রাল সাইবেরিয়ার কোন জায়গায় যেতে হলে হেলিকপ্টার ভাড়া পাওয়া যায়। তার জন্য নাম লেখাতে হয়—যদি উপযুক্ত সংখ্যক যাত্রী পাওয়া যায় তাহলে তারা একটা স্পেশাল ফ্লাইটের বন্দোবস্ত করে। এয়ারপোর্টের রানওয়েগুলো এখন বরফে ঢাকা পড়ে গেছে তার জন্য প্লেনের চাকায় নৌকোর মত "স্কী" ফিট করাতে হয়। বড় প্লেনের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, ছোট ছোট প্লেন যাতায়াত করে আর কম খরচায় আছে কালেকটিভ্ হেলি সার্ভিস। এ্যারোফ্লোটের ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন—"আপনি খারাপ সময়ে এসেছেন। এই অসময়ে কোন লোক বেড়াতে আসে? অবশ্য এ সময়ে হোটেলগুলো খুবই সস্তা।" তবে তিনি আমাকে বার বার করে আশ্বাস দিলেন উরাল বা পশ্চিমের দিকে যেতে হলে তাকে জানালে কোন অসুবিধা নেই। মস্কো, সেন্টপিটার্স্‌বুর্গ যেখানে খুশি। পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোতে গিয়ে আবার ধাক্কা খেলাম শীতের সাথে। মাথার টুপী ভেদ করে শীত ঢুকে মগজকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি হোটেলের দরজা খুলে আবার ঢুকে পড়লাম। ভেতরটা গরম, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ম্যানেজার আমাকে দেখে ইসারায় ডাকলেন। তারপর পাশের জানলা খুলে বাইরেটা দেখে থার্মোমিটার এনে দেখালেন—আমার অবাক হবার পালা। মাইনাস থার্টি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-30^0C)। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনি একটু হেসে বললেন—"সাইবেরিয়ার শীত এই তো সবে শুরু। এখানে অনায়াসেই -45^0 বা 50^0 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে।" ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি জিবো মার্কের পিওর উলের লম্বা হাতা গেঞ্জি, লিওতার মোজা পড়ে তার ওপর চাপালাম যথারীতি সোয়েটার, উলের প্যান্ট আর সবশেষে আনোরাক্ সেট্। পায়ে মুন বুট আর উপযুক্ত লোকাল দস্তানা। ম্যানেজার আমাকে তার বিরাট পশমী টুপিটা ধার দিলেন। নাকের ওপর ঘুরিয়ে দিলাম মাফলার, চোখে স্কী চশমা। শীতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম পথে। এখন শীতকাল কাজেই সূর্যের আলো নিভে গেছে। রাস্তায় চব্বিশ ঘণ্টাই মিটমিটে আলো তবে দিনের আলো কখনও কখনও স্পষ্ট হয়। সূর্যের

আলো না থাকলেও একটু চেষ্টা করলেই কাগজ পড়া যায়। সাইবেরিয়ার শীত পৃথিবীখ্যাত। কথায় বলে সাইবেরিয়ায় ব্রেন জমে যায়, এখানে ব্রেন আগের মত কাজ করে না। মস্কোর লোকেদের কাছে শুনেছি যে সাইবেরিয়ায় ব্রেন ওয়াশের জন্য কোন যন্ত্র না ব্যবহার করলেও চলে। এখানকার ঠাণ্ডাতেই ব্রেনের ক্রিয়েটিভ ক্যাপাসিটি আপনা থেকেই কমে যায়। আমার অবস্থাও কি সে রকম হবে? কি জানি? শুনেছি সাইবেরিয়ায় লোক পাঠায় শাস্তির জন্য আর আমি নিজেই এসেছি শান্তি নিতে। হয়তো কিছুটা কর্মফলের স্নান হবে।

আমি মিশাভ্স্কার বাড়িতে এলাম। উনি বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন। ভদ্রলোকের সাথে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তার বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলে। ছেলে এখন ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স্ ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে পড়াশুনা করছে। তাকে আমার সমস্যাটা খুলেই বললাম অর্থাৎ এই দারুণ ঠাণ্ডায় এবং উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে আমার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। কাজেই কি করা যায় এ বিষয়ে তিনি যদি আমাকে উপদেশ দেন তাহলে খুবই উপকৃত হব। ভদ্রলোক আমার সব কথা শুনে বললেন—“আপনি যখন নিজেই এসেছেন ভালই হ'ল। সেদিন অনেক লোকজন আসার জন্য আমার ছেলে ভিক্টর (Victor) আপনাকে কাছে পায়নি। ওরও কিছু বলার ছিল। এখন ও বাড়ি নেই। থাকলে ভালই হত। ভিক্টর আমাকে বলছিল আপনি যদি ওকে ফ্রান্সের ওর সমবয়সী কোন ছাত্রের বা ছাত্রীর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন তাহলে ও তার সাথে ওর লেখাপড়া বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারে। ও ফরাসী মোটামুটি জানে তবে বলার অভ্যাস নেই—মানে স্পীকিং পাওয়ার নেই।

—“কোন অসুবিধা নেই, আমি এক্ষুনি দুজনের নাম দিতে পারি তারাও পেন ফ্রেণ্ড পেলে খুশিই হবে।

—“কি ভাল কথা, ভিক্টর শুনলে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। এবার আসা যাক আপনার বিষয়ে। বলুন আমি কি করতে পারি।

—“আমি এ্যারোফ্লোটের অফিসে গিয়েছিলাম। তারা বলল যে এখন শীত পড়ে গেছে কাজেই যাতায়াতের পথ বন্ধ অর্থাৎ সাইবেরিয়ার এদিক ওদিক আর যাওয়া যাবে না। একমাত্র প্রাইভেট বা কালেকটিভ হেলিকপ্টার ছাড়া উপায় নেই। কাজেই আপনার উপদেশ চাইছি।

—“কথাটা ঠিক, এখন তো অফ্ সিজন্। হোটেলে দেখলেন তো দাম কত সস্তা। এক কাজ করা যেতে পারে, চলুন কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে—ওদের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলের পশুপালন কেন্দ্রগুলোর সাথে যোগাযোগ আছে।

মিশাভ্ তাড়াতাড়ি পোষাক পড়ে আমাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। রাস্তাঘাটে পোষাকের আবরণে কাউকে চেনা মুশকিল। প্রত্যেকেরই শরীরের ওপর চার পাঁচটা পোশাকের আবরণে ঢাকা। মুখের একমাত্র চক্ষুবাদে সবই ঢাকা। আমরা কিছুক্ষণের

মধ্যেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে এসে ঢুকলাম। দুজন ছাড়া সবাই বাড়ি চলে গেছে। তাতেই আমাদের কাজ হল। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে—একদিন পর এখান থেকে একটা ইন্স্পেকশন গ্রুপ যাবে কতুই (Kotoui) নদীর ধারের কয়েকটি ফার্ম পরিদর্শনে। হেলিকপ্টারে বারো জনের সীট। কাজেই জায়গা হয়ে যাবে। এখান থেকে একঘণ্টার পথ। মিশাভ্স্কা ডাইরেক্টরের বন্ধু। কাজেই তাকে বলে বন্দোবস্ত করে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আমি নতুন করে আশার আলো দেখলাম।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৭ সাল—দোল্গান এস্কিমোদের সাথে :

কো-অপারেটিভের হেলিকপ্টারে আমার জায়গা হয়ে গেল। সব শুদ্ধ ছ'ঘণ্টার প্রোগ্রাম। মিশাভস্কায়ের সৌজন্যেই এটা সম্ভব হল। মিশাভস্ক্'র প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বার বার জানালেও শেষ হবে না। উত্তর মেরুতে এখন দীর্ঘ ছ'মাস রাত্রি থাকবে। তবে মস্কোর সময় অনুযায়ী, ঘড়ি দেখে, দিন ও সময়কে ইউরোপের সঙ্গে তাল রাখা হয়েছে। দুপুর এগারোটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত দিনের আলোর মতো কিছুটা পরিষ্কার পাওয়া যায়—যেমন গোধুলি লগ্ন। হেলিকপ্টার বেলা এগারোটায় ছাড়লো। পাঁচজন যাত্রী আর পাইলট। যাত্রীদের কাউকে চিনি না। তবে তারা সবাইই আমার কথা শুনেছে এবং হাসিমুখেই তাদের টিমে আমাকে গ্রহণ করল। হেলিকপ্টার লো ফ্লাই করে এগিয়ে চলল। নোরিলস্ক্ শহরটার পুরো ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল। দুটো মেইন রোড, দু'পাশে বাড়ীঘর, দোকান। শহরের একদিকে বাস স্ট্যাণ্ড, তারই অনতিদূরে এয়ারপোর্ট, আর একটু দূরেই স্টেশন, আর তার পাশেই বিরাট কারখানা। এই অঞ্চলে আমি আগে আসিনি। আমার পাশের ভদ্রলোক অল্প-স্বল্প ফরাসী বলেন। তিনিই আমাকে নীচের দৃশ্য দেখিয়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ইয়েনিসেয়ি নদীটা এখানে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে কারা সাগরে গিয়ে পৌঁছেছে। সাদা বরফের রাজত্বে নদীগুলো থাকাতে একঘেয়েমী নষ্ট হয়েছে। নদী মানে বরফের রাস্তা। আমাদের হেলিকপ্টার এবার সরাসরি পূর্বদিকে মুখ করে চলল। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই পেলাম নীচের পাহাড়ি দৃশ্য। সাদায় সাদা। পাহাড়টাকে ডান দিকে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। মধ্য সাইবেরিয়ার এই উত্তরাংশে একটাই পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ের নাম পুতোরানা। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ একহাজার আটশ চুরানব্বই মিটার (১৮৯৪ মিটার)। আমি যে হোটেলে উঠেছি—এবার বুঝলাম যে এই পাহাড়ের নামানুসারেই হোটেলের নামকরণ হয়েছে। আকাশ ঘন মেঘলা ধরনের। নীচের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম যে অসংখ্য নদী-নালার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি অসম্ভব। আর তাছাড়া কাদের জন্যই বা করা। এখানে লোক বসতি একদম নেই। বরফের মরুভূমি। গরম কালে নীচের বরফ গলে গেলেও সামান্য ঘাস ছাড়া আর কিছুই গজায় না। এই অঞ্চলকেই বলা হয় সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে সাদা বরফের ওপর দেখা দিল অসংখ্য কালো কালো বিন্দু। পাশের ভদ্রলোক সেদিকে তাকিয়ে বললেন, কারিবু, কারিবু, রেন্ডিয়ার, রেন বা বল্গা হরিণ। একই জন্তু বিভিন্ন নাম। নীচে এইবার নামবার আগে হেলিকপ্টার অনেকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

চক্রাকারে ঘুড়তে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নীচে সারি সারি মশাল জ্বলে উঠল। ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের সংকেত পেতেই হেলিকপ্টার নীচে নেমে এসে বরফের ওপর হঠাৎ বসে পড়ল। নীচে ৮/১০ জন লোকের ছোট্ট একটা দল আমাদের আপ্যায়ন জানালো।

রেন্ ডিয়ার অ্যানিমেল হাস্‌বেণ্ডরী সেন্টার। ব্যারাক টাইপের কয়েকটা কাঠের ঘর আর তারপরই সারি সারি হেভি প্লাস্টিক কভারের হট হাউস। একটু দূরে আরও কয়েকটি হট্ হাউস নজরে পড়ল। আমরা সবাই মিলে একটা কাঠের ঘরে এসে বসলাম। ভেতরে একটা গ্যাসের হিটারে ঘরটাকে গরম রাখা হয়েছে। এখানকার লোকদের দেখেই মনে হল এরা এস্কিমো। কি ভাগ্য! ঠিক জায়গায়ই এসে পৌঁছেছি, আনন্দে মন ভরে গেল।

আমাদের দলে আমি ছাড়া চারজন। একজন পশু চিকিৎসক, একজন কেন্দ্রের পরিদর্শক আর দু'জন সহকারী। হেলিকপ্টারে যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনিই পশুর ডাক্তার এবং মনে হল দলনেতা। আমাদের সঙ্গে কেন্দ্রের জন্য চারটে পিস্‌বোর্ডের বাক্স ছিল। তারই একটা তাদের দেওয়া হ'ল। তার মধ্যে ছিল চা, কফি, চিনি, বিয়ার, ভদ্‌কা, সব্‌জি (শুকনো), আটা, যব, আত্মীয়দের চিঠি আরও টুকিটাকি অনেক কিছু। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে জেনে নিলেন এখানকার খবর আর অসুবিধার কথা। কোন পশুর অসুখ আছে কিনা, বর্তমানে কত পশু আছে, তাদের মজুদ খাদ্যের পরিমাণ, গ্যাসের বোতলের সংখ্যা, রেডিও কাজ করছে কিনা, বন্দুকের কার্তুস কত আছে ইত্যাদি। ফলের রস, বিস্কুট, চা এবং ভদ্‌কা আমাদের সঙ্গেই ছিল তা দিয়েই আমাদের জলপান হল। ওদের বাক্স থেকে কিছুই নেওয়া হল না। এবার আমি দুম্ করে আমার কথাটা তাদের মধ্যে ছেড়ে দিলাম।

—"আমি এখানে থেকে যেতে চাই অবশ্য আপনারা যদি অনমুতি দেন।"

আমার প্রশ্ন শুনে তারা সবাইই অবাক। ভাবটা—"লোকটা বলে কি?" "পাগল নাকি?" অনেকটা এই রকমের।

তারপর তাদের মধ্য থেকেই পর পর প্রশ্নগুলো আসতে লাগল।

—এই শীতে আপনার অভ্যাস নেই মরে যাবেন।

—আপনার ভাষা জানা নেই।

—এখানে সারাদিন কি করবেন? একঘেয়েমী।

তাদের আশ্বাস দিয়ে বললাম—

—আমি তো এর জন্যই এখানে এসেছি, আমার কোন রকম অসুবিধা হবে না। শুধু আপনাদের অনুমতি চাইছি।

আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম যে আমি বেশ কয়েকবার আর্কটিক সারকেলে এসেছি। নরওয়ে, গ্রীণল্যাণ্ড, আলাস্কা ও কানাডার এস্কিমোদের সাথে ছিলাম। কিন্তু সাইবেরিয়ায় এই প্রথম। আমাকে এই অভিজ্ঞতার সুযোগটা দিন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে

তাদের কন্‌ভিন্স করাবার চেষ্টায় সফল হলাম। তারা রাজি হলেন, এবার পালা ওখানকার অধিবাসীদের অর্থাৎ যাদের সাথে থাকব। আমার মনে হল তাদের যেন কোন মতামত নেই অর্থাৎ কর্তারা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমি তাদের এ্যারোফ্লোটের ওপ্‌ন টিকিট দেখিয়ে বললাম—"এখানে যখন রেডিও মেসেজ দেবার অসুবিধা নেই কাজেই একান্ত অসুবিধা হলে আমি এ্যারোফ্লোটকে বলবো আমাকে একটা লিফট্ দিতে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটির লোকেরা আসে আট দশদিন পর পর। কাজেই আমি এখানে আট দশদিন থাকতে পারব। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সবাইকেই রাজি করিয়ে আমি এস্কিমোদের সঙ্গে থাকার অনুমতি পেলাম। কি আনন্দ! বার বার ভাবতে লাগলাম রাশিয়ার কি আমূল পরিবর্তন। দশ বছর আগে এই ধরনের বন্দোবস্তের কথা ভাবাও যায় না। আধঘণ্টা পর হেলিকপ্টার দলবল নিয়ে বিরাট তুষারের ঘূর্ণি ঝড় বইয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশে। আমার চারপাশে আটজন লোক আপাদমস্তক পশুর চামড়ায় ঢাকা মুখের যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে স্ত্রী পুরুষ চেনার উপায় নেই। ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ভাষা মনে হয় এর আগে কোনদিন শুনিনি। ঘরের আবহাওয়া একটু গরম হতেই আমি আমার ওভারকোটটা খুলে নিজেকে হালকা করে নিলাম। ওভারকোটটা হোটেলের মালিক আমাকে ধার দিয়েছেন। তারপর আমার রুটস্যাক্ থেকে কিছু চকোলেট বিস্কুট বের করে ওদের দিলাম। বিনা সঙ্কোচে তারা গ্রহণ করল। ঘরের দুদিকে হিটার জ্বলছে। রান্না করার জন্য এবং ঘরের উত্তাপ রাখার একই বন্দোবস্ত। কিছু সসপ্যান, হাঁড়ি, বাটি, হাতা, চামচ, ছুড়ি, কাঁটা, গ্লাস, কাপ সব চারদিকে ছড়ানো। ঘরের চারদিকেই খণ্ড খণ্ড মাংস তারের হুকে ঝুলছে। দরজার পাশেই অনেকগুলো ভারী অল্‌প্রটেক্‌শন কোট জড়ো করা। ঘরটা ছ'মিটার লম্বা, চওড়া ওরকমই হবে তার বেশী নয়। আমরা চকোলেট খাচ্ছি আর মিটিমিট করে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি। এরকম করেই আমার প্রথম ভাব বিনিময় পর্ব শুরু হল। পরে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এদের মধ্যে চারজন পুরুষ আর চারজন মহিলা অর্থাৎ চার দম্পতি। কারও নাম জানলাম না। জানার প্রয়োজনও নেই। এস্কিমো বা নর্থপোলের অধিবাসীরা অনেকটা মঙ্গোলিয়ান ধরনের। তিব্বত-ভূটান-সিকিম ও নেপালীদের সাথে অনেকটা মিল আছে। আমেরি-ইণ্ডিয়ানদের সাথেও কিছুটা মিল আছে। কোন রকম কথাবার্তা না বলেও আমরা সেখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে ঘরের আবহাওয়া উপভোগ করলাম। তারপর আমি আমার ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। আমার দেখাদেখি তারাও তৈরি হয়ে নিল। আমাকে এগুতে দেখে ওদের একজন ইসারায় আমাকে দাঁড়াতে বলল। তারপর ঘরের পেছন থেকে বের করে নিয়ে এল একটা স্নো স্কুটার। আমাকে পেছনে বসিয়ে সেই নিঃশব্দলোকে হঠাৎ শব্দ সৃষ্টি করে স্টার্ট নিল। প্রায় দশমিনিট পর আমরা এসে হাজির হলাম এক বিরাট বল্‌গা হরিণের কলোনীতে। হেলিকপ্টার থেকে এদেরই দেখেছিলাম। স্কুটারের শব্দে অভ্যস্ত হরিণগুলো আমাদের

দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। তবে স্কুটারে চাপা পড়ার ভয়ে কাছাকাছি এলেও দৌড়ে পালায়। সংখ্যায় কত হবে কে জানে। একশ দু'শ নয় মনে হয় কয়েক হাজার। তাদের শিং-এর ভারে কারও মাথা নীচু, আর শিং-এর অহংকারে কারও মাথা উঁচু। আমার কৌতুহল হল এরা খাচ্ছে কি? ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে মুখ দিয়ে বরফের স্তর ভেঙে তার নীচে সামান্য ঘাসের শেকড় যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। কিন্তু এই সামান্য খাদ্যে এই শীতে ওই ভারী দেহটাকে কি করে রাখছে? কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আবার কলোনী ছেড়ে ফিরলাম।

সূর্যের আলো নেই। এখানে তিনমাস পুরো রাত হলেও সব সময়ই আমাদের হিসেবে দিনের বেলা আলোটা বেশি থাকে আর রাত্রে একদম অন্ধকার। কয়েকদিন থেকেই আমি দিন রাতের এই তফাৎটা বুঝেছি। ঘরে একটা ঘড়ি আছে, একটা ক্যালেণ্ডারও আছে কিন্তু কেউ দেখে না। ঘরের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যই মনে হয় রাখা হয়েছে। ঘরের বাইরে একটা থামের সঙ্গে আটকানো বিরাট সেন্টিগ্রেডের থার্মো-ব্যারোমিটার। সকলে সেটাই দেখে, শূন্য ডিগ্রীর নীচে তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাট-এর (-30^0, -40^0, -50^0,-60^0) পাশে বিভিন্ন রঙে দাগ কাটা আছে। লাল রঙের পারদ কাজেই সহজেই চোখে পড়ে। আমার মনে হয় পারদের এই ওঠা নামার ওপর নির্ভর করে তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী।

রান্নার জন্য রয়েছে বল্‌গা হরিণের মাংসের প্রাচুর্য, তাছাড়া রয়েছে নোরিল্‌স্‌ক্‌ থেকে আনা সসিস্‌, আলু, বাঁধাকপি, টমেটো সস, ওলকপি আর গাজর। গাজর মনে হল সবচেয়ে দামী। গাজরগুলো গুনে সঙ্গে সঙ্গে সকলকে ভাগ করে দেওয়া হল। সেগুলো কাচাই খাওয়া হবে। ফলের মধ্যে আছে আপেল আর প্রত্যেকের এক বোতল করে অরেঞ্জ জুস। চার বোতল ভদ্‌কা, কফি ২ টিন, পেস্ট চা দু বাক্স, রেডিওর জন্য ব্যাটারী রিচার্জার। বন্দুকের কার্তুজগুলোও সকলে গাজরের মতই ভাগ করে নিল। এক একজন পেল একশটা করে কার্তুজ। সাইবেরিয়ার পশুপালন কেন্দ্রগুলোতে চার দম্পতির জন্য দশদিনের এটা হচ্ছে রসদ বা র‍্যাশন। চার পাঁচ কিলো আটা আর গোটা যবের একটা প্যাকেটও পরে চোখে পড়লো। যবের প্যাকেটটা পাঁচ-ছ কিলোর হবে। সকলে গোল হয়ে বসে মালগুলো মাঝখানে রেখে ভাগাভাগি হল। কাজেই গোপনীয় কিছু নেই। সেদিন রাতে (ঘড়ি অনুযায়ী) আটা ও বাঁধাকপির স্যুপ আর তার সাথে সসিস্‌ দিয়ে মহানন্দে আমাকে ঘিরে আহারপর্ব শেষ করল। তারপর একটা ভদ্‌কার বোতল খুলে আমাকে সবাই স্বাগত জানালো।

পরের দিন ঘুম ভাঙল। শহরে মানুষের বদভ্যাস ঘড়ি দেখা। আমিও সেই রোগের রুগী। ঘড়িতে দেখলাম দুপুর বারোটা। ঘরে কেউ নেই। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। খাঁটি পশমের বিছানা। প্রথমবার গ্রীণল্যাণ্ডে এস্কিমোদের সঙ্গে থাকাকালীন ঘরের যে বিশ্রী চামড়া পচা গন্ধটা ছিল এখানে তা নেই। নীচে হরিণের চামড়ার গদি আর ওপরে নরম শেয়ালের চামড়ার কম্বল। শেয়ালের চামড়া হলেও তাতে রয়েছে নরম পশম। ভেবেছিলাম ঘুমটা এত শীতে হয়তো ভাল হবে না কিন্তু আশ্চর্য হোটেলের থেকে অনেক ভাল ঘুম হয়েছে। আস্তে আস্তে পোষাক পড়ে বাইরে বেরোলাম।

আজ ৫ই নভেম্বর। আমি এখন আছি আর্কটিক সারকেল বা সুমেরু বৃত্তের আরও অনেক উত্তরে বাহাত্তর ডিগ্রী ল্যাটিচুড বা দ্রাঘিমাংশ (72°L) পেড়িয়ে এসেছি। ইউরোপে যারা মধ্যরাত্রির সূর্য দেখতে যান নরওয়ের ট্রমসো (Tromso) শহরে সেটাও ৭০° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে। আলাস্কার সর্বোত্তরের শহর ব্যারো (Barrow) সেটাও ৭০° দ্রাঘিমাংশে। গ্রীণল্যাণ্ডের গথস্হাভ্ (Gothshav) সেটাও ৭০° তে। আর আমি এখন আছি ৭২ ও ৭৩ ডিগ্রীর মাঝামাঝিতে। এত সহজে সুমেরুর এত উত্তরে আসব ভাবতে পারিনি। সাইবেরিয়ার তাইমীর উপদ্বীপ এখান থেকে বেশি দূর নয়। পৃথিবীর এই বরফের মরুভূমিতে মানুষ পাব আশা করিনি।

বাইরের টেম্পারেচার প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আমি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। ঘন মেঘলা আকাশের মত আলো। চারদিক নিঃশব্দ। প্লাস্টিকের হট হাউসগুলো খোলাই ছিল। ভেতরে জনমানবশূন্য। বিরাট হলঘর, মাঝখানে দুই সারি জন্তুদের খাবার জন্য শুকনো ঘাস রাখার মাচান। সব ভর্তি। এদিক ওদিক করে চার সারি জন্তু দাঁড়াতে পারে। জন্তুদের ময়লাগুলো সরাসরি ঢালু জমিতে পড়ছে তাতে জঞ্জাল পরিষ্কার করার সুবিধে। চারটে গুদাম ঘরের মত হট হাউসে কম করেও চার হাজার বল্গা হরিণ রাখার ব্যবস্থা। আলাদা ছোট ঘরে রয়েছে ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম, তাতে দুধ সংগ্রহ করে সরাসরি ছানা তৈরি করার সরঞ্জাম। বিরাট বিরাট গামলাগুলো দেখলেই অনুমান করা যায় দুধ ও ছানার পরিমাণ। তবে সব কিছুই আল্গা, মনে হয়, প্রয়োজনবোধে অল্প সময়েই এই সম্পূর্ণ কারখানাকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। এই বিরাট আয়োজন অথচ নিঃশব্দ। দূরে যতদূর চোখ যায় ধুধু করছে বরফের রাজত্ব।

এখানে পায়খানার ভাল বন্দোবস্ত আছে। একটা আলাদা প্লাস্টিক ঘরে কমোড-এর ব্যবস্থা। তবে জলের কোন ব্যবস্থা নেই অথবা সব ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে। মনে হয় কমোড কেউ ব্যবহার করে না। বাইরে যে কোন জায়গায় বাহ্য-প্রস্রাব করা সম্ভব নয়। লোকজন নেই, লজ্জার ব্যাপারও নয়, নিষেধও নয়। ঠাণ্ডার জন্য এখানে বিনা প্রস্তুতিতে প্যান্ট খুললেই সমস্ত অংশটাই সঙ্গে সঙ্গে ডীপ ফ্রিজে রাখা মাংসের মত জমে যাবে। রান্নাঘরের সংলগ্ন একটা ছোট্ট আলমারির মত জায়গা আছে সেখানেই পায়খানার বন্দোবস্ত। কমোডে অ্যান্টি জেল দেওয়া আছে। রাসায়নিক দ্রব্যগুনে সেটা একটা বিরাট প্যানে পড়ছে। তারপর সপ্তাহের শেষে তা অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। অনেকটা প্লেন বা ক্যাম্পিং-এর মতো ব্যবস্থা। সব ব্যবস্থাই সুন্দর। জন্তুদের খাবার জন্য আলাদা জায়গায় চারকোনাচে বাঁধানো বিচালির স্তুপও রয়েছে।

আমি একা এই বিরাট নিঃশব্দ জগতের একমাত্র সাক্ষী। রান্নাঘর, শোবারঘর, বৈঠকখানাঘর, অফিসঘর, রেডিও স্টেশন সব একই জায়গায়। আমি ঘরে এসে কিছু শুকনো শুকনো ফল চিবোচ্ছি এমন সময় শব্দ পেলাম স্নোস্কুটারের। যে লোকটা আমাকে গতকাল নিয়ে গিয়েছিল সেই এল। ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে হাসিমুখে "কেমন আছো" জানাল। তারপর গ্যাস সিলিণ্ডারের মুখটা স্টোভের দিকে ঘুরিয়ে তাতে আগুন ধরালো। তার ওপর বসানো হল বিরাট ডেক্চি। একটা কুড়ুল নিয়ে

আমরা বাইরে এসে বরফের চাই কাটতে শুরু করলাম। বুঝলাম এর থেকেই গরম জল হবে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অন্যান্য সবাই একে একে এসে হাজির হল। তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা করে বল্‌গা হরিণের শ্লেজ।

আলু, আটা আর হরিণের মাংসের বিরাট স্যুপ হল। সবাই বাটিতে করে নিয়ে হাতার মত চামচে করে অতি সুস্বাদু খাদ্যের মত খেতে লাগলাম। খাওয়ার পর হরিণসমতে শ্লেজগুলোকে হট হাউসে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর আর করার কিছু নেই। ঘরের অল্প আলোতে ডায়েরি লেখা সম্ভব নয়। আর শীত তো আছেই। ঘরের এক কোনায় টেলিভিশন রাখা ছিল। সেটা খেয়াল করিনি। একটা কম্বল দিয়ে ঢাকা ছিল। সবাই যে যার বিছানায় আরাম করে বসার পর টেলিভিশন খুলে দেওয়া হল। এখানে মাত্র একটা চেন—ফিরে এলাম আবার বর্তমান জগতে। আস্তে আস্তে এদের নামের সাথে পরিচিত হ'লাম। অবশ্য নামের কোন প্রয়োজন দেখলাম না। যার যখন যার সাথে কথা বলার ইচ্ছা সে তখন তার দিকে তাকিয়ে কথা বলে। এখানে গোপন করার কিছু নেই। সকলেই সকলের কথা শোনো। টেলিভিশন সুদূর উত্তর মেরুর এস্কিমোদের ঘরেও ঢুকেছে—এস্কিমোদের একঘেয়েমী জীবনের এক সঙ্গী। গ্রীণল্যাণ্ডের সেই বুড়ো দাদুর গল্প আর পেটে খিল ধরা হাসি এখানে উধাও হয়ে গিয়েছে। টেলিভিশন দেখতে দেখতে যার যখন ক্লান্ত লাগে সে তখন ঘুমোতে চলে যায়, শেষের শ্রোতাই সেটাকে অফ করে দেয়। মনে মনে ভাবলাম যে পরের দিন বেশিক্ষণ না ঘুমিয়ে ওদের সাথেই বেড়িয়ে পড়ব।

৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার :

ঘড়ি অনুযায়ী সকাল দশটায় আমরা রওনা দিলাম, বল্‌গা হরিণগুলোকে দেখাশুনা করার জন্য। যে যার শ্লেজ নিল আমি দাদিখের সাথে এলাম স্কুটারে। এই বিরাট প্রাকৃতিক জগতে এই স্কুটারের শব্দটাই যেন বেখাপ্পা তবে শব্দটা খুবই চাপা।

বল্‌গা হরিণের ক্ষেত্রে এসে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এদিক ওদিকে গিয়ে দেখা, যদি কোন হরিণ দলছাড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাকে আবার দলে ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয় কাজ যদি কোন হরিণ বসে থাকে তাহলে দেখতে হবে সে অসুস্থ কিনা। কাছের থেকে দেখতে ভারী মজা লাগে এখানকার এই মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রীতে হরিণগুলোর প্রশ্বাস ফেলার সাথে সাথেই চিবুকের চারপাশে সেটা জমে সাদা তুষারে পরিণত হচ্ছে। আমাদের সকলেরই নাক ঢাকা, প্রশ্বাসে যতটুকু গরম হাওয়া বেরোচ্ছে তাতেই তৈরি হচ্ছে পরবর্তী শ্বাসের বায়ু। সূর্যের অভাবে এই সাদা বরফের চোখ ধাঁধানো আলোটা নেই। আটজন লোক আর একটা স্কুটার বল্‌গা হরিণের এই দলটাকে পরিক্রমা করতে লাগে প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা। সাইবেরিয়ার এই এলাকায় এদের চারণভূমির কোন সীমা নেই। স্কুটারে কিলোমিটারের কাঁটাটা কাজ করছে না। আমার মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ কিলোমিটারের মত জায়গা জুড়ে হরিণগুলো যাতায়াত

করে। অনেক দূর থেকেই দেখা যায়—কাজেই হরিণগুলো দল ছাড়া হয়ে গেলেও তাকে খুঁজতে কোন অসুবিধা হয় না। এই অঞ্চলের আর একটা বিরাট সুবিধা হচ্ছে যে এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি নেই। সেই বনভূমি আরও দক্ষিণে শেষ হয়ে গেছে। তাইগার বনভূমি হরিণ, শেয়াল, বুনো খড়গোশ আর ভোদরের জন্য বিখ্যাত। শেয়াল ও ভোদরের চামড়ায় তৈরি হয় অতি দামী সৌখিন পশমী পোষাক। আমরা বাড়ি ফিরলাম বেলা তিনটের সময়। টেমপারেচার এখন মাইনাস ফিফটি ডিগ্রী।

ঘরে ঢুকেই সবাই যে যার বিছানায় বসে হাফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর কি বিষয়ে যেন পরামর্শ শুরু হল, এবং তারা সিদ্ধান্ত নিল রেডিও টেলিফোন করার। ওয়েভ্ ফিক্স্ করাই ছিল। ভাষাটা রুশকি ঘেঁষা হলেও মনে হল অন্য রকম—আন্দাজ করলাম যে এদের দোলগান ভাষা হতে পারে। কমিউনিকেশন সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল। একে একে তিন চারজন কথা বলল, তারপর আমাকে ডাকল কথা বলতে—"হাউ আর ইউ, ভেরী কোল্ড কামিং, কাম্ ব্যাক।" আমি জবাবে বললাম—"থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ্ ফর ইওর হেল্প, আই অ্যাম ভেরী ওয়েল, ফিউ ডেজ্ মোর, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড মিশাভ্স্কায়।" কার সাথে কথা বললাম জানি না তবে টেলিগ্রাফের মত তার কথায় বুঝলাম, "আরও ঠাণ্ডা পড়বে, ফিরে এস।"

৭ই নভেম্বর শুক্রবার, ১৯৯৭ :

দশটার আগেই সবাই প্রস্তুত হল বেরুবার জন্য। সকালে চা, চকোলেট আর আলুসেদ্ধ দিয়ে প্রাতঃরাশ হল। স্কুটার নিয়ে দু'জন আগেই বেড়িয়ে পড়ল। আমি একজনের সাথে শ্লেজে উঠলাম। বল্গা হরিণের শ্লেজে এই প্রথম। কুকুরের স্লেজের সাথে এই শ্লেজের তফাৎ অনেক। কুকুরের শ্লেজ আরও দ্রুত আর প্রয়োজনবোধে তাড়াতাড়ি মোড় ফেরানো যায়। কুকুর হরিণের থেকে চালাক জন্তু কাজেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনবোধে লীডার কুকুর নিজেই ডিসিশন নেয়। কিন্তু বল্গা হরিণের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। চালক ছাড়া হরিণ কোন দিকেই এগুবে না। এস্কিমোরা হাস্কি কুকুরগুলোকে ভাল ট্রেনিং দিয়ে শিকারের কাজে লাগায়। বল্গা হরিণ অনেকটা বলদের মত শ্লেজ টেনেই তার কর্তব্য শেষ করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, হাস্কি কুকুরগুলো বদ্‌রাগী আর কখনো কখনো মালিককেও কামড়াতে দ্বিধা করে না। বল্গা হরিণের ক্ষেত্রে সে ভয় একদম নেই। শ্লেজে করে এগুনো অনেকটা নৌকোর মত শুধু বরফের ঢেউ-এর ওপর দিয়ে যাওয়া ভারী মজার। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে এই হরিণের পাল একই জায়গায় থাকে না। তারা ঘাসের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে থাকে। নদীর ধার পেলে তো কথাই নেই। নদীর ধারে ছোট ছোট শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ এদের খুব প্রিয় খাদ্য। এখন ছোট বড় সব নদীই বরফে জমে গিয়েছে। কাজেই চারদিকেই অবাধ গতি অর্থাৎ জলের বেড়া নেই। এস্কিমোরা বাড়ি ফেরার আগে একটা বড় নিশান রেখে আসে। হরিণগুলো অন্য জায়গায় গেলেও তারা আগের দিন

কোথায় ছিল তা সহজেই জানা যায়। এক রাত্রিতে তারা দশ কিলোমিটার দূরত্বে চলে যায়, কোন কোন সময় তারও বেশি। আমাদের কাজ শুরু হল। হরিণগুলোকে প্রথমেই চারপাশ থেকে তাড়িয়ে এনে জড়ো করা হল। তারপর সামনে স্কুটারকে লীডার করে পেছন দিক থেকে সাতটা শ্লেজের সারি দিয়ে তাদের তাড়িয়ে এগিয়ে নেওয়া হল। হরিণের দলটা এত বড় যে আমাদের শ্লেজ থেকে হরিণের পালকে মধ্যে রেখে স্কুটারের দূরত্ব কম করেও ছ'কিলোমিটার হবে। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। কো-অপারেটিভের থেকে নির্দেশ এসেছে ঠাণ্ডা পড়ে গেছে বাইরে ঘাসের অভাব তাই তাড়াতাড়ি এদের হট্ হাউসে নিয়ে আসতে হবে। ওদের তাড়াবার জন্য মুখের কোন শব্দই ব্যবহার হচ্ছে না। শ্লেজের কাঠের ওপর আর একটা কাঠ দিয়ে অনবরত ঠক্ ঠক্ শব্দ করা হচ্ছে, তাতেই সেই বিরাট হাজার খানেক বল্‌গা হরিণের দল এগিয়ে চলেছে। শ্লেজ থেকে শূন্যে তাদের শিংগুলো দেখে মনে হচ্ছে হাজার হাজার লোক মাথার ওপর শুকনো গাছের ডাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ঘণ্টাখানেক হরিণগুলোর পেছন পেছন এগিয়ে তারপর শব্দ থামিয়ে তাদের ওভারটেক করে দ্রুত শিবিরের দিকে রওনা হলাম। হরিণের দল এবার আস্তে আস্তে ফিরে আসবে। আমরা ঘরে ফেরার আধ ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ কালো হয়ে উঠল। আমরা ঠিক সময়েই ফিরেছি আর একটু দেরী হলেই রাতে ফিরতে অসুবিধা হত। শ্লেজে হেড লাইট নেই। ঘরে ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর আবার সেই একই প্রোগ্রাম টেলিভিশন।

৮ই নভেম্বর শনিবার, ১৯৯৭ :

বাইরে কাদের সমবেত কথাবর্তায় ও চীৎকারে ঘুম ভাঙল সকাল ৯টায়। সবাই বেড়িয়ে গেছে আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পড়ে দরজা খুলে বাইরে বেড়িয়ে পড়লাম। অবাক, সত্যি অবাক হবার মতই দৃশ্য। এখানকার ল্যান্ডস্কেপ সম্পূর্ণ পালটে গেছে। আমাদের ঘরের চারদিকে বল্‌গা হরিণের এক বিরাট জমায়েত। মনে হল এখানকার জন্তুরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমাদের ঘেরাও করে রেখেছে—"আমাদের দাবী মানতে হবে", হট হাউসের ওপর চারদিকে চারটে হাজার পাওয়ারের স্পট দিয়ে এলাকাকে আলোকিত করা হয়েছে। জন্তুগুলোকে ঠেলেও কোন রকমে মুক্তি পেলাম না। ঘরে ঢুকতে বাধ্য হলাম। কিছুক্ষণ পরই এক মহিলা এসে আমাকে উদ্ধার করলেন। আমাকে ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বললেন—ঘরের পেছন দিক দিয়ে কাঠের রেলিং সরাসরি চলে গিয়েছে হট হাউস পর্যন্ত। হরিণগুলোর শিং উঁচু তাই কাঠের রেলিং-এর নীচু দিয়ে আসতে পারে না। হট হাউসে এসে দেখলাম বিরাট কর্মক্ষেত্র। দরজা দিয়ে এক একটা হরিণ ধরে হলঘরের মাঝখানে কাঠের রেলিং-বারে ঢোকানো হচ্ছে। তাদের মুখের সামনে ঘাস আর নীচে ড্রেনে জল। প্রত্যেকটি হরিণের লিস্ট দেখে সে অনুযায়ী বক্সে ঢোকানো হচ্ছে। এই কাজে তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এখানে একদল কাজ করছে আর একদল কাজ করছে দু নং হাউসে। আমাকে একটা কোমর ঢাকা বুট দিয়ে তাদের দলে ডেকে নিলেন। ভালই হল। আমার কাজ হল বিচালির বাণ্ডিল খুলে লুজ করে

হরিণের মুখের কাছে এগিয়ে দেওয়া। সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এক একটা করে হরিণ ধরে নির্দিষ্ট বাক্সে নিয়ে যাওয়া। মনে হয় হরিণগুলো গাধার মতই একগুঁয়ে। আমি কাজে সাহায্য করতে পেরে খুবই খুশি হলাম। হরিণের আর একটা অসুবিধা হচ্ছে এদের পায়ের চাট। উপযুক্ত বুট না থাকলে আমাকে হাড়ভাঙা অবস্থায় বসে থাকতে হত। সেদিন সারা দিনই লেগে গেল এই কাজে। কাজের ধারা পাল্টে যাওয়ায় আমাদের সময়েরও আর খেয়াল নেই। সারা দিন মাঝে মাঝে ভদ্‌কা ছাড়া আর কিছু খাবার মত সময় নেই।

বাইরের আলো জ্বালানোই রইল। আলো থাকার দরুণ হরিণগুলো অন্যদিকে আর যাচ্ছে না। শুধু তাদের চীৎকারে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। ঘড়ি অনুযায়ী বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করে আমরা সেদিনকার মত থামলাম। রেডিও মারফৎ খবর দেওয়া হল—"কাজ ভালভাবেই এগুচ্ছে।" সেদিন রাতে খাওয়া হল যব ভাঙা সেদ্ধ আর হরিণের চর্বির ঝোল ও মাংস। ঝোলে দেওয়া হল নুন, পাহাড়ি গন্ধ পাতা আর পেঁয়াজ। সেদিন সবাইই ক্লান্ত কাজেই টেলিভিশন খোলা হল না। শোবার আগে ছেলেরা আর মেয়েরা দুভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। ছেলেরা একে একে হরিণগুলো বাছাই করে ধরে আনছে আর মেয়েরা হট হাউসের মধ্যে সারি সারি সাজিয়ে রাখছে। বাইরে ব্যাটারীর আলোতে কাজের সুবিধাই হয়েছে। সেদিন বেশ রাত হয়ে গেল বিছানায় যেতে।

৯ই নভেম্বর, রবিবার :

একই কাজ—সারাদিন ধরে আমি ঘাসের বাণ্ডিল থেকে শুকনো ঘাস দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে রাখছি আর ওরা বাছাই করে হল ভর্তি করে হরিণগুলোকে সাজিয়ে রাখতে লাগল। খাটুনির জন্য আমাদের গা গরম। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে হট হাউস বিনা হিটারেই গরম হয়ে উঠছে। জন্তুদের বিষ্ঠা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের থেকে তাপ সৃষ্টি হয়ে হলের মধ্যেই সেই গরম হাওয়া সারকুলেট করতে থাকল। জন্তুদের গন্ধ নাকে সয়ে গেছে। আমাদের আরও একদিন পুরো লেগে গেল এই কাজে। সব শুদ্ধ তিন দিন লাগল তিন হাজার ছ'শ সত্তরটি বল্‌গা হরিণকে হট হাউসের খাঁচায় সাজাতে। অনেকটা গড়ের মাঠে প্লাস্টিকের ছাউনি দেবার মত দৃশ্য।

১০ই নভেম্বর সোমবার বিকেলবেলা গ্রীণউইচ্ টাইমের ঘড়ি অনুযায়ী আমাদের কাজ শেষ হল। এইবার মনে হল যে এ কাজের জন্য চাই মজবুত শরীরের গঠন, ধৈর্য আর মাইনাস ফিফ্‌টি ডিগ্রীতে কাজ করার অভ্যাস ও ক্ষমতা। প্রথমদিকে জন্তুগুলোর বিষ্ঠা ও গায়ের গন্ধে ভেবেছিলাম অসুস্থ হয়ে পড়ব কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় আমি রক্ষা পেয়েছি। মনের জোর আর উৎসাহে রেহাই পেয়েছি। নতুন দেশ নতুন পরিবেশ আর উৎকণ্ঠা থাকলে মনের সাধারণ রোগগুলোকে অনায়াসে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। কাজের শেষে আর টেলিভিশন খোলা হল না। রেডিওর মারফৎ

অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। সকলেই নোরিল্স্ক্-এর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলল। সকলেই খুশি। আমার সাথেও অল্প কথা হল।

—"কাক ভি স্পসিভাইসে" কেমন আছেন?

—"হো সিন হারাশো স্পসিব" খুব ভাল ধন্যবাদ।

খাওয়া হল আলু সেদ্ধ, শুকনো মাংস আর ভদ্কা। তারপর শুরু হল নাচ। টেবিলকে মাঝখানে রেখে তার চারপাশে ঘুড়তে ঘুড়তে নাচ আর গান। তাদের গানের সাথে আর নাচের সাথে মঙ্গোলিয়ার কিছুটা মিল আছে বলে মনে হল। তাদের দোলগান ভাষা নীচু গলায় থেমে থেমে বলা। এই দারুণ শীতে কথাগুলো যেন শীতে জমে গেছে। আবহাওয়ার সাথে তাল ও হারমনি বজায় রেখে গড়ে উঠেছে কথা বলার ভঙ্গি। সকলেই ক্লান্ত কাজেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সবাই শুয়ে পড়ল। ঘরে সাক্ষী হিসেবে রইল গ্যাসের আলো।

হট হাউসের নামটা ভালই। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম। এখানে পশুদের জল সরবরাহ করার কায়দাটা বড় চমৎকার। বাইরের বরফ কেটে ঘরের মধ্যে একটা চৌবাচ্চায় রাখা হচ্ছে আর ঘরের গরম হাওয়ায় তা গলে যাচ্ছে। তারপর সেটাকে পশুদের সামনে নালা দিয়ে সর্বত্র বিতরণ করা হচ্ছে। জল ফুরিয়ে গেলে আবার রিজার্ভারে বরফের খণ্ড কেটে ভর্তি করা হচ্ছে। এখানকার এস্কিমোরা স্নান করে না, গা ধোয় না। মাসে বা দুমাসে একবার করে সোনা বার্থ নেয়। সোনা (Sauna) বার্থ হচ্ছে একটা আলাদা কাঠের ছোট্ট ঘর, তার ভেতরে চার দেয়াল ঢাকা দেওয়া হয় পাথরে। তারপর ভেতরে কাঠ কয়লার আল্গা উনোনে আগুন নিয়ে এসে ঘরটাকে উত্তপ্ত করা হয়। ঘরের টেম্পারেচার আস্তে আস্তে উঠতে থাকে। সেই গরমে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকলে ঘাম হয়। সমস্ত শরীর গরমে ঘামতে থাকে। সেই অবস্থায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় এক একজন আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। সম্পূর্ণ শরীরের ঘাম ঝরে গিয়ে শরীরকে হালকা করে দেয় এবং শরীরের বিষাক্ত পদার্থ ঘামের মাধ্যমে বেড়িয়ে গিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখে। শেষে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে শরীরকে ধুয়ে মুছে বাইরে আসে। সোনা বার্থে অনেক এস্কিমো এত উত্তপ্ত হয়ে যায় যে তারা সরাসরি বাইরে এসে বরফের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে ঘাম শুকিয়ে নেয়। সোনা বার্থে স্বামী-স্ত্রী বা পরিবারের সকলে একসঙ্গেও গ্রহণ করে। এস্কিমোদের এখানে দেখলেও এই ধরনের উত্তপ্ত স্নান এই প্রথম দেখা নয়। তুরস্কের এই ধরনের স্নানের সাথে যুক্ত হয়েছে মাসাজ্ ও সাবান যাকে বলে টার্কিশ বার্থ (Turkish Birth), রোমান বার্থ এরই রাজসিক রূপ। আজকাল ইউরোপ, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও নিউজিল্যাণ্ডেও দেখেছি। মনে হয় ভারতেও আছে তবে আমার জানা নেই।

মঙ্গলবার, ১১ই নভেম্বর :

পশুগুলোকে ঘরে ঢোকানোর পর কাজ কমে গেল। এখন শুধু ওদের তত্ত্বাবধান

করা। প্রধান কাজ বিচুলি দেওয়া আর বিষ্ঠা পরিষ্কার করা। আমি বিষ্ঠাই লিখলাম কারণ হরিণের বিষ্ঠাকে গোবর লেখা কি ঠিক হবে?

আমরা দু'জনে স্কুটার নিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ বেরোলাম। আমাদের সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের বালতিতে ছোট ছোট করে কাটা মাংস। একটা বড় লাঠি তাতে শক্ত সুতো ও তারের ছোট্ট বরশি। মন হল ছেলেমানুষি মাছ ধরার খেলা খেলতে যাচ্ছি। হাতে শাবল। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর আমরা একটা নদী পেলাম। এবার নদীর মাঝখান দিয়ে আমাদের স্কুটার এগিয়ে চলল। এখানে নদীর জল জমে গিয়েছে। একটা জায়গা বেছে নিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। তারপর ভেরিল্কু (লোকটার নাম) শাবল দিয়ে গর্ত করতে লাগল। শক্ত পাথরের মত বরফ ক্রিষ্টালের মত ভেঙে ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রায় এক হাত খোঁড়ার পর জলের স্তর পাওয়া গেল। এবার তার পাশে চামড়া পেতে হাঁটু গেড়ে বসে বরশির মুখে মাংস দিয়ে শুরু হল আমাদের মাছ ধরা। প্রথম পনেরো মিনিট কিছুই পেলাম না। মাছগুলো মাংস খেয়ে খেয়ে পালাচ্ছে। তারপর ভেরিল্কু কৌশল করে মাংসের পরিমাণ কম করে দিয়ে ঠিক কায়দামত টোপ ফেলতে লাগল। যাদুবিদ্যার মত, সেই শক্ত পাথুরে বরফের গর্ত থেকে বেরিয়ে এল বোয়াল মাছের মত একটা বিরাট মাছ। আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। শুরু হল আমাদের মাছ ধরা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ছটি মাছ ধরলাম। এক একটা মাছের ওজন দু-আড়াই কিলোর মত হবে। মাছ ধরার কৌশলটা বুঝলাম। প্রথম প্রথম বড় বড় মাংসখণ্ড দিয়ে মাছগুলোকে আকর্ষণ করা হল। তারপর টোপ পরিবর্তন করে তাদের ধরা হল। নদীর উপরিভাগের জল জমে যখন বরফে পরিণত হয় তখন মাছগুলো নদীর নীচের শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে আর ওপরে গর্ত দেখলে আলোর আকর্ষণে সেইদিকে আসে। গ্রীণল্যাণ্ডে দেখেছি যে সীল ও ভোদর জাতীয় জলজ প্রাণীগুলো এই ধরনের গর্ত দেখলে হাওয়া খাবার জন্য উঠে আসে তখন হারপুন বা বর্শা দিয়ে তাদের মারতে সুবিধা হয়।

আমি এখানে এসেছি প্রায় সাত দিন হয়ে গেল। সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। ভেবেছিলাম এখানে এস্কিমোদের ইগলু পাব তাদের শ্লেজে করে ঘুড়ে বেড়াবো অথবা শিকারে বেরুবো কিন্তু অদৃষ্টে আছে অন্য অভিজ্ঞতা। আফশোস করার কোন কারণই নেই। বরঞ্চ ভালই হল। আমাদের বর্তমান সমাজে নামের খুব প্রয়োজন। নামের দ্বারা একজন আর একজনের কাছে আসছি। আলাপ-আলোচনা করছি, বন্ধুত্ব হচ্ছে পর হচ্ছে আপন। নামটাই আসল। নামের মাধ্যমেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে আইডেন্টিফাই করছি। এখানে দেখলাম নামের কোন ব্যবহার নেই। আমি নিজের নাম বার বার বলেও ওদের কাছ থেকে সাড়া পাইনি অর্থাৎ কেউ আমাকে নাম ধরে ডাকে না আর ওদের নামও বলে না। মেনে নিলাম এটাই এস্কিমোদের রীতি অর্থাৎ নামের প্রয়োজন কি? এখানেই শিখলাম অহংকার বা নাম না নিয়েও বাঁচা যায় তবে তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ, আবহাওয়া ও সমাজব্যবস্থা।

এখানকার নদীগুলো মাছে ভর্তি, শুধু ধরার লোকের অভাব। নদীতে এত মাছ থাকতেও এরা খাচ্ছে মাংস। তার কারণ, অভ্যাস অথবা সহজে পাওয়া যায় বলে। বুঝলাম এরা মাছ ধরে তাদের মেনু পালটাবার জন্য। আমরা আরও একরকম মাছ পেলাম সেটা হচ্ছে বিরাট সরপুঁটির মত। এক একটার ওজন এক কিলোর কাছাকাছি অনেকটা ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের লেকের পের্সের মত (Perche)। ছ'টা বোয়াল মাছের মত মাছ আর চারটে পের্স ধরে আমরা ফিরলাম। একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হল। বাড়ীতে আসতেই সবাই উৎসুক হয়ে ঝুকে পড়ল। রান্নার জন্য মাছগুলোকে মেয়েরাই হাতে তুলে নিল। সবাই খুশি। ছুরি দিয়ে পের্সের আঁশ ছাড়ানো হল আর বোয়াল মাছের মত মাছগুলোর আঁশ নেই। পের্স গ্যাসের আগুনে ঝলসানো হল আর অন্য মাছগুলোকে সেদ্ধ করা হল। সেদ্ধ মাছটা খেতে অনেকটা সালমনের মত আর পের্স অনেকটা কাত্‌লা মাছের মত স্বাদ।

১২ই নভেম্বর, ১৯৯৭ বুধবার

পুরোপুরি ডায়েরি লিখতে পারছি না। এখানে আঙ্গুলের আরষ্টতা লেগেই আছে। ডায়েরি কেন নিজের নাম লেখাও অসম্ভব। শীতে জয়েন্টগুলো জমে আছে কাজেই শুধু পয়েন্টগুলো টুকে রাখছি তাও বড় বড় অক্ষরে। এই শীতে শুধু হাতে লেখা কেন টাইপও অসম্ভব। ঘরে গ্যাসের হিটার রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও টেম্পারেচার মাইনাসই থেকে যাচ্ছে। বাইরে কথা বলতে গেলে মুখে সঙ্গে সঙ্গে সাদা তুষার জমে যায়। বাইরে কেউ কাউকে চেনে না কারণ একই পোষাক, চেহারাও একই। শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্‌টোবরে বরফ পড়ে সেই বরফ জমে যায়। তুষারপাত হয় কিন্তু তা গলবার মত টেম্পারেচার নেই কাজেই বছরের পর বছর বরফের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এটা চিরতুষারের দেশ, সুমেরুর এটাই বৈশিষ্ট্য।

দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় তায়গা অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি। সেখানে গরমের সময় বরফ গলে যায়। সবুজ সুন্দর বনভূমি দেখা যায়। গরমের সময় বা শীতের প্রাক্কালে তারা শিকারে বেরোয়। পশমী ছোট ছোট জীবজন্তু শিকার করে বনবিভাগের শিকারী সম্প্রদায় জীবনযাপন করে। পশমী চামড়ার প্রচুর চাহিদা। তাদের ভালই রোজগার হয়। কিন্তু এই অঞ্চলে সে সুযোগ নেই। আর্কটিকের এই কো-অপারেটিভের লোকেদের বন্দুক আছে আত্মরক্ষার জন্য। কোন কোন সময় আর্কটিকের সাদা ভাল্লুক হরিণের দল আক্রমণ করে। আর তা ছাড়াও আছে হরিণের চিরশত্রু বাঘ। তুন্দ্রার শেয়ালেরও খুব বদনাম।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৯৭ বৃহস্পতিবার :

সকাল বেলা খবর এসেছে হেলিকপ্টার আসবে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছোট ছোট গ্যাসের সিলিণ্ডার রয়েছে হেলিগ্রাউণ্ডকে আলোকিত করার জন্য, সেগুলো জ্বালানো হল। হেলিকপ্টার এল। অবাক হবার পালা। আমি যে হেলিকপ্টারে এসেছিলাম সেটা নয়, এটা বিরাটাকার। একটা বিরাট বাড়ী এসে উপস্থিত হল

সামনের গ্রাউণ্ডে। হেলিকপ্টারের হাওয়ায় শুরু হল তুষার ঝড়। কিছুক্ষণ পর পাখা বন্ধ হওয়ার পর দেখলাম দু'জন পাইলট, তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল

—"তুমি এখানে কি করছ" (রাশিয়ান ভাষায়)

—"আমি টুরিস্ট"।

—"মাথা খারাপ, পাগল"।

ভদ্রলোক মোটেই খুশি নন মনে হল। সবাইকে আমার জন্য বকাবকি শুরু করেছেন। তারপর আস্তে আস্তে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়াতে তিনি চুপ করলেন। কিন্তু কিছুতেই হাতে হাত মেলালেন না। মনে হয় কো-অপারেটিভের ব্যবস্থার কথা শুনে তার মেজাজ শান্ত হল।

হেলিকপ্টারের পাখা বন্ধ হবার সাথে সাথে গ্যাসের মশালগুলো নিভিয়ে দেওয়া হল। বিরাট হেলিকপ্টারটার পেছনের দরজা খুলতেই দেখলাম ভেতরকার দৃশ্য। পশুকেন্দ্রের জন্য ঘাস নিয়ে এসেছে। ক্রেনে করে সব মাল নামিয়ে পাইলট দু'জন দু'কাপ কফি খেয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই আবার আকাশে উঠল। কম করেও দশটা ট্রাকের সমান ঘাস দিয়ে গেল। বুঝলাম এ অঞ্চলে হয়তো ভাল ঘাস হয় না। কেন্দ্রের ঘাস ফুড়িয়ে গেলে ওরা সাপ্লাই দেয়। এরা মনে হয় নোরিল্‌স্‌কের লোক নয়। সম্পূর্ণ অন্য কোম্পানী।

১৪ই নভেম্বর সুখবর এল, নোরিল্‌স্‌কের লোক আসছে। হেলিকপ্টার এল বেলা বারোটার সময়। হেলিগ্রাউণ্ডে গেলাম সবাইকে আপ্যায়ন করার জন্য। হেলিকপ্টাররের পাখা বন্ধ হতেই এগিয়ে গেলাম। আগেরই টীম, সর্বশেষের ভদ্রলোকটিকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম—"মিশাভ্‌স্‌কায়"

ইনস্‌পেকসন টীম তাদের কাজে লেগে গেল। সব পশুগুলোর ঠিকমত সংস্থান হয়েছে কি না—সংখ্যায় কত—কত পুংলিঙ্গ কত স্ত্রীলিঙ্গ—রসদ সামগ্রী ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মিশাভ্‌সকা ও আমি দ'জনে বসে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলাম। আমরা বিভিন্ন হট্‌ হাউজে ঢুকে দেখতে লাগলাম সুন্দর বল্‌গা হরিণের শিংগুলোর নড়ন-চরনের বাহার। দেখলাম মিশাভস্‌কায়কে, এস্কিমোদের ভাষা সম্পর্কে লেখালেখি করার জন্য সকলেই চেনে এবং সম্মান করে।

আমার হয়ে তিনিই সকলকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আমি সুদূর ভারত থেকে আসছি সে কথাও জানালেন। তারা বুঝল কি না বোঝা গেল না। এবার বিদায়ের পালা। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম বিশেষ করে ভেরিল্‌কুকে। হেলিকপ্টার ছাড়ল। জানলা দিয়ে শেষবাবের মত দেখলাম এস্কিমোদের কাঠের ঘরগুলো। হট্‌ হাউজের দিকে তাকিয়ে বিদায় জানালাম সাইবেরিয়ার বল্‌গা হরিণগুলোকে। হেলিকপ্টার যে পথে গিয়েছিল সে পথেই ফিরল। সময় লাগল পুরো

একঘণ্টা। কোঅপারেটিভ্ আমার থেকে একটা পয়সাও নিল না। বিনা খরচায় জীবনের আর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল। মিশাভ্সকায়কে অনুরোধ যে তিনি যেন সামনের সপ্তাহের ট্যুরে ওখানকার দুষ্প্রাপ্য ফল, যেমন কমলালেবু, আঙ্গুর ও আপেল, আর চকোলেট আমার হয়ে আমার এস্কিমো বন্ধুদের কিনে পাঠান। এর জন্য তার হাতে কুড়ি ডলার দিলাম। মিশাভস্কায় কুড়ি ডলার দেখে বললেন—"এ অনেক যাই হোক ওরা খুশি হবে। তবে আমি ডলার দেব না আমি নিজেই সে পরিমাণ রুব্‌ল্ দেব—সামনের বছর আমার ছেলে যখন প্যারিস যাবে তখন দরকার হবে।

আবার নোরিল্‌স্ক। সেই একই হোটেল। হোটেলের মালিককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম তার ভারী ও উপযুক্ত পশমের কোটের জন্য। পরের দিন ভিক্টর এল হোটেলে। ওর বাবার কাছ থেকে আমার বিষয়ে শুনেছে। হঠাৎ যেন ওকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। মনে হল ওর সব রকম জড়তা দূর হয়ে গেছে। নোরিল্‌স্কে চায়ের দোকানের অভাব নেই। আমরা একটা সম্ভ্রান্ত চায়ের দোকানে ঢুকলাম। ভারী কাঠের পিলার দিয়ে ডেকরেশন করা। জানলার ধারে একটি সুন্দরী যুবতী আমাদের দেখেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। ভিক্টর পরিচয় করিয়ে দিল আমার বান্ধবী ওল্‌গা, আমরা একই ক্লাশে পড়ি। ওল্‌গা এই প্রথম একজন ভারতীয় দেখছে—ভারতের গান্ধীজী, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের কথা বইয়ে পড়েছে কাজেই আমাদের আলাপ সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল। আমরা তিনজনেই কফির অর্ডার দিলাম। ফরাসীতেই শুরু হল আলাপ। এখন বিকেল তিনটে। হাতে প্রচুর সময়। বাইরে আজ সকালে ছিল -৫২° এখন মনে হয় -৫৫° সে.। কাজেই বাইরে পায়চারী করার কোন প্রশ্নই আসে না। ওল্‌গার (Olga) বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওকে সন্তুষ্ট করে তারপর শুর করলাম আমার প্রশ্ন। ভিক্‌টর দোলগান এস্কিমো সম্প্রদায়ের আর ওল্‌গা উরাল অঞ্চলের। ওল্‌গা ভিক্টরকে ডাকে আন্দ্রেয়ি বলে। কারণ ক্লাসে তিনজন ভিক্টর। ভিক্টর আন্দ্রেয়ি মিশাভস্কায়। ওর মধ্য নামটাই বন্ধুবান্ধব ব্যবহার করে।

—"ঠাকুর্দ্দার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের—সাইবেরিয়ার যাযাবর অর্থাৎ সাইবেরিয়ান নোম্যাড্। ঠাকুর্দ্দার আমল থেকেই তারা শহরবাসী হয়েছে। রাশিয়ানরা এস্কিমো কথাটা একদম ব্যবহার করে না। ভিক্টরের মতে সাইবেরিয়ার যাযাবরদের জীবন বড় কঠিন এবং অনিশ্চয়তায় ভরা। গরমকালে যখন ছ'মাস দিন থাকে তখন অ্যাডভেঞ্চারে সময় কেটে যায়। কিন্তু ছ'মাস যখন রাত্রি তখন প্রকৃতি হয়ে ওঠে ভয়ংকর। সাইবেরিয়ায় যখন বাতাস বয় তখন সাত-আট-দশ-দিনের আগে তা বন্ধ হয় না। সে সময় ঘরের বাইরে যাওয়া মুশকিল। ঠাণ্ডার মাত্রা প্রায়ই মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-60^{0}C)। কাঠের অভাবে ঘরে আগুন জ্বালানো সম্ভব নয় শুধু রান্নার জন্য আগুন জ্বালা। মাটির ওপর বরফের স্তর পুরু হয়ে ওঠে কাজেই সহজে নদীতে গর্ত করে মাছ ধরা সম্ভব নয়। শীতের সময় উত্তর সাইবেরিয়ার অধিবাসীরা তাদের জীবজন্তু নিয়ে দক্ষিণে বাইকাল হ্রদের দিকে চলে আসে। সেখানে অন্ততঃ খুব কষ্ট হলেও বনে বুনো জন্তু পাওয়া যায় আর বিক্রি করা জন্য বিভিন্ন শহরে যাওয়া যায়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, সেখানেও সাইবেরিয়ার শীত। উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব বা পশ্চিমে সবজায়গাতেই সাংঘাতিক।

সাইবেরিয়ার যাযাবরদের মধ্যে অনেক ভাষাগত এবং জীবিকাগত পার্থক্য আছে। বাইকাল হ্রদের দক্ষিণাংশে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত যারা আছে তারা সাধারণতঃ শিকার করে বনের পশু খাবার জন্য এবং পশম বিক্রির জন্য। আর্কটিক সারকেলের কাছাকাছি যারা আছে তাদের প্রধান জীবিকা বল্‌গা হরিণ চারণ। এই হরিণগুলো তুন্দ্রা অঞ্চলের ঘাস শ্যাওলা খেয়েই বাঁচতে পারে। অনেকটা মরুভূমির উটের মত যখন কোথাও কিছু নেই তখনও মাটি খুঁড়ে ঠিক খাবার সংগ্রহ করে নেয়। অধিবাসীরা বল্‌গা হরিণের পাল নিয়ে সারা বছরই ঘুড়ে বেড়ায় সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। বল্‌গা হরিণের শিং-চামড়া-মাংস-দুধ সবই কাজে লাগে আর মালপত্রের জন্য ওরাই টানে শ্লেজ।

আজকাল বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়েছে। আগে ছিল সরকারী এখন প্রাইভেট ওনার। শীতের সময় তাদের আর হাজার হাজার পশু নিয়ে দক্ষিণে নামতে হয় না। এক হাজার পশুর জন্য ধরা আছে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্কোয়ার ল্যাণ্ড। জমির অভাব পঞ্চাশ কিলোমিটারের জায়গায় তারা যদি ষাট বা সত্তর স্কোয়ার কিলোমিটার (60/70 km^2) জায়গায় ঘুড়ে বেড়ায় তার জন্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কোন ঝামেলাই নেই। সাইবেরিয়ার সর্ব্বোত্তরের অধিবাসীরা জলজন্তু ও মাছের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। তারা কায়াক নিয়ে শিকার করে। দক্ষ, হুঁশিয়ার আর দারুন পরিশ্রমী। এমন কি ভীষণ শীতেও তারা আর্কটিক সারকেল ছাড়ে না। তারাই ইগ্‌লু তৈরি করে থাকে। শুনেছি তাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় কুকুর পোষে শ্লেজ টানার জন্য ও শিকারের জন্য। তবে আমি দেখিনি। আমাদের এই অঞ্চলে শ্লেজ টানে বল্‌গা হরিণ।"

—"আমি যে অঞ্চলে এস্কিমোদের সাথে কাটিয়ে এলাম ওদের সম্পর্কে কিছু বল।"

—ওরা, আমার মনে হয় দোলগান।

—কি করে বুঝলে।

—বাবা বলেছেন ওদের ভাষা আলাদা ভাষা। মানে ডায়লেক্ট, ওদের লিখিত ভাষা নেই।

—আমি যাদের দেখলাম তাদের মধ্যে কোন বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখলাম না, কারণটা কি?

—"ওদের ছেলেমেয়েরা এখানে আছে। ওদের বাবা মা বা ফ্যামিলির কেউ এখানে ছেলেমেয়েদের রেখে পড়াশুনার দায়িত্ব নেয়। আর বাবা-মা কাজ করে অনেক দূরে। কো-অপারেটিভের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমাজসেবীরা সেই সব শিশুদের ওপর নজর রাখে। মাঠে যারা কাজ করছে তারা হয় বেতনভোগী অথবা সরাসরি শেয়ার হোল্ডার। ডিসেম্বর-জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী এই তিনমাস আট বছরের কম শিশুরা ইচ্ছা

করলে পশুপালনক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সাথে থাকতে পারে। তখন খাটনি কম কিন্তু একঘেয়েমী জীবন, তাই শিশুরা থাকলে ভাল হয়।

—সাইবেরিয়ার যারা বল্‌গা হরিণ পালক তারা সবাই কি এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি সিস্টেমের সাথে জড়িত?

—না সবাই না। যাদের (৫০০) পাঁচশ'র বেশি পশু আছে তারা সবাইই কো-অপারেটিভ শেয়ার হোল্ডার। তাতে বিক্রি, পশু-চিকিৎসা আর শীতের ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

—সাইবেরিয়ায় আজকাল কত শিকারী বা যাযাবর ধরনের লোক আছে যারা এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আছে।

—অন্ততঃ ৫০/৬০ হাজার তো বটেই। আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন উনি ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি আপনাকে সঠিক উত্তর দিতে পারবেন।

শেষ প্রশ্ন : তোমাদের কি মনে হয় সাইবেরিয়ার যাযাবরেরা এই কো-অপারেটিভ সিস্টেমে সুখী। তারা কি স্বাধীনতা হারায়নি?

—নিশ্চয়ই না! তারা আজও স্বাধীন। তারা পশু নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারে। আমাদের দেখেই তো বুঝতে পারছেন যে আমরা সুখী।

আসলে কি জানেন—সাইবেরিয়া একটা বিরাট অঞ্চল। প্রায় গোটা চীনের মত। প্রকৃতির এক ভয়ানক সৃষ্টি। মানুষের পদে পদে বিপদ। জীবনের ঝুঁকি। মানুষ চায় সিকিউরিটি আর কমফোর্ট। সেটা পেলেই মনে হয় সুখ ও আনন্দে পারিবারিক জীবনে আসে পরিপূর্ণতা।

—সত্যি তোমার সাথে আমি একমত। তোমরা কি শুনেছ যে আজকাল কানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড ও আলাস্কার এস্কিমোরা একতাবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। তারা অনেকদূর এগিয়েছে। তাদের ইচ্ছা আর্কটিক সার্কেলের অধিবাসীদের একতাবদ্ধ করে একদিন "আর্কটিক ইনডিপেণ্ডেন্ট কান্ট্রি" হিসেবে ঘোষণা করা। তোমার কি মত?

—অসম্ভব। কে ছাড়বে তাদের ভৌগোলিক সীমানা? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা কোনদিনই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড বা আলাস্কাকে ছাড়বে না। আমরা শুনেছি ওই মুভমেন্টের কথা কিন্তু শুধু থিওরি দিয়ে কি কাজ হবে?

আস্তে আস্তে ঘড়ি অনুযায়ী অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি হঠাৎ তাদের প্রস্তাব দিলাম—এখন পাঁচটা। আমাদের আলাপ যখন জমে উঠেছে তখন আর না উঠে এখানেই রাতের খাবার খাওয়া যাক। ওল্‌গা ও ভিক্টরের আপত্তি নেই। কাজেই আমি সরাসরি টেলিফোন করলাম মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস্ মিশাভস্‌কায়কে। তারা যদি আমাদের সাথে যোগ দেন তাহলে খুবই ভাল হয়। তারা সবাই আমার নিমন্ত্রিত। আমাকে জোর করতে হল না। মিশাভস্‌কায় দম্পতি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। তারাই রেস্ট্রোরেন্টে আসার পথে ওল্‌গার বাবা-মাকে বলে দেবেন।

পরেরদিন—

আমাকে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মেম্বাররা আমন্ত্রণ করল। আমিতো অবাক। কি বলবো—কেন ডাক পড়ল কিছুই বুঝলাম না। কলেজের হলঘরে ব্যবস্থা হয়েছে যাতে সবাই আসতে পারে তার জন্যই।

বিকেল তিনটের সময় হলঘর ভরে উঠল। আমার পরিচয় সহ ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন মিঃ মিশাভস্কায়। আমি ভারতীয় পর্যটক, সাইবেরিয়ায় শিকার ও বাসিন্দা সম্পর্কে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসেছি। কলেজের ডাইরেক্টর প্রফেসর লেওনিড্ কোরোচ্কিন (Prof Leonid Korochkin) আমাকে স্বাগত জানিয়ে সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন—"ভারত পৃথিবীর এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দেশ। ভারতবাসীরা ত্যাগ ও অহিংসার এক উজ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতের ঋষিরা হিমালয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধ্যান করেন। আমরা গ্লোব ট্রটারের মুখ থেকে সে বিষয়ে কিছু শুনতে চাই আর তার গ্রীণল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতার কিছুটা শোনালে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা খুশি হবে।"

আমি মিঃ কোরোচকিনের কথানুয়ায়ী চারদিকে শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে শুরু করলাম আমার আলোচনা। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই কো-অপারেটিভের কর্মচারী, কলেজের টীচার, স্টাফ, কিছু কৌতুহলী অভিভাবক শ্রোতা আর ত্রিশজন ছাত্র-ছাত্রী, সব মিলিয়ে দু'শ জনের মত। প্রথমে শুরু করলাম গ্রীণল্যাণ্ডে আমার প্রথম ইগলুতে থাকার গল্প, ভাষার অভাবে কিভাবে তাদের সাথে কাটালাম ইত্যাদি। তারপর এলাম হিমালয়ের সাধু প্রসঙ্গে এবং শেষ করলাম ভারতের স্বাধীনতা অর্জন দিয়ে। কারণ এবছর আমরা চারদিকে ধুমধাম করে ভারতের স্বাধীনতার ৫০তম পূর্ত্তি উৎসব পালন করলাম। ভাষণ শেষে প্রশ্ন-উত্তর এর মাধ্যমে শ্রোতাদের আরও কাছে পেলাম। প্রায় দু'ঘণ্টার অধিবেশনে সকলেই দেখলাম খুশি। বুঝলাম আমি ভাষণ দিয়ে কাউকে জ্বালাতন করিনি। ছাত্র-ছাত্রীরা অটোগ্রাফ নিল এবং অনেকে দিল তাদের অটোগ্রাফ দেওয়া ছবি।

সভা শেষে আমরা ৬ জনের ছোট্ট একটি দল নিয়ে ঢুকলাম আমাদের হোটেলের পাশের একটি কফি হাউসে। আমিই তাদের কফি ও ভদ্কার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। আমাদের সাথে প্রফেসর কোরোচ্কিনও এসেছেন। কথায় কথায় প্রফেসর কোরোচ্কিন আমাকে বারবার বলতে লাগলেন নোভোসিবিরিস্ক্ (Novossibirsk)-এ যেতে। তার মতে নোভোসিবিরিস্ক্ সাইবেরিয়ার রাজধানী। সেখানে না গেলে আমার সাইবেরিয়া সফর অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার মানে সাইবেরিয়ার দক্ষিণে আমাকে আবার ফিরে যেতে বলছেন। দক্ষিণ সাইবেরিয়া থেকে অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ার (Mongolia) উত্তরে আলতাই পাহাড়ি এলাকা থেকে সাইবেরিয়ার বিখ্যাত অব্ নদী (Ob) ও ইয়েনিসেয়ি (Yenisseyi) নদীর উৎস। আর বাইকাল হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়েছে লেনা (Lena)। এই তিনটে নদী সম্পূর্ণ সাইবেরিয়া অতিক্রম করে উত্তরে

আর্কটিক সাগরে গিয়ে মিশেছে। শীতকালে অর্থাৎ এখন সাইবেরিয়ার এই তিনটে নদী বরফে পরিণত হয়ে শ্লেজ ও গাড়ীর রাস্তায় পরিণত হয়েছে। ব্রাট্‌স্‌ক (Bratsk) হয়ে নোরিল্‌স্‌ক না এসে ইরকুট্‌সকে থেকে সরাসরি ট্রেনে বা বাসে নোভোসিবিরিস্‌ক্ গেলে সময়, অর্থ দুটোই বাঁচত। ট্রেনে ইরকুট্‌স্‌ক্ ও নোভোসিবিরিস্‌ক্ মাত্র দেড় দিনের পথ। যা হবার হয়ে গেছে। তবে আমার আফশোষ নেই কারণ নোরিল্‌স্‌ক না এলে আমার সাইবেরিয়ার বল্‌গা হরিণ ক্ষেত্রগুলো দেখা হত না এটা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা।

কফি খেয়ে সবাই একে একে বিদায় নিলেন। আমার মনে বাসা বাঁধল নোভোসিবিরিস্‌ক্ (Novossibirsk)। রাশিয়ান নামগুলো সাথে যদি ঠিকমত এ্যাকসেন্ট না দেওয়া যায় তাহলে উচ্চারণ করা কঠিন।

১৬ই নভেম্বর। আজ রবিবার ঠাণ্ডার মাত্রা আজ আরও অসহ্য। বাইরে বেরোলেই মনে হয় মাথার ঘিলু জমে যাবে। নাক কান পুরো মাফলারে না ঢাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শক্ত হয়ে জমে যাবে। তুষারের কামড় থেকে বাঁচবার জন্য সবাই ভারী কম্বলের মত ওভারকোট, টুপী, দস্তানা আর পশমী জুতোয় শরীরকে সন্তপর্ণে ঢেকে চলাফেলা করছে। চোখে চশমা না থাকলে চোখের মনি পাথরে পরিণত হবে। -৬০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বাড়ির চারপাশে বরফের ভারী আচ্ছাদন। বাড়ির চিমনী থেকে ধোঁয়া বেড়িয়ে দূরে যেতে পারছে না। ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বরফে পরিণত হচ্ছে। রাস্তায় কোন গাড়ী নেই। গাড়িগুলো থেকে ব্যাটারী খুলে ঘরে তোলা হয়েছে। হেভি ভেহিক্‌ল্‌গুলো তাদের দৈত্যাকৃতি চাকায় রাস্তার বরফ ফাটাতে ফাটাতে চলাফেরা করছে। বাইরে লোকজন একদম নেই। ছুটির দিন সবাই বাড়িতে বসে টেলিভিশন দেখছে। মস্কো থেকে স্যাটেলাইটে প্রোগ্রাম ছাড়া হয়। সময় কাটাবার অতি আধুনিক যন্ত্র। অনেকগুলো কফির দোকান বন্ধ। ডবল্ সেট্ কাচের জানলা বার বার কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হচ্ছে। বাইরের অত্যধিক ঠাণ্ডা আর ভেতরকার গরমের সংঘাতে কাচের ওপর জল জমে যাচ্ছে। ঘরগুলো গরম তেলের হিটারে তাপ নিয়ন্ত্রিত। তা সত্ত্বেও যেন শরীরটা সম্পূর্ণ গরম হচ্ছে না।

কতুই নদীর ধারে হরিণক্ষেত্রে (Deer field) যে কদিন ছিলাম সেখানে ডায়েরী লেখা হয়নি। সেখানকার শীতে আঙ্গুলগুলোর জয়েন্ট জমে গিয়েছিল। নোরিল্‌স্‌কে আসার পর হোটেলের ঘরে সে দুরবস্থা নেই। তবে এই দারুণ শীতে সমস্ত শরীরটা এখনও যেন কুঁকড়ে আছে। আজ বেরোবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ঘরে বসে হিটারে হাত গরম করে করে ডায়েরী লিখতে শুরু করলাম। হোটেলের কফি হাউসে তাস ও দাবার আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। বারবার উত্তেজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। তারই সাথে খাপ খাইয়ে আমার ডায়েরীর পাতা ভরতে লাগলাম।

১৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার। সকালবেলা দশটায় হাজির হলাম অ্যারোফ্লোটের অফিসে। আমার কথা শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন

—"নোভোসিবিরিস্‌ক্ যাবেন। সপ্তাহে চারটে ফ্লাইট। আজকে যদি যেতে চান

অসুবিধে নেই। দুটোর সময় ডিপারচার। প্রায় আড়াইশ ডলার পড়বে। ফার্স্টক্লাশ অফ সীজন রেট। চারটের সময় পৌঁছে যাবেন। ওখানে ইন্টুরিস্টের বিরাট হোটেল কোনো অসুবিধা হবে না।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বুক করে ফেললাম।

হোটেলের হিসাবপত্র মিটিয়ে মিশাভস্‌কায় পরিবারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি স্নোজীপ্ ট্যাক্‌সি নিয়ে চলে এলাম এয়ারপোর্টে। ফরমালিটি একদম নেই কারণ এটা ইন্টারনাল ফ্লাইট। প্লেন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জেট্ প্লেন ইয়াক্ ৪০ মডেল (Jet liner Yak-40)। অন্ততঃ তিরিশ বছরের পুরোনো মডেল। ভারতের Air India এবং Indian Airlines-এর প্লেনগুলো এ তুলনায় অতি আধুনিক। প্লেনের লেজে লেখা এখনও CCCP লেখাটা বদল হয়নি, পুরোনো কম্যুনিস্ট যুগের চিহ্ন বহন করে আছে। ১৯৯৬ সালে তাসখন্দে এই মডেল দেখেছিলাম। প্লেনের মডেল যত পুরোনোই হোক না কেন এয়ার হোস্টেসরা কিন্তু সদ্য কলেজ ফেরতা।

নোভোসিবিরিস্‌ক্

১৯শে নভেম্বর, বুধবার। নোভোসিবিরিস্‌ক্ একই কথা কিন্তু উচ্চারণ করা হয় টেনে দুভাগে। এয়ারপোর্ট দেখেই মনে হল বিরাট শহর। এ্যারোফ্লোটের বাসে করে এসে পৌছলাম শহরে। ইন্‌ট্যুরিস্ট হোটেল পঁচিশতলা বিল্ডিং। আমি তিনতলায় একটা ঘর পেলাম। ঘরে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠাণ্ডাটা আয়ত্তের মধ্যেই। শরীরে জয়েন্টগুলোর বরফ গলতে শুরু করেছে। রিসেপশনের পাশেই বিরাট করে লেখা Guide Service নজরে পড়েছে। তাই আবার নীচে নেমে এলাম। আজ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই কাল সকাল নটার আগে আর কাজ হবে না। রিসেপশনে দু'জন ভদ্রমহিলা হাসিখুশি, ইংরেজী ও ফরাসী বলেন। কোন অসুবিধাই নেই। হোটেলে বেড্ অ্যাণ্ড ব্রেকফার্স্ট। ২৪ ঘন্টায় বারো ডলার (US $)। সন্ধ্যে হয়ে গেছে কাজেই আজ আর না বেড়িয়ে ঘরেই থেকে গেলাম। ইউরোপীয়ান স্টাইল। তিনতলার ব্যাল্‌কনি থেকে সামনেই দেখলাম অব্ নদীর এক সুন্দর দৃশ্য। চারদিকে বরফে ঢাকা কিন্তু শহরের চাঞ্চল্য ও আলোকসজ্জা শহরটিকে জাগিয়ে রেখেছে।

২০শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

সাড়ে নটার সময় গাইড পেলাম একটি সুন্দরী হাসিখুশি চট্‌পটে মেয়ে ওলগা মিনায়েভ্ (Olga Minayev)। বয়স ২৮ বছর। এ যাত্রায় ওল্‌গা নামটা এই দ্বিতীয় বার পেলাম। দিনে ৭ ডলার। ওল্‌গাকে খুলে বললাম আমার উদ্দেশ্য। সে সব শুনে বললে—"আপনার উচিৎ ছিল আরও উত্তরে যাওয়া। কারণ এখানে যাযাবর শিকারী বা এস্কিমো বলতে কিছু নেই। এখানে সবাই ব্যবসায়ী, কর্মী, চাকুরীজীবি—তার মানেই সবাই স্থায়ী।"

—আমি সপ্তাহখানেক নোরিলস্‌ক্ থেকে এলাম। সেখানে ডিয়ার ফার্মিং দেখে এলাম। সবাই বলল নোভোসিবিরিস্‌ক্ না ঘুরলে আমার সাইবেরিয়া ঘোরা স্বার্থক হবে না। তাই এসেছি। কাজেই সে দিক ভেবেই তুমি প্রোগ্রাম তৈরি কর। আমি চার-পাঁচ দিন থাকতে পারি।

—দা-দা, মানে আচ্ছা আচ্ছা। তারপর নাকের ডগাটা একটু ডান হাত দিয়ে ঘসে বলল—

—ঠিক আছে চলুন, আগে শহরটা দেখুন। তারপর বসে প্রোগ্রাম করা যাবে। শহরের চারদিকে বাস-ট্যাকসির অভাব নেই। বরফে সাদা হলেও চলাচলে অসুবিধা নেই।

নোভোসিবিরিস্‌ক্ সাইবেরিয়ার সবচেয়ে ধনী ও বড় শহর। লোকে বলে

সাইবেরিয়ার রাজধানী কিন্তু সরকার সে কথা মানে না। আর সাইবেরিয়ান ক্যাপিটাল বলে টুরিস্ট অফিসে কোন কাগজ-পত্র নেই। বিদেশী টুরিস্টরা বলে সাইবেরিয়ার চিকাগো। আমি সাইবেরিয়ায় এত বড় শহর পাবো আশা করিনি। অব্ নদী এখানকার প্রাণ। রাশিয়নরা অব্ নদীকে বলে বাবুশকা (Babuska) অর্থাৎ ঠাকুমা। অব্ নদীর উৎস এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে আলতাই পাহাড়ে (Altay Mountain)। যেখানে চীন ও মঙ্গোলিয়ার বর্ডার। আলতাই পাহাড় থেকে দুটো নদী বেড়িয়েছে। একটার নাম বিয়া (Biya), আর একটার নাম কাতুন (Katun)। এই দুই নদী বিইস্‌ক্ (Biysk) নামক শহরে এসে মিশেছে। তারপর সেখান থেকেই তার নতুন মিলিত নাম হয়েছে অব্ (Ob)। রাশিয়ান ভাষায় অব্ মানে উভয় বা সঙ্গম। বিইস্‌ক্ এখান থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার দক্ষিণে। এই নদী পথেই পাহাড়ের গাছ কেটে ভাসিয়ে আনা হয় বিভিন্ন কারখানার জন্য।

এখানকার নদীর ধারে বিরাট বিরাট বাড়ি, দোকান-পসার, ব্যবসা কেন্দ্র, স্কুল, কলেজ, অফিস বিল্ডিং। সব কিছুই বিরাট ব্যাপার। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে এই শহরকে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের শহরগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছে। এখানকার বিরাট স্টেশনটাকে দিল্লী স্টেশনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। এই শহরের লোকসংখ্যা প্রায় দুই মিলিয়ন। ইউনিভার্সিটি, মিলিটারী অ্যাকাডেমী, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার, লোহা ও ইস্পাত কারখানার হেড্ কোয়ার্টার, পেট্রল ও গ্যাসের পাইপ লাইন, কন্ট্রোল সেন্টার, নেভিগেশন সেন্টার আর পশুজাত দ্রব্যের এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসাকেন্দ্র। একটা দেশের রাজধানীতে যা যা থাকার দরকার তা সবই এখানে আছে। হোটেলের দুই ব্লক পরেই একটা রাস্তার ধারে মহিলারা বসেছে তাদের হাতে বোনা বিভিন্ন ধরনের পোষাক বিক্রি করতে, বিশেষ করে সোয়েটার, টুপী, মোজা ও দস্তানার বিরাট বাজার। এখানকার একটা বাজার ঘুরলাম। এই শীতে আকাশ দেখা খোলা বাজার কল্পনা করা যায় না, সবই ঢাকা। দুটো সুপার মার্কেট ঘুরলাম কিন্তু ইউরোপিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডে খুবই গরীব।

দুপুরবেলা আমরা একটা রেস্ট্রোরেন্টে বসে প্রোগাম তৈরি করতে লাগলাম। খাবার জন্য অর্ডার দিলাম। অব্ নদীর সুস্বাদু উখা (Ukha) মাছ ভাজা আর গাজর ও বাঁধাকপির স্যুপ।

আমি অনেক শহর দেখেছি ও দেখছি। এক নজরে নোভোসিবির্ক্‌স্ দেখলাম তাতেই যথেষ্ট। আমার লক্ষ্য সাইবেরিয়ার এস্কিমোদের সম্পর্কে আরও জানা। ওল্‌গা আমার সাথে একমত হয়ে পরামর্শ দিল যে, তার প্রফেসরকে টেলিফোন করে এ বিষয়ে খোঁজ নেবে। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ইনটুরিস্ট হোটেলে ফিরে এলাম। কম্যুনিস্ট আমলে রাশিয়ায় একটাই ট্রাভেল এজেন্সি ছিল। ইনটুরিস্ট ছাড়া আমাদের মত টুরিস্টদের কোন উপায় ছিল না। তারাই হোটেল, গাইড, ইন্টারপ্রিটার, সিকিউরিটি ও ইনফরমেশন সেন্টারের কাজ করত। আজকাল পেরেস্ট্রয়কার পর আরও ট্রাভেল এজেন্সি হয়েছে। ওল্‌গার প্রফেসর আমাদের টেলিফোনে পরামর্শ

দিলেন ফিশিং অ্যাণ্ড হান্টিং সেন্টারে খোঁজ নিতে। ফিশিং অ্যাণ্ড হান্টিং সেন্টারে খোঁজ নিতে তারা পরামর্শ দিল সাইবেরিয়ান পিপ্‌ল রিসার্চ সেন্টারে খোঁজ নিতে। সেখানেই সব খবর পাওয়া যাবে। সেন্টারটা এখান থেকে বাসে ঘণ্টা খানেকের পথ। যেতে হবে অ্যাকাডেমী সিটিতে। ভালই হল। দৈনিক কনডাক্‌টেড ট্যুরে বাস যায়, খুব সস্তা।

অ্যাকাডেমী সিটি বা অ্যাকাডেমী টাউন নোভোসিবিরিস্‌ক্‌-এর পরের শহর। আসল নাম আকাডেমগোরোডক (Academgorodok)। নোভোসিবিরিস্‌ক্‌-এর সাথে খাপ খাইয়ে তৈরি হয়েছে এই শহর। এখানে রাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের রিসার্চ ও স্টাডি সেন্টার। মস্কো ও লেনিনগ্রাডের কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে অনেক অনেক দূরে তাদের দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এখানে তারা সব রকম ইজ্‌ম্‌ (ism) এর বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণা করতে পারেন। আকাডেমগোরোডোক কম্যুনিস্ট সরকারের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা। সরকার তার দেশের গবেষকদের সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। এখানে গবেষকরা তাদের পরিবার নিয়েই থাকেন। সরকার পরির্তন হয়েছে কিন্তু রাশিয়ান ফেডারেশন এই আকাডেমী টাউনকে আগের মতই রেখেছে।

আমরা অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক টেলিফোন করে শেষে একজন রিটায়ার্ড বৈজ্ঞানিককে পাওয়া গেল। তিনি অ্যানথ্রপলিজিস্ট এবং এস্কিমোদের সম্বন্ধে ভাল তথ্য দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। তিনি ভারতদরদী এবং আমার সাথে পরিচিত হলে খুশি হবেন। ওল্‌গাকে ধন্যবাদ দিলাম।

নির্লিপ্তভাবে ওল্‌গা জানালো—"এটা আমার পেশা"।

—ঠিক হল পরের দিন সকালে কনডাক্‌টেড ট্যুরের বাস ধরে অ্যাকাডেমী টাউনে যাওয়া যাবে।

আকাডেমগোরোডোক (Akademgorodok)

২১শে নভেম্বর, শুক্রবার

সকাল সাড়ে আটটায় বাস ছাড়ল। বাসের গাইড ওল্‌গাকে চেনে, ঠিক হল বাসের গাইড রাশিয়ান ভাষায় বলবে, ওল্‌গা আমাকে ইংরেজীতে তর্জমা করে দেবে। বাসের অন্যান্য সবাইই রাশিয়ান, মস্কো ও সেন্টপিটারস্‌বুর্গ থেকে এসেছে। ওল্‌গাকে আমি অনুরোধ করলাম যে আমাকে গাইডের কথাগুলো তর্জমা করে দিতে হবে না আমি নিজেই প্রশ্ন করব। মিউজিয়াম, সরকারী বিল্ডিং, থিয়েটার হল, ব্যালে সেন্টার এসব শুনে কি হবে।

বাস অব্ নদীর ধারে ধারে কিছুদূর এগিয়ে তারপর ভেতরের আর একটা রাস্তা ধরল। তারপর আবার এসে পড়ল অব্ নদীর ধারে। অব্ নদী এখানে বিরাটাকার ধারণ করেছে। এপাড় ওপাড় দেখা যায় না। প্রায় দশটার সময় নদীর ধারে একটা বাঁধের ওপর এসে বাস দাঁড়াল। সবাই নামল—ওল্‌গার কাছ থেকে শুনলাম অব্ নদী নয় এটাকে বলে অব্ সী। অব্ নদীকে এখানে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে। এই বাঁধের ফলে তৈরি হচ্ছে হাইড্রলিক পাওয়ার। সমস্ত নোভোসিবিরিস্‌ক্, আকাডেমগোরোডক ও শহরতলীর অন্যান্য জায়গা আলোকিত হচ্ছে আর বিভিন্ন ইস্পাত কারখানা চলছে এই বিদ্যুৎশক্তিতে।

পাশের রেস্ট্রোরেন্টে চা-কফি খেয়ে আবার রওনা হলাম। দুপুরবেলা আকাডেমগোরোডেকে একটা ক্যান্টিনে আমরা থামলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়ার পর একজন বৈজ্ঞানিক পর্যটকদের আপ্যায়ন জানাবেন ও পরিদর্শন করাবেন। আমরা খাওয়া দাওয়ার পর বেড়িয়ে পড়লাম আমাদের উদ্দেশ্যে।

আমরা এদিক ওদিক জিজ্ঞাসা করে জানলাম একটা চারতলা বাড়ির দু'তলায় থাকেন প্রফেসর অ্যাকাডোমিসিয়ান আলেক্‌সেই পাভ্‌লোভিচ্ ওক্‌লাড্‌নিকভ্ (Prof. Academician Aleksey Pavlovitch Okladnikov), সংক্ষেপে মিঃ পাভ্‌লোভিচ্।

মিঃ পাভ্‌লোভিচ্ আমাদের আন্তরিকভাবে তার ঘরে বসালেন। সামান্য আলাপের পর সরাসরি এলাম আমার প্রশ্নে।

—সাইবেরিয়ায় আজকাল কত এস্কিমো আছে বলতে পারেন?

তিনি একটু হেসে বললেন—

—আমি এস্কিমো বিশেষজ্ঞ নই তবে অ্যান্থ্রপলজি স্টাডি করার জন্য সব রকমের

খবরই রাখতে হয়। দক্ষিণ ও মধ্য সাইবেরিয়ায় এস্কিমো নেই কারণ তারা সবাই সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন কলকারখানা ও খনিতে কাজ পেয়ে গেছে। তাদের জীবন ছিল কঠিন, আজকাল তারা জীবনটাকে উপভোগ করতে পারছে।

—সাইবেরিয়ান এস্কিমো পেতে হলে কোন্ এলাকায় যেতে হবে? সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

—এসব খবর আপনাকে জিওলজিস্ট বা সার্ভের লোকেরা ঠিকমত বলতে পারবে। রাশিয়ায় আমরা এস্কিমো বলি না। রাশিয়ান ভাষায় তর্জমা করলে তাদের বলা হবে বরফের যাযাবর। আর্কটিক সারকেলের উত্তরে এখনও যাযাবরদের পাবেন। তারা সাধারণতঃ মাছ, সীল, সিন্ধুঘোটক শিকার করে জীবন যাপন করে। আর সেন্ট্রালে এবং এই অঞ্চলের যাযাবরেরা হরিণের পাল নিয়ে তুন্দ্রা অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে। তাইগা এবং আলতাই অঞ্চলে এখনও অনেক শিকারী যাযাবর বনশেয়াল, খরগোশ, ভোদর, ভালুক ও অন্যান্য পশমী জীবজন্তু শিকার করে জীবনধারণ করে। এই সব বনপশুর চামড়া চড়া দরে বিক্রি হয়। আজকাল নোভোসিবিরিস্ক্-এও অনেক জাপানী ব্যবসায়ীরা আসছে রেয়ার বনপশুর চামড়া কিনতে। জাপানীরা ভীষণ ধূর্ত। ওরা ২০/২৫ গুণ দাম বেশি দিয়ে চামড়া কেনে। আজকাল শিকার চামড়া বাজার থেকে প্রায় উধাও হয়ে গেছে।

—নোভোসিবিরিস্ক্-এর আশেপাশে কোন বরফের যাযাবর থাকে কি?

—তা জানি না, তবে হ্যাঁ আপনি যদি সময় পান তাহলে উত্তরে চলে যান খান্তি মান্সিয়িস্ক্ (Khanti Mansiysk) এলাকায়। সেখানকার অধিবাসীরা সবাইই আপনাদের ভাষায় বলা হবে এস্কিমো। তারা সবাইই হরিণের ফার্ম করেছে অথবা পশমের জন্য শেয়ালের ফার্মিং করেছে। বিরাট এলাকা নিয়ে তাদের এই কারবার। আগে যারা ছিল যাযাবর এখন তারা ধনী ব্যবসায়ী।

—তারা সংখ্যায় কত?

—ঠিক করে বলতে পারব না, তবে মনে হয় কম করেও চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার।

—আমি নোরিল্স্কে এই ধরনের একটা ফার্মে কয়েকদিন ছিলাম।

—তাহলে তো সবই জানেন। নোরিল্স্ক্ ইয়েনিসেয়ি নদীর ধারে আর খান্তি মান্সিয়িস্ক্ এই অব্ নদীর ধারে। অব আর ইরতিশ (Irtysh) নদীর সঙ্গমেই পাবেন হাজার হাজার হরিণ ও শেয়ালের ফার্ম।

মিঃ পাভ্লোভিচের বয়স সত্তরের কোঠায়। কথায় কথায় তিনি জানালেন যে আমাদের ভাগ্য ভাল যে গ্লাসনস্ট এবং পেরেস্ট্রকায়র পর আমাদের এই সাক্ষাৎকার হল। ১৯৮৭ সালের আগে এই ধরনের স্বাধীন আলোচনা চক্রের কথা ভাবাও যেত না।

—"চিন্তা করতে পারেন আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য ১৯৭৫ সালে দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিককে মস্কো থেকে পারমিশন আনতে হয়েছিল। শুধু তাইই নয় আমাদের সময় ও বিষয় ছিল খুবই সীমিত।"

—"যাই হোক, আমি শুধু আমার প্রশ্ন নিয়েই আপনাকে বিরক্ত করলাম। আসুন না আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করা যাবে। ওল্‌গা আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমি উঠেছি ইন্‌টুরিস্ট হোটেলে। টেলিফোন করে চলে আসুন। আমি আপনার উপস্থিতিতে সম্মানিত হ'ব। তখন ভারত পর্যায়ে আলোচনা করা যাবে।"

তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে কথা দিলেন আসবেন। আমরা উঠলাম কারণ কনডাক্‌টেড ট্যুরের ওই বাসই ধরতে হবে। আমাদের হোটেলে আসতে রাত সাতটা হয়ে গেল। নোরিল্‌স্‌কে রাত সাতটায় কেউ বাইরে বেরোয় না কারণ অত্যধিক শীত। শক্ত বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব। নোভোসিবিরিস্‌ক্‌ এসে যেন বেঁচেছি। এখানে শীত আছে কিন্তু তা আয়ত্বের মধ্যে। এখানকার শীত ইউরোপীয়ান শীতের মতই। দ্রাঘিমাংশ মাত্র ৫৩°। উত্তর মেরুর ছ'মাস রাত্রি উত্তরে ফেলে এসেছি। তবে ভুললে চলবেনা যে আমি দক্ষিণে হলেও সাইবেরিয়াতেই আছি। নোভেসিবিরিস্‌ক্‌ সুন্দর সাজানো শহর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাইবেরিয়ার সবচেয়ে বড় শহর। লোকে বলে রাজধানী। প্রত্যেকটি রাস্তায় রাস্তায় বাস ট্যাক্‌সির অভাব নেই। প্রাইভেট কারও প্রচুর। নোভোসিবিরিস্‌ক্‌-এর শহরতলীতে দেখেছি কয়েকটি সরকারী কোয়ার্টার বেশ সাজানো গোছানো। আমার অ্যাকাডেমিগোরোডোক ভ্রমণ সার্থক হয়েছে। পাইন গাছ ও অব্‌ নদীর চারপাশে সাজানো বাগান তৈরি হয়েছে। মনেই হয় না যে এটা একটা সাইন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার। শুধু ইন্‌স্টিট্যুট নয়, বৈজ্ঞানিক ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বাজার, দোকান সবই রয়েছে. আর সবচেয়ে বেশি করে নজরে পড়ে নদীর ধারে পার্ক করা সাজানো বোট সার্ফ আর বাইচের বিরাট এলাকা।

২২শে নভেম্বর, শনিবার

সকাল ১০টায় ওল্‌গা এল। ব্লু-প্যান্ট, মুনবুট আর চমৎকার ব্রাউন কালারের পশমী কোট। আমরা হোটেলের কফি হাউসে বসে ওর পশমী কোটটার প্রশংসা করতেই ও বলল :

—এটা কিন্তু শেয়ালের চামড়া নয়। এটা সেব্‌ল্‌স (Sables)। ফরাসীভাষায় এই জন্তুগুলোকে বলে জীবেলিন (Zibeline)। এই জন্তুগুলোকে দেখতে অনেকটা বেজির মত। সাইবেরিয়ার জীবেলিন পৃথিবীবিখ্যাত, বিশেষ করে তাইগা (Taiga) ও এই অঞ্চলের জীবেলিন ইউরোপের সব সম্ভ্রান্ত দোকাগুলোতে পাওয়া যাবে। খুব নরম, হালকা আর দামীতো বটেই। সাধারণতঃ মহিলাদের ওভারকোটের কলার জীবেলিনের পশমে তৈরি, শেয়ালের চামড়া এর থেকে ভারী। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সাইবেরিয়ায় জীবেলিনের ব্যবসা প্রচলিত। আজকাল জাপানী ব্যবসায়ীরা আসছে, তারা প্রচুর দাম দিয়ে পাইকারী হিসেবে সব কিনে নেয় কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য।

তাইগার বনবিভাগ জীবেলিন ও শেয়ালের জন্য বিখ্যাত। শিকারীরা সাইবেরিয়ার অধিবাসী হলেও তাদের এস্কিমোর পর্যায়ে ফেলা যাবে না। কারণ এস্কিমোদের চেহারাই আলাদা। আমি ওল্‌গার কথায় সায় দিয়ে বললাম, "তোমার কথাটা ঠিকই।

আমি ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড ও আলাস্কার এস্কিমোদের দেখেছি। তাদের ভাষা আলাদা হলেও চেহারায় অনেক মিল. আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে সুদূর নর্থপোলের এস্কিমোদের সাথে আমাদের দেশের ভূটান, সিকিম, নেপাল, আসাম এবং দক্ষিণ আমেরিকার ওয়াতেমালা, কলম্বিয়া, পেরু ও বলিভিয়ার অধিবাসীদের চেহারায় অনেক মিল। কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক আমেরিণ্ডিয়ান এস্কিমোদের মতই দেখতে।"

আমরা চা খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম শহরে। প্রথমে এলাম মেইন স্টেশনে। ঠিক হাওড়া স্টেশনের মতই বিরাট তবে চেহারা ও বেশভূষায় তফাৎ। এখানে ঠেস দেওয়া বেঞ্চের অভাব নেই, যাত্রীদের মাটিতে শুতে হয় না। তবে প্রচুর গরীব যাত্রীদের কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

এখান থেকেই আমরা নিলাম মেট্রো। আবার আশ্চর্য হবার পালা। এখানে মেট্রো আছে জানতামই না। প্রচণ্ড শীতে যখন তুষারপাতে ওপরের রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে তখন ভূ-গর্ভের এই মেট্রো শহরকে জীবিত রাখে। হরিণের শ্লেজের প্রাচুর্য দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায়। মেট্রো স্টেশনটা বিরাট। সাইবেরিয়ার প্রথম মেট্রো সার্ভিস। দুটো লাইন জমজমাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে ওল্গার মূল বিষয় ছিল ইতিহাস। তবে ঐ লাইনে ভাল পয়সা নেই। তাই সে ছ'মাসের গাইড ট্রেনিং নিয়ে এখন এখানকার একজন সিনিয়র গাইডের ব্যাজ পেয়েছে। কাজেই চলতে চলতে যখনই সুবিধা পায় তখনই বলতে থাকে সাইবেরিয়ার ইতিহাস। আমি প্রথম প্রথম ওকে টেনে ধরেছিলাম শুধু এস্কিমোদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু যখন দেখলাম যে সাইবেরিয়ার এস্কিমোদের পেতে হলে আসতে হবে যখন গরম থাকে। এখন যাতায়াতের অসুবিধা তবে একথা স্বীকার করেতই হবে যে নোভোসিবিরিস্ক্ না এলে সাইবেরিয়া সফর পূর্ণ হত না।

নোভোসিবিরিস্ক্-এর প্রায় দুই মিলিয়ন অধিবাসী। মিউনিসিপ্যাল কমিটি এর পরিচালনা করে। এখানকার অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং মূল অধিবেশন কক্ষ। মডার্ন বিল্ডিং কিন্তু রোমান থাম। তার পাশেই বিরাট সাইবেরিয়ান গ্যাস কোম্পানীর অতি আধুনিক বিল্ডিং। বিল্ডিং-এর নীচের তলায় ভাল রেস্ট্রোরেন্ট। সেখানেই আমরা খেলাম অব্ নদীর টাটকা মাছের স্যুপ ও রোস্টেট ফিশ্। তারপর ফেরার পথে আমরা ধরলাম বাস। ওলগার সাথে তিনদিনের কন্ট্রাক্ট হয়েছে। ডলার আগেই দিয়েছি। মেয়েটি ভাল, ভদ্র, সুন্দরী, হাসিখুশি আর গাইড হিসেবে তার দক্ষমতার পরিচয় তো পাচ্ছিই। কাজেই এড়াবার কোন প্রশ্নই আসে না। কাজেই সুযোগ যখন পেয়েছি তখন এই নোভোসিবিরিস্ক্-এর কথা না শুনে সরাসরি ওর কাছ থেকে জানতে লাগলাম সাইবেরিয়ার কথা। ওল্গা নোভোসিবিরিস্ক্-এর মেয়ে। সাইবেরিয়ার ইতিহাস ওর মুখস্ত। এখানকার University থেকেই গ্রাজুয়েট হয়েছে। নোভোসিবিরিস্ক্-এর আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো সেটা হচ্ছে এখানকার লোকজন। এদের মধ্যে রাশিয়ান আছে অর্থাৎ ইউরোপিয়ানদের মত, মোঙ্গলিয়ান, আর এস্কিমো টাইপের একটা বিরাট সংমিশ্রণ।

সাইবেরিয়ার কথা

সাইবেরিয়া—আমার মত একজন সাধারণ পর্যটক সাইবেরিয়া সম্পর্কে বিশেষ কোন খবর রাখে না। চলার পথে আমরা যতটুকু জেনেছি তা হচ্ছে—"ভীষণ শীতের দেশ, জনমানবহীন নিঃশব্দ বরফের দেশ, উত্তর সাইবেরিয়ার যেখানে বছরে মাত্র চার মাস সূর্য্যের দেখা পাওয়া যায়, সেখানে এখনও এস্কিমোরা স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। রাশিয়ার রাজনৈতিক বা সাধারণ বন্দীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাইবেরিয়ায়। সেখানে খনি বা কারখানায় জোর করে খাটানোর জন্য অথবা ব্রেন ওয়াশের জন্য। রাশিয়ান গভর্নমেন্ট সাইবেরিয়াকে নিজের বলে ধরে রেখেছে কারণ ওই ভূমিতে রয়েছে ডায়মণ্ড ও সোনার খনি। আর রয়েছে অফুরন্ত জ্বালানি গ্যাস, কয়লা, লোহা, তামার ভাণ্ডার। রয়েছে পেট্রল বর্তমান সভ্যতার এক নম্বর চাহিদা।"

সাইবেরিয়ায় এসে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখলাম তার আসল রূপ। সাইবেরিয়া বর্তমান রাশিয়ার প্রগতির মূল কেন্দ্র। তিনটি জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্রের মূল ঘাঁটি। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অফ্ সায়েন্স, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অফ মেডিকেল সায়েন্স আর ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অফ্ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স।

ইতিহাসের একটা অন্ধকার যুগ খুঁজে পাওয়া গেল, অবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম যে চেঙ্গিস খানের (১১৫৫-১২২৭ খৃঃ) সেই অমানুষিক ও নৃশংস অত্যাচার থেকে এরাও নিষ্কৃতি পায়নি। বর্বর তার্ত্তার মোঙ্গলদের সেই নৃশংস অত্যাচারের কথা এরা কোনদিনই ভুলবে না। চেঙ্গিস খানের লোকেরা তাইগা বনভূমির এলাকা অর্থাৎ বাইকাল হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম এলাকার অধিবাসীদের কচুকাটা করেছে। সাইবেরিয়ানদের মধ্যে যাদের উচ্চতা ঘোড়ার গাড়ির চাকার উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে তাদের মাথা কেটে দেওয়া হত। এই নারকীয় যজ্ঞ থেকে এস্কিমোরা নিষ্কৃতি পেয়েছিল কারণ তাদের উচ্চতা ছিল কম। সাইবেরিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম তাইগা ও তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীরা ভয়ে চলে যায় উত্তরের দিকে। চেঙ্গিস খানের সৈন্যরাই সাইবেরিয়ার আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের উদ্বাস্তু করে পাঠিয়ে দিয়েছে উত্তরে। তারপর থেকে মোঙ্গল কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থাই সাইবেরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে সাইবেরিয়ার দক্ষিণে মঙ্গোলিয়া। ভারতে যেমন মোগলরা গিয়ে সেখানেই নিজেদের দেশ বলে থেকে গেছে। সাইবেরিয়াতেও তাই মোগল বংশধর খান ইয়েডিগের (Khan Yediger) সাইবেরিয়ার সম্রাট বলে নিজেকে ঘোষণা করেছিল।

ভারতে মোগলরা এসেছিল রাজ্যবিস্তার, সোনা, দামী পাথর আর সুন্দরী ভারতীয়দের লোভে। ভারতবর্ষে এসে তারা আর ফিরে যায়নি। ভারতের আপনকরা

আবহাওয়া আর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাযাবর নৃশংস মোঙ্গল জাতি পরিণত হয়েছিল ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির অনুরাগী। ভারতীয়দের সান্নিধ্যে একটি অমানুষিক জাতি পরিণত হয়েছিল মানুষে। কাজেই তারা আর ফিরে যায়নি। বিশ্বকবির ভাষায় যাদের বলা হয়েছে "পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন"।

রাশিয়ানরা কিন্তু মোঙ্গলদের অতবছর বসবাস করতে দেয়নি। ১৫৮১ সালে রাশিয়ার বিখ্যাত কোসাক্ নেতা আতামান্ ইয়েমাক্ তিমোফেইয়েভিচ্ (Cossack Ataman Yemak Timofeyevich), উরাল পাহাড় ডিঙিয়ে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য অভিযান চালান সাইবেরিয়ার দিকে। মাত্র দুর্দ্ধর্ষ ৫০০ সৈন্য নিয়ে সে অনায়াসে দখল করে নিল মোগল অধিকৃত সম্পূর্ণ সাইবেরিয়া। মোগল বংশধর আতামান্ শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারল না। সপরিবারে তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে পালিয়ে গেল উত্তরে। সে সময় থেকেই সাইবেরিয়া রাশিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হল। বলা বাহুল্য যে, রাশিয়া ইউরোপে আর সাইবেরিয়া এশিয়ায়।

নোভোসিবিরিস্ক্-এ অনেক এস্কিমো রয়েছে কিন্তু তারা তাদের জীবনধারা ও জীবনযাত্রা পাল্টিয়ে রাশিয়ান সভ্য সমাজে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এখানে উত্তর মেরুর এস্কিমোদের দেখা যায় না। তবে এস্কিমো স্টাডি গ্রুপ ভাষা ও তাদের ট্রাডিশন বজায় রাখার অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এস্কিমোদের নাচ, গান আর গল্প ও কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই গ্রুপগুলো বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। আমার দুর্ভাগ্য কারণ সেই সব জাতীয় ও দলগত অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয় গ্রীষ্মকালে। তখন দর্শক পাওয়া যায়, এখন শীতকাল তাই সব বন্ধ।

ওল্গা গাইড এবং ইন্টারপ্রিটার। করিৎকর্মা মেয়ে। বিকেল বেলা খুব উত্তেজিত হয়ে এসে আমাকে খবর দিল

—"তোমার জন্য একটা ভাল খবর এনেছি।

—বল

—"তুমি যদি মঙ্গলবার পর্যন্ত থাকতে পার তাহলে অ্যাকাডেমিসিয়ান ওক্লাদ্নিকভ্ (Academician Okladnikov)-এর সাথে স্বনামধন্য আকাডেমিসিয়ান ভেনিয়ামিন আলেক্সেইয়েভ্ (Veniamin Alekseyev) আসবেন।"

ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের ডক্টর বা প্রফেসর বলে সম্মানীত করা হয় আর এখানে বলা হয় অ্যাকাডেমিসিয়ান। অ্যাকাডেমিসিয়ান আলেক্সেইয়েভ্ আসলে ঐতিহাসিক। তিনি সাইবেরিয়ার বাসিন্দা, জন্ম ১৯৩৪ সালে। ইরকুট্স্ক স্টেট ইউনিভার্সিটিতে প্রথমে পড়াশুনা করেছেন, তারপর নোভোসিবিরিস্ক্ স্টেট ইউনিভার্সিটিতে প্রায় পঁচিশ বছর পড়িয়েছেন। সাইবেরিয়ার একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অফ্ সাইন্সের ডাইরেক্টর। তার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইনস্টিট্যুট অফ্ হিস্ট্রি, ফিললজি, এবং ফিলসফি (Institute of history, philology and Philosophy)। ওল্গা বেশ জোর দিয়েই বলল যে ওনার মত এত বড় পণ্ডিত সমগ্র রাশিয়ায় আর কেউ নেই।

আমার কাছে এটা বিরাট সংবাদ। সৌভাগ্য তো বলতেই হবে। ওল্‌গাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। ওল্‌গাকে বললাম—"ঠিক আছে আমি রাজি। মঙ্গলবার ২৫শে নভেম্বর দু'জনকেই আমার হয়ে আমন্ত্রণ জানাও আমরা হোটেলে একসঙ্গে খাবো অবশ্য তারা যদি রাজি থাকেন।"

২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭ : নোভোসিবিরিস্‌ক্, ইনটুরিস্ট হোটেল। দুপুর সাড়ে এগারোটায় আমরা ডাইনিং হলে পরস্পর পরস্পরকে স্বাগত জানালাম।

আমার পরিচয় ভারতীয় পর্যটক। অ্যাকাডেমিসিয়ান পাভ্‌লোভিচ্ ওক্‌লাদ্‌নিকভ্, আর বিশেষ ব্যক্তি অ্যাকাডেমিসিয়ান ভেনিয়ামিন্ আলেক্‌সেইয়েভ্, ওল্‌গা আমাদের পাবলিক রিলেশন ও গাইড। আলেক্‌সেইয়েভ এর মত একজন বিরাট ব্যক্তির সাথে পরিচয় হওয়া সত্যি ভাগ্যের বিষয়। আমাদের আলাপ শুরু হল বিয়ার পটকে কেন্দ্র করে। রাশিয়ায় বিয়ার খুব প্রচলন। এখানকার কফি অনেকটা তুরস্ক বা গ্রীক কফির মত, ছোট কাপ আর চিনি ও কফির সমান পরিমাণ। এখানকার চা ঠিক আমাদের দেশের মত নয়। এখানকার চা আসে চীন ও জাপান থেকে সবুজ চা। খুবই দাম আর ডাস্ট চায়ের থান খুবই সস্তা। বিভিন্ন রকম শুকনো ফলের চাও এখানকার চা স্টল ও রেস্ট্রোরেন্টের প্রচলিত।

আলেক্‌সেইয়েভ্ হাসিখুশি লোক। নিজের মুখেই বললেন যে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরেছেন। ইজিপ্ট ও গ্রীসে দুবার গেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি ভারতে যাননি। একবার নিউদিল্লীতে একটা কনফারেন্সে যাবার কথা হয়েছিল কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি যেতে পারেননি। ভারতের ইতিহাস খুবই আকর্ষণীয়। ভারতের মানুষ, সমাজ আর ঐতিহ্য ঐতিহাসিকদের এক অমূল্য সম্পদ। ভারতের দর্শন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শন সে কথা তিনি বারবার উল্লেখ করলেন। পৃথিবীখ্যাত এই রাশিয়ান গুণীব্যক্তির মুখে ভারতের গুনগান শুনে আমি নিজেকে আরও ধন্য মনে করলাম। আমিও কথা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানব ধর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মে আকর্ষণ ও তার যত মত তত পথের ব্যাখ্যা আর শেষে বললাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দান। আমার কথা শেষে অ্যাকাডেমিসিয়ান ওক্‌লাদ্‌নিকভ্ বললেন—

—"আপনি গান্ধীজীর কথা তো বললেন না। আমরা শুনেছি ভারতের স্বাধীনতার মূলেই রয়েছে গান্ধী।"

—গান্ধীজী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকাবাহী। তিনি ছিলেন প্রশেশনের সামনে তাই সবার চোখে তিনিই প্রথম, কিন্তু এই সংগ্রাম তো তাকে দিয়ে শুরু হয়নি। যে কোন রেভোলুশনের পেছনে থাকে একটা বিরাট প্রস্তুতি। বহুদিনের প্রস্তুতি, স্বাধীনচেতা মানুষদের নির্ভিক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একটা বিরাট শক্তি। গান্ধীজী শেষের দিকে এসে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার মূলে রয়েছে লক্ষ লক্ষ শহীদের নীরব কর্ম। গান্ধীজী নিমিত্ত মাত্র। গান্ধীজী না থাকলেও আমাদের স্বাধীনতাকে কেউ সরিয়ে রাখতে পারত না। শুধু গান্ধীজীর

অহিংসা আন্দোলনের জন্য ইংরেজরা ভারত ছাড়েনি। পরোক্ষভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরাট আজাদ হিন্দ ফৌজের ভয়ে তারা ভারত ছেড়েছে। ইংরেজদের সময় ফুরিয়ে এসেছিল। ইতিহাসে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। শুধু দেশ কাল ভেদে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

—"দা-দা".. আমাকে তিনি সমর্থন জানালেন।

"কিন্তু নেতাজী স.....

—সুভাষচন্দ্র বসু নামটা ধরিয়ে দিলাম।

—হ্যাঁ, সুভাষ বসুর নাম লোকে জানে না।

—এখন জানবে নেহেরু ও গান্ধীজীর সময় ফুরিয়েছে। এখন শুনবেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত আরও অনেক অজানা মহাপুরুষদের নাম। তারা নামের পেছনে ছোটেননি তারা ছুটেছিলেন স্বাধীনতার পেছনে। ভারত সরকার এখন সত্যকে প্রকাশ হতে দিচ্ছে।

—আপনি কি গান্ধী বিরোধী?

—ইতিহাসকে যারা অস্বীকার করেন আমি তাদের বিরোধী। আমরা ভারতীয় বিশেষ করে আমরা বাঙালীরা দেশপ্রেমিক, আমরা স্বভাব কবি, দার্শনিক আর ভীষণভাবে স্বাধীনতা প্রেমিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হয় বাংলার মাটিতে। গান্ধীজীর প্রচারটা ভারতের বাইরে এমনভাবে হয়েছে যাতে মনে হয় গান্ধীজী একাই ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

বিয়ার পর্বের পর শুরু হল আমাদের মধ্যাহ্নভোজন। শুরু হল স্যুপ দিয়ে, তারপর লেকের মাছ ভাজা, আলু গাজরের সংমিশ্রণ, শেষে বড় কেকের ফালি। আর সব শেষে আসবে কফি আর ভোদ্‌কা। আমি তাদের সংক্ষেপে ভারতের মন্দির ও যোগবিদ্যার কথা বলে শেষ করলাম। অল্প সময় কাজেই বেশি কথা বলে তাদের সময় না নেওয়াই ভাল। আমার প্রয়োজন ছিল জানা এস্কিমোদের প্রসঙ্গে। কারণ এমন সুবর্ণ সুযোগ আর হয়তো আসবে না। খাবার আগে ও খাবারের সময় আমি ভারতের কথা বললাম। এবার আমার শোনার পালা। সংক্ষেপে সাইবেরিয়ার কথা বলতে অনুরোধ করলাম।

মিঃ আলেক্‌সেইয়েভ্ আরম্ভ করলেন আমার প্রশ্নের উত্তরে : সাইবেরিয়া রাশিয়ার ও এশিয়ার হলেও রাশিয়ার সাথে এর কোন ভাগাভাগি নেই। রাশিয়ান কমন্‌ওয়েলথের রাজধানী মস্কো। সাইবেরিয়ার প্রধান শহর এই নোভোসিবিরিস্‌ক্, লোকে বলে সাইবেরিয়ার রাজধানী। সাইবেরিয়া বিরাট দেশ। উরাল পাহাড় থেকে শুরু করে সুদূর আলাস্কা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। অবশ্য আলাস্কা ১৮৬৭ সাল থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে। রাজধানী মস্কো থেকে এর দূরত্বের কারণে আলাস্কা রাশিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তাই মাত্র সাত পয়েন্ট দুই মিলিয়ন ডলারের (7.2 million US $) বিনিময়ে আলাস্কা বিক্রি হয়ে যায়। এই বিশাল ভূ-খণ্ড ও তার অফুরন্ত খনিজ ও বনজ সম্পত্তির তুলনায় জলের দামের মত সস্তা বলা যেতে পারে।

সাইবেরিয়া আদিযুগ থেকেই শিকারী যাযাবরদের স্বর্গভূমি ছিল। শীত আর তুন্দ্রার কোন আকর্ষণ নেই তাই সাম্রাজ্য লোভীদের দৃষ্টির বাইরে ছিল এই বিরাট বরফের মরুভূমি। সাইবেরিয়ার নির্বিঘ্ন শান্তিপূর্ণ জীবনে প্রথম সংঘাত আনল ১৭শ শতাব্দীতে। প্রায় তিন লক্ষ দক্ষিণের স্থায়ী সাইবেরিয়ান আর আর্কটিক সারকেলের তিন লক্ষ শিকারী যাযাবর যাদের আপনারা বলেন এস্কিমো মোট ছয় লক্ষ অধিবাসী। দক্ষিণের যারা উত্তরের দিকে বসবাস করার জন্য গেল তারা প্রায় সবাইই পুরুষ। তারা এস্কিমোদের স্ত্রী ও মেয়েদের ধরে আনতো নিজেদের পরিবার সৃষ্টি করার জন্য। বলপ্রয়োগ বা চুরি করে মেয়েদের ধরে আনার এই প্রথা প্রায় সরকারি আইনে পরিণত হয়। এস্কিমো মেয়েদের ধরে এনে তারা উপঢৌকন হিসেবে দিত তাদের দলনেতাদের। সরকারী সৈন্যবাহিনী ও কসাক্ (Cossack)। এই ধরনের নারী উপঢৌকন সহজেই গ্রহণ করতো। ইতিহাসে এই নারী উপঢৌকনের প্রথাকে বলা হয়েছে ইয়াসির (Yasir)। এইভাবে প্রথম সৃষ্টি হল এস্কিমো নারী ও রাশিয়ান পুরুষের মিশ্র জাতি। এই মিশ্র জাতি বিশেষ করে কসাক্ (Cossak) ও এস্কিমো শিকারীদের সংমিশ্রণে তৈরি হল স্বাধীন কৃষক গোষ্ঠী (Free ploughmen)। রাশিয়ান কৃষকেরা গড়ে তুলল নতুন জমি ও জমিদার। সমস্ত সাইবেরিয়ার লোকসংখ্যা উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই সবচেয়ে দ্রুত বেড়েছে। দুই পয়েন্ট ছয় মিলিয়ন (2.6 million) থেকে মাত্র পঁচিশ বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল 5.7 million। এর মধ্যে সাইবেরিয়ার আদিবাসীর সংখ্যা আট লক্ষ সত্তর হাজার (870,000)। সাইবেরিয়ার বিরাট এলাকার তুলনায় এই সংখ্যা সত্যি কম। মনে রাখতে হবে যে সাইবেরিয়া সমস্ত চীন দেশের থেকেও অনেক বিরাট এলাকা। ১৯১৪ সালে সাইবেরিয়ার লোক সংখ্যা দাঁড়াল দশ মিলিয়ন (10 million)। মাত্র কুড়ি বছরে এরকম লোকসংখ্যার উন্নতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

অবশ্য আর একটা দিক অগ্রাহ্য করা যাবে না। সেটা হচ্ছে সাইবেরিয়া যুদ্ধবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের এক বিরাট এক্সাইল (Exile), রাশিয়ানদের প্রবাদে বলে সাইবেরিয়া হচ্ছে সমাজচ্যুতদের নরক।

১৯১৭ সালে ঐতিহাসিক অক্টোবর আন্দোলনের সময় (The Great October Revolution of 1917) যখন আঞ্চলিক সীমানার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ঝাণ্ডা নিয়ে সংগ্রামে নেমেছিল তখন সাইবেরিয়া কিন্তু স্বাধীনতা বা পৃথক রাজ্য দাবী করেনি। তারা যোগ দিয়েছিল রাশিয়ার লাল ঝাণ্ডার সাথে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালে রাশিয়ায় শুরু হয় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুশন। এই সময় হাজার হাজার রাশিয়ানরা ছুটে আসে সাইবেরিয়ায়। সাইবেরিয়ার লোকসংখ্যা তিন চার গুণ বেড়ে ওঠে। এইভাবে সাইবেরিয়ায় সৃষ্টি হল বিরাট মজদুর সমিতি। সাইবেরিয়ার কৃষকেরা যোগ দিল শ্রমিক সমিতিতে। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে সাইবেরিয়ার আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮ লক্ষের কাছাকাছি (800,000 in 1930)। তাদের মধ্যে প্রায় তিরিশটি জাতি ও উপজাতি ছিল। তারা সবাই ছিল এস্কিমো। স্বাধীনভাবে জীবজন্তু শিকার ও মাছ ধরে তারা জীবন যাপন

করত। সেই সময় সোসালিস্ট রিফর্ম (Socialist Reform) সবে শুরু হয়েছে। এস্কিমোদের আলাদা করে না দেখে তাদের সরাসরি ধরা হল সাইবেরিয়ার শিকারী গোষ্ঠী হিসেবে। USSR-এর জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের ধরা হল ন্যাশনাল ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেন্ট পর্যায়ে। এই আইনে এস্কিমোরা যখন খুশি সাইবেরিয়ার যে কোন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে পারে, যে কোন কারখানায় কাজ করার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং শিকার ও পশুপালনের সব রকমের সরকারী সুযোগ সুবিধা তারা পাবে। তবে যারা যাযাবর তাদের জন্য কোন রকম সরকারী সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়। সাইবেরিয়ার এস্কিমোদের অধিকাংশই বিভিন্ন খনি ও কারখানায় যোগ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রা পাল্টে ফেলেছে।

সাইবেরিয়ায় জ্বালানি গ্যাস, পেট্রল ও লোহার কারখানাগুলো খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করতে লাগল। সমস্ত রাশিয়া থেকে ছুটে আসতে লাগল হাজার হাজার যুবক। নতুন কাজ নতুন ভবিষ্যতের আশায় সাইবেরিয়া যুবকদের এক নতুন আশার আলো এনে দিল। তার কয়েকটা নমুনা দেওয়া যাক—

১৯৬০ সালে ছ'লক্ষ (600,000) যুবক-যুবতী সাইবেরিয়ায় এল বিভিন্ন কনস্ট্রাকটিভ প্রোজেক্টে।

১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত (১৫০,০০০) এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যুবক-যুবতী এসেছে টীউমেন অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডিপজিট প্রজেক্টে (Tyumen Oil and Gas Deposits Project)-এ কাজ করতে।

এই সব যুবক-যুবতীদের কিন্তু জোর করে কাজ করার জন্য আনা হয়নি। তারা স্বেচ্ছায় এসেছে নতুন ভবিষ্যত গড়ার আশায়। সাইবেরিয়ায় এলে তাদের মাইনেও বেড়ে যায়।

সাইবেরিয়ায় কারখানার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। খনির সংখ্যাও বাড়ছে। ভূ-গর্ভস্থ সীমাহীন তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডার অতি অল্পই মানুষের আয়ত্বে এসেছে। আধুনিক জীবনযাত্রা যত অগ্রসর হচ্ছে ততই চাহিদা বাড়ছে জ্বালানি তেল, গ্যাস আর পেট্রলের। সাইবেরিয়ার ছোটখাটো গ্রাম ও কম্যুনিটি ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হচ্ছে আর শহরগুলো ভরে উঠছে আধুনিক যন্ত্রে। সাইবেরিয়ায় এখন দুটো বড় শহর নোভোসিবিরিস্‌ক্ ও ওম্‌স্‌ক্ (Omsk)। মস্কো শহরটি গড়ে উঠতে সময় লেগেছে সাতশ বছর। আর এই আধুনিক শহরদুটো গড়ে উঠেছে মাত্র সত্তর বছরে। নোভোসিবিরিস্‌ক্ কি নেই—হেভি ইণ্ডাষ্ট্রী, ট্র্যান্সপোর্ট, কাল্‌চারাল সাইনট্রিফিক ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার। নোভোসিবিরিস্‌কের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট যাচ্ছে পৃথিবীর চল্লিশটা দেশে। নোভেসিবিরিস্‌কের মেসিন বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্রি জগৎ বিখ্যাত।

আজকাল ট্র্যান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে টুরিস্ট আনছে প্রচুর আর তার থেকে সহস্রগুণ যাতায়াত করছে মালগাড়ি।

সাইবেরিয়ার কয়লাখনিও খুব বিরাট। কুজনেট্‌স্‌ক্ (Kuznetsk) কয়লা খনিতে প্রচুর এস্কিমো কাজ করছে। অবশ্য আজকাল তাদের কেউ এস্কিমো বলে না—বলে রাশিয়ান শ্রমিক।

—"ইউরোপেও আজকাল এস্কিমো কথাটা প্রায় উঠে গেছে। তাদের বলে ইন্‌নুইট (Innuit)। আসলে ইন্‌নুইট অঞ্চলের এস্কিমো সম্প্রদায়। যেমন আজকাল ল্যাপল্যাণ্ড বলে না, বলে সামি ল্যাণ্ড (Saami Land)। আমি Mr. Alexeiyev-এর কথায় সায় দিলাম। মিঃ আলেক্‌সেইয়েভ্‌কে উৎসাহিত করতে হয় না, তিনি নিজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে লাগলেন সাইবেরিয়ার কথা। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম আর মাঝে মাঝে নোট করতে লাগলাম সাল আর শহরগুলোর নাম। আর এক কেটলি কফির অর্ডার দিলাম।

—হ্যাঁ, বলতে গেলে ১৯৪০ সালেই সাইবেরিয়ায় লাইট ও হেভী ইণ্ডাস্ট্রী প্ল্যান্ট ও ফ্যাক্টরী চালু হয়। আজ বলতে গেলে মস্কো সরকারের সত্তর ভাগ আয় আসে এই সাইবেরিয়া থেকে। ইউরোপ রাশিয়ায় অবশ্য ভাল ফসল হয়। গম, সবজি ইত্যাদি সব আসে ইউরোশিয়া থেকে। এখানে মাছ-মাংস খুব সস্তা আর সবজি সস্তা মস্কোয়।

সাইবেরিয়ার এই ইণ্ডাস্ট্রি জগৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্থানীয় লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সাইবেরিয়ার বিখ্যাত হাইড্রো-ইন্‌জীনিয়ারিং (Hydro Engineering Construction) কানস্‌ক্‌-আচিংস্‌ক্‌ ফুয়েল অ্যাণ্ড এনার্জি কমপ্লেক্স (Kansk-Achinsk Fuel and Energy Complex), আংগারা পাওয়ার ইণ্ডাস্ট্রি (Angara Power Industry) ইত্যাদি সব প্রজেক্টগুলো পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন স্থানীয় বা আঞ্চলিক পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা। এই পরিচালক সংস্থার নাম Territorial-Production Complexes। লাভ ক্ষতির হিসেব তারাই রাখে। মস্কো বা হেড্‌ কোয়াটার বলে কিছু নেই। সাইবেরিয়ার গোল্ড মাইনের কথাও আজ সবাই জানে।

এই বিরাট কলকারখানার জন্য আজকাল আর একটা বিরাট সমস্যা দাঁড়িয়েছে—সেটা হচ্ছে পল্যুশন। বহু কলকারখানার আউটলেট কাছাকাছি নদী, হ্রদ বা সাগরে পড়েছে। বাইকাল হ্রদকে বলা হয় আধুনিকতার বলি। বাইকাল হ্রদের জল আজ কলুষিত। সেখানকার মাছের স্বাদ গেছে পাল্টে। হ্রদের জল খেয়ে বিভিন্ন রোগ দেখা দিয়েছে। বাইকাল হ্রদের ধারে গড়ে উঠেছে পারমাণবিক অস্ত্রের কারখানা। আর তার ফলে আরও কলুষিত হচ্ছে বাতাস। বিভিন্ন ধরনের রেডিয়েশনে সুস্থ সবল মানুষ হয়ে পড়ছে পঙ্গু। এস্কিমোদের আমলে এধরনের মরণবিষ ছিল না। এটা আধুনিকতার ফল। বাইকাল হ্রদের দক্ষিণে বিরাট বিরাট পেপার ফ্যাক্টরীগুলোও এই পল্যুশনের জন্য দায়ী। যেমন দায়ী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

সাইবেরিয়ান গ্যাস, ওম্‌স্‌ক্‌ রিফাইনারী, সাইবেরিয়ান পাইপ লাইন, আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল ইণ্ড্রাস্ট্রী, ডিফেন্স মেটেরিয়াল প্রোডাকসন ফ্যাক্টরী, ইত্যাদি বহু কলকারখানায় আজকাল সাইবেরিয়ার আদিবাসীরা স্থায়ী কাজ পেয়ে তাদের জীবনধারা পাল্টে ফেলেছে। তারা আজ আর এস্কিমো পর্য্যায়ে পড়ে না।

তবে আর্কটিক সারকেলের উত্তরে ও উত্তরের চেক্‌চি রেঞ্জ (Chekchi Range), কোলিমা লোল্যাণ্ড (Kloima Lowland), চেরস্‌কি (Cherski), তাইমির পেনিন্‌সুলা (Taymir Peninsula), গীডা ও ইয়ামাল পেনিনসুলা (Gyda and

Yamal Peninsula) অঞ্চলে এখনও বরফের যাযাবরদের খুঁজে পাওয়া যাবে। তারা এখনও আগের মতই ইগ্‌লুতে বাস করে, তাদের ভাষা আলাদা। রাশিয়ার বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন তাদের এখনও স্পর্শ করেনি।

—আশা করি তাদের এই ঐতিহ্য বজায় থাকবে। ওরা আমাদের এই পৃথিবীর কাল্‌চারাল হেরিটেজ। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের—তাই না?

আমাদের আলোচনা বিকেল চারটে পর্যন্ত চলল। শেষে আমার ধন্যবাদ দেবার পালা। তাঁদের বার বার জানালাম আমার কৃতজ্ঞতা। রাশিয়ার দুইজন খ্যাতিমান লোকের সান্নিধ্যে এসে আমার সাইবেরিয়ার এস্কিমো তথ্য আরও জানা হল। জানতে পারলাম টুকিটাকি আরও অনেক কিছু। ওল্‌গাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানালাম।

নোভোসিবিরিস্‌ক্ সাইবেরিয়ার মনি, এরই চারপাশে ছড়িয়ে আছে সোনা-ডায়মণ্ড-পেট্রল-গ্যাস ও কয়লার খনির প্রাচুর্য্য। এখানকার বনজ সম্পদ, আর পশুসম্পদ জোগাচ্ছে সম্পূর্ণ রাশিয়ার খোরাক্। এখানকার অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদের আদি মালিক এস্কিমো সম্প্রদায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তারা নিজেরাও জানে না তাদের সম্পত্তির পরিমাণ। তাদের পেছনে নেই কোন সংঘবদ্ধ সংগঠন শক্তি।

এককালে উত্তর ও মধ্য সাইবেরিয়া ছিল শুধু এস্কিমোদের বাসভূমি। আজকাল সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। যন্ত্রের যুগে যন্ত্র চালাবার জন্য এখানে দৈনিক দলে দলে আসছে বাইরের লোক। লোকসংখ্যার হিসেবে এস্কিমো বা যাযাবর শিকারীর সংখ্যা মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ।

১৯৮০ সালের একটা হিসেবে দেখা গিয়েছে—ফ্রান্স তার দেশের শতকরা ১৪ ভাগ (14%) জ্বালানী গ্যাস সাইবেরিয়া থেকে নেয়। জার্মানী তাদের প্রয়োজনের তিরিশ ভাগ, অস্ট্রিয়া ৬৭ ভাগ, ফিনল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ জ্বালানী গ্যাস আসে সাইবেরিয়া থেকে। বলতে গেলে অবিভক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায় শতকরা ষাট ভাগ (60%) বিদেশী মুদ্রা আসতো এই সাইবেরিয়া গ্যাসের মাধ্যমে। আজকাল তো আরও বেশি।

সাইবেরিয়ার তুষারশুভ্র বরফের মরুভূমিতে আজকাল ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে অন্য রঙ্। বাতাস আজকাল দূষিত হয়ে উঠছে। শিকারী এস্কিমোদের ফুসফুসে ধরা পড়ছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষত। নিরীহ সরল এই তুষারবাসীরা জানে না তার কারণ কি?

২৬শে নভেম্বর, বুধবার ১৯৯৭

সকালবেলা নোভোসিবিরিস্‌ক্ ছাড়লাম। ওল্‌গাকে হোটেলেই বিদায় জানালাম। নোভোসিবিরিস্‌ক্ ফ্র্যাংকফুর্ট জুরিখ জেনেভা মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ। প্লেন ছাড়ল, আবার এ্যারোফ্লোট। প্লেনের হুবলো দিয়ে শেষ বারের মত তাকালাম নোভোসিবিরিস্‌ক্-এর স্কাইলাইনের দিকে। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে—কোন রিফাইনারীর গ্যাস পুড়ছে। প্লেন একটু ওপরে উঠতেই নজরে পড়ল অব্ নদীর আকাবাঁকা গতি। একটা বিরাট অজগর পড়ে আছে বরফের ওপর। একটু পরেই নজরে পড়ল চারদিকের তুষারশুভ্র তুন্দ্রা। বিদায় জানালাম সাইবেরিয়াকে।

দক্ষিণ মেরু
ANTARCTICA

(প্রথম অভিযান)

[পথ : বুয়েনোস্‌এয়ার - উশুয়াইয়া - ড্রেক প্যাসেজ - কিং জর্জ আইল্যান্ড - অ্যাড্‌মিরালটী বে - প্যারাডাইস আইল্যাণ্ড - উশুয়াইয়া]

জানুয়ারী ২, ১৯৯৮ — জানুয়ারী ৩০, ১৯৯৮

"আলা তারাসোভা (ALA TARASOVA)" জাহাজে

ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
WEDDELL SEA
QUEEN MAUD LAND
ANTARCTIC PENINSULA
TO S. AMERICA
BELLINGSHAUSEN SEA
TRANSANTARCTIC MOUNTAINS
THE SOUTH POLE
ANTARCTICA
Peter I
MARIE BYRD LAND
Mt. Siple
AMUNDSEN SEA
ROSS ICE SHELF
WILKES LAND
Ross I.
Dry Valleys
ROSS SEA
CAPE HALLETT
CAPE ADARE
ANTARCTIC CIRCLE
PACIFIC OCEAN
Balleny Is.
TO AUSTRALIA
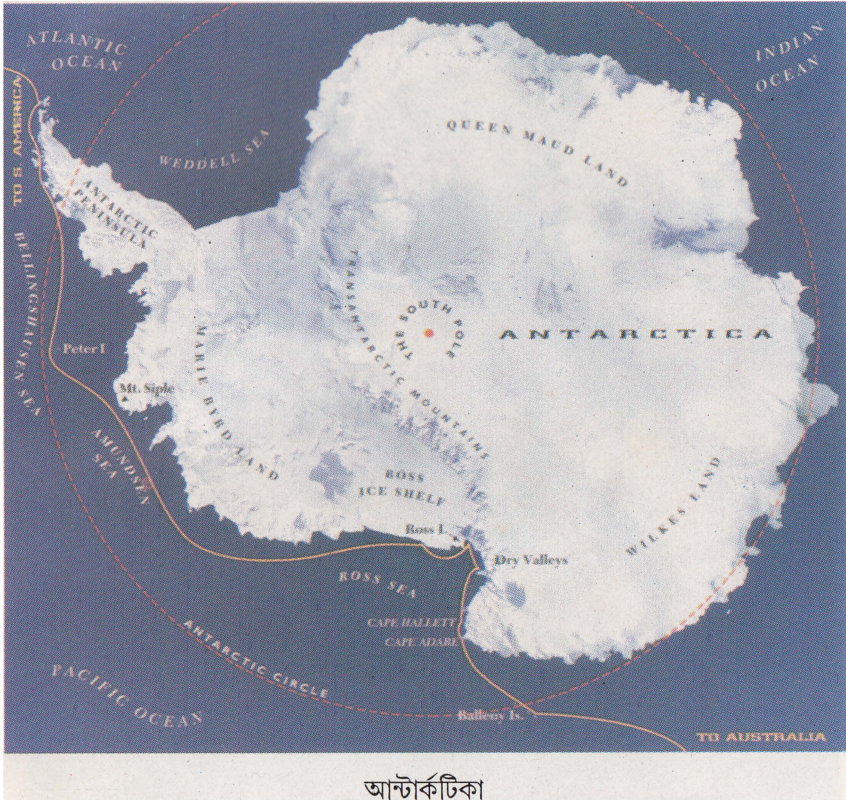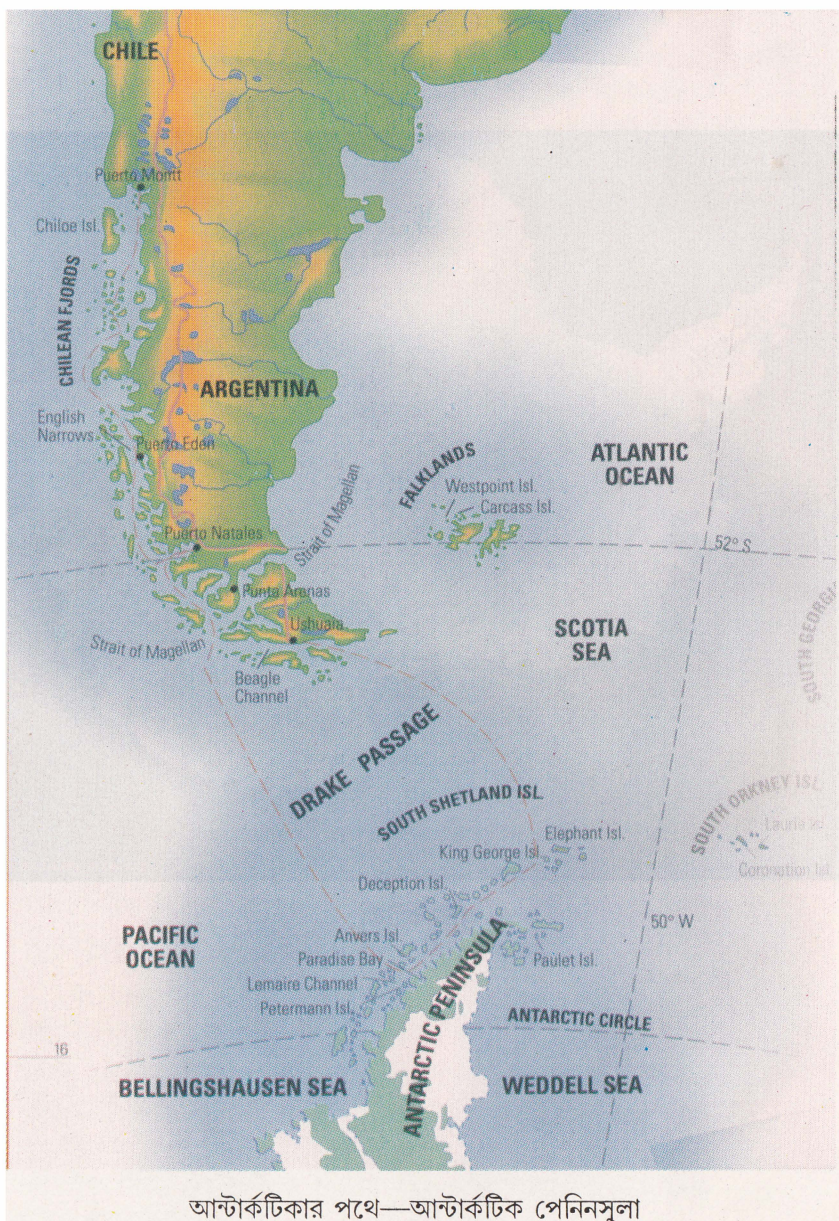
আন্টার্কটিকা

আন্টার্কটিকার পথে—আন্টার্কটিক পেনিনসুলা

বরফ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে একটি আইস্ ব্রেকার

আন্টার্কটিকার জলে ভেসে বেড়াচ্ছে তিমি
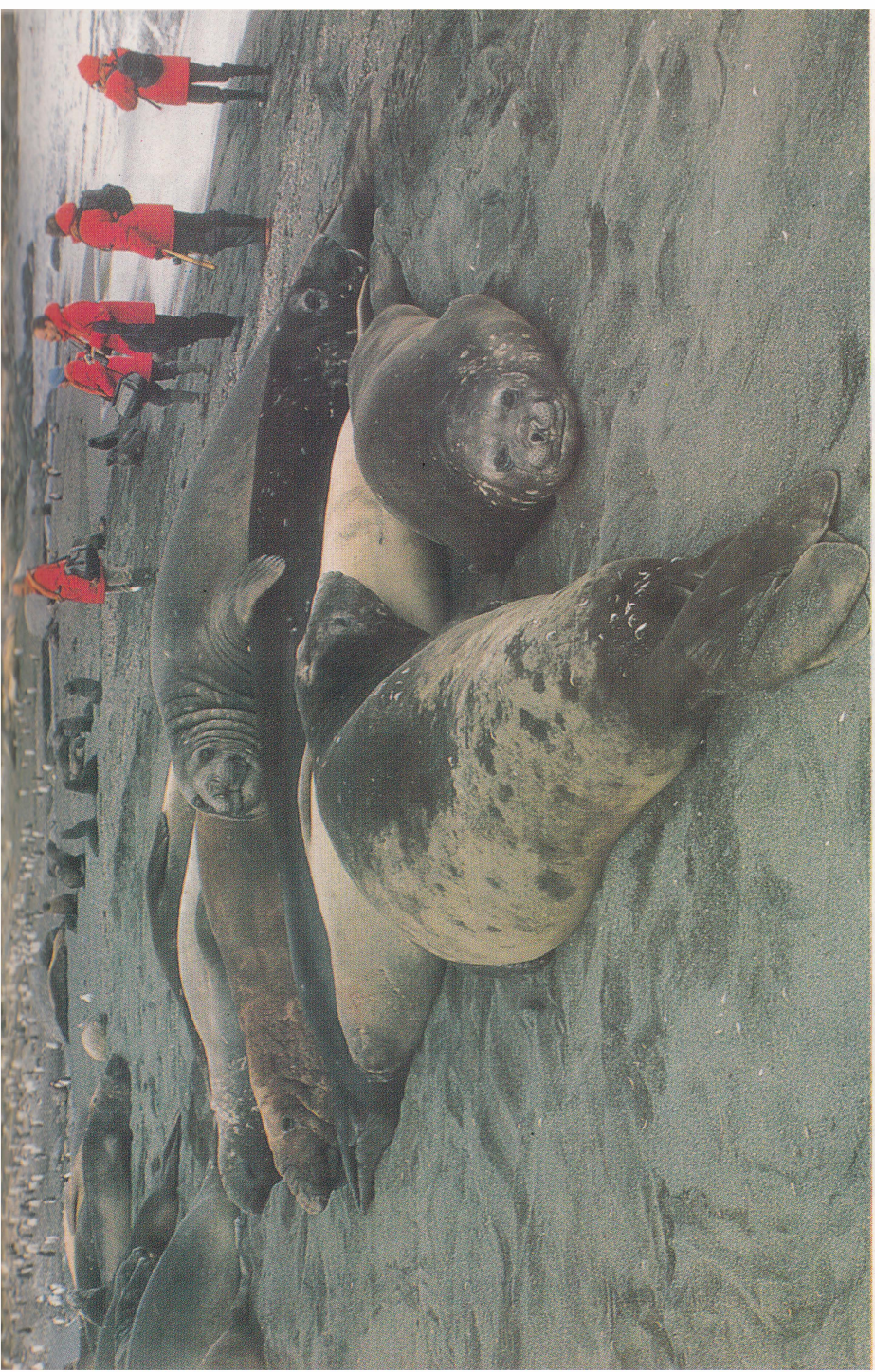
ডাঙ্গায় প্রচুর সীলমাছ, পেংগুইনদের সাথে সহাবস্থান। আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরী এই দ্বীপ

গ্লেসিয়ারের পাঁচিল : অভিযাত্রীদের এক ভয়াবহ আকর্ষণ

আমার কথা

আমি প্রথম যখন ইউরোপে গিয়েছিলাম তখন বারবার প্রশ্ন এসেছিল—"উত্তর মেরুতে কবে যাচ্ছি?" সত্যি কথা বলতে কি ইউরোপিয়ানদের কাছে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু না ঘুড়লে পৃথিবীর সবটা দেখা হল না। কথাটা ঠিক তবে আমার মত এক সাধারণ পর্যটকের সামান্য সামর্থে বিরাট পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। আমি চলেছি চলার আনন্দে। জগতের কোন অঞ্চলটা দেখা হল না, সে আফশোষ আমার নেই। যা দেখলাম বা দেখছি তাতেই আমার আনন্দ। তবে চলার কারণে ও ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় পরবর্তীকালে আমি পৌঁছে গেছি উত্তর মেরুর বহু অঞ্চলে। ইউরোপ উত্তর মেরু স্পর্শ করেছে। নরওয়ের ট্রমসো (Tromso) ও বারেন্‌স্‌বুর্গ (Barentsburg) ভ্রমণ করতে বিশেষ কোন কষ্ট করতে হয়নি। তারপর সুযোগ এসেছিল গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তরাংশ ভ্রমণের। গিয়েছি কানাডার এলেস্‌মার আইল্যাণ্ডে (Ellesmere), উত্তর আলাস্কার ব্যারোতে (Barow) সম্প্রতি ঘুড়ে এলাম। উত্তর সাইবেরিয়ার তাইমির পেনিনসুলা (Taymyr peninsula)। উত্তর মেরুতে এখনও এস্কিমোদের দেখা পাওয়া যায়, অত শীতেও মানুষ পায় মানুষের সঙ্গ। উত্তর মেরুতে মানুষ সম্পূর্ণ একা নয়। হারিয়ে গেলেও বহু সংস্থা এগিয়ে আসে উদ্ধারের হাত বাড়িয়ে। উত্তর মেরুর অভিজ্ঞতা লিখেছি আমার ডায়েরিতে। তার বহু অংশ প্রকাশিত হয়েছে আমার ভ্রমণ কাহিনীতে।

দক্ষিণ মেরু ভ্রমণের প্রথম ইচ্ছা জাগে ১৯৭০ সালে। আমি তখন গিয়েছিলাম ওয়াশিংটনে। ওখানে যাবার কথাটা আমার মনে ধরিয়ে দেয় নাশ্যানাল জিওগ্রাফিক্ সোসাইটির মিঃ ব্রুঁন (Brun)। তারই পরামর্শে আমেরিকান আর্মির একটা গ্রুপের সাথে আর্ন্টার্ক্‌টিকার রস্ সী (Ross Sea) অঞ্চলে যাবার সুযোগ পাই। তারা রাজি ছিল কিন্তু তারা চেয়েছিল ভারত সরকারের একটা লিখিত আবেদন To participate as a globe Trotter, Indian observer হিসেবে। দুর্ভাগ্য দিল্লী তো দূরের কথা আমাদের ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস এই আবেদনে সই করতে রাজি হল না কারণ আমার পেছনে ছিল না কোন সংঘ বা সরকারী Sponsorship। আমি নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে পৃথিবীর বুকে ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। আমি একা কাজেই সরকার আমার সাহায্যে জন্য হাত বাড়ালেন না। তবে দূতাবাসে আমাকে আদর করে চা বিস্কুট খাইয়েছিলেন, সে কথা বার বার স্বীকার করতেই হবে। শুভেচ্ছা বাণীও পেয়েছিলাম। যাইহোক সেই ১৯৭০ সাল থেকেই আন্টার্ক্‌টিকা (Antarctica) শব্দটা আমার মনে দানা বেঁধে ছিল। ১৯৭২ সালে ভূ-পর্যটন শেষ করে ভারতে ফিরলাম। তারপর ভারতের অদেখা কতগুলো অঞ্চল ঘুড়ে আমার ভারত দর্শন পরিপূর্ণ করলাম।

চাকরিতে যোগ দিলাম ইউরোপে। তাতে আমার ভ্রমণ নেশা অব্যাহত রাখলাম। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

গত কয়েক বছর যাবৎ আন্টার্কটিকা ভ্রমণ পরিকল্পনা আবার হঠাৎ মনের গোপন কোণ থেকে বেড়িয়ে এল। আরম্ভ করলাম সেখানে যাবার বিভিন্ন অনুসন্ধান। অবাক হয়ে গেলাম আজকাল সেখানে যাবার অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা দেখে। প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলাম ১৯৭০ সালে। আর আজ ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী। এই আটাশ বছরে পর্যটন জগতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। যে কোন ধরনের ইনফরমেশন অনায়াসেই আসতে লাগল। ভাবলাম উপযুক্ত সময় হলে সব কিছুই সম্ভব। আরও আশ্চর্য হলাম যখন পেলাম ব্রিয়ানের চিঠি (Mr. Brian Shoemarker. Secretary, American Polar Society)। ইতিমধ্যে আমার আন্টার্কটিকা যাবার কথা বন্ধু-বান্ধবরা জেনে গিয়েছে। আর একটি উৎসাহভরা চিঠি পেলাম Mr. Melaren-এর কাছ থেকে। Mr. P. Melaren, United Kingdom Antarctic Heritage Trust-এর Hony. Sercretary আর Vice Patrons : Sir Vivian Fucks and Sir Edmund Hillary. তারাও জানালেন শুভেচ্ছা।

এই দুটো ব্যক্তিগত চিঠির ফলে আমার উৎসাহ দ্বিগুন মাত্রায় বেড়ে উঠল। তারা দু'জনেই আমাকে আন্টার্কটিকা ঘুরে আসার পর তাদের সংস্থায় অভিজ্ঞতা বলার জন্য আগে থেকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল। আমেরিকান পোলার সোসাইটির সেক্রেটারী ব্রিয়ান আমার উত্তর পাবার সাথে সাথে তার E-mail-এ আমার কথা প্রচার করে দিল। এটা আমেরিকানদের স্বভাব তারা জানে কর্মের কৌশল।

আর একটা অবিশ্বাস্য চিঠি পেলাম জেফের কাছ থেকে (Mr. Jeff Rubin)। জেফের সাথে পরিচয় হয়েছে সম্প্রতি। ক্যালিফোর্নিয়ার লোক কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া থাকে টাইম্ ম্যাগাজিনের সাংবাদিক। জেফ্ পাঁচবার আন্টার্কটিকা গেছে। জেফ্ আমাকে উৎসাহ দিয়ে লিখেছে "তুমি ভূ-পর্যটক, তোমার কাছে সাউথ পোল মোটেই কষ্টকর নয়। সাউথ পোলে আজকাল হরদম টুরিস্ট যাচ্ছে। তুমি অবশ্যই পোর্ট লক্রয়ের ব্রিটিশ বেসে (British base at Port Lockroy) যাবে। আমি U.K.A.H. Trust-এর মিঃ ম্যাক্লারেনকে বলে রেখেছি।" জেফ্ আমাকে আরও অনেক খবরাখবর দিল।

এদিকে জেনেভার Kuoni ও Jerrycan Expedition Group বারবার তাগাদা দিতে লাগল—"কবে যাচ্ছি, যেন তাদের জানাই"।

সুইজারল্যাণ্ডের সুইস্ টুরিং ক্লাবতো পেছনে লেগেই আছে। তারা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। সব খবরাখবর পাওয়ার পর শেষে গ্রহণ করলাম সুইস্ টুরিং ক্লাবের অফার। আমি বহু বছর যাবৎ সুইস্ টুরিং ক্লাবের বিশেষ সদস্য। তারা জেনেভা থেকে বুয়েনোজাইরেস (Buenos Aires)। তারপর ভালডেস হয়ে সরাসরি উশুয়াইয়া। (Ushuaia)। ভালডেস ও উশুয়াইয়া আর্জেন্টিনারই শহর। জেনেভা থেকে

উশুয়াইয়া ভারিগ্ এয়ারওয়েজে (Varig) যাতায়াত প্লাস স্টপ ওভার ও হোটেলে থাকা খাওয়া সবশুদ্ধ মিলিয়ে খরচ পড়বে দু'হাজার সুইস্ ফ্রাংক মাত্র (2000 S. Fr.)। সত্যি সস্তা। উশুয়াইয়া থেকে IAATO জাহাজ ও হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করছে। সেটা আলাদা খরচ। International Association of Antarctica Tour Operators সংক্ষেপে (IAATO) ইয়াটো। উশুয়াইয়া থেকে আন্টার্কটিকা পেনিনসুলা ইয়টে যাবো বলে ঠিক করেছিলাম এবং তার জন্য ভূ-মধ্যসাগরে দশদিনের জন্য একটা ট্রায়াল ট্রীপ দিয়ে এলাম। কিন্তু শেষে ঠিক করলাম উশুয়াইয়া থেকে জাহাজেই যাবো। তাতে খরচটা কম পড়বে। পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের গ্রুপ। রাশিয়ান আইস্‌ব্রেকার। উশুয়াইয়া থেকে জাহাজে পনেরোদিনের আন্টার্কটিকা ট্যুর খরচ পড়বে পাঁচ হাজার ডলার।

আন্টার্ক্‌টিকার আকর্ষণ ও সামান্য ইতিহাস

আমি যখন ভূ-পর্যটন করি সে সময় আন্টার্কটিকা বা দক্ষিণমেরু আমাকে খুব বেশি টানেনি তার দুটো মূল কারণ হল যে, সেখানে মানুষের বসবাস নেই। আর দ্বিতীয় কারণ যাতায়াতের অসুবিধা। মাত্র বিগত কয়েক বছর যাবৎ উশুয়াইয়া থেকে অভিযাত্রী পর্যটকদের দক্ষিণ মেরু ভ্রমণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তার আগে একক প্রচেষ্ঠায় সব করতে হত। কাজেই পর্বতপ্রমাণ খরচা বহন করা সাধারণ পর্যটকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আজকাল যারা যাচ্ছে তারা সবাইই অভিযাত্রী-পর্যটক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অজানাকে জানা আর অদেখাকে দেখার আকর্ষণে যাচ্ছে। আন্টার্কটিকা দক্ষিণ মেরু, পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ মহাদেশ যাকে বলে—সপ্তম মহাদেশ। যেখানে তিনটে মহাসাগর শেষ হয়েছে ভারত, প্রশান্ত আর আটলান্টিক মহাসাগরের সর্বদক্ষিণাংশের জল ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক বিশাল গ্লেসিয়ার মহাদেশ। সেখানে মানুষ নেই, মনুষ্য সমাজ নেই। পৃথিবীর এক আশ্চর্য সুন্দরভূমি। শুধুই বরফের রাজত্ব। বরফের পাহাড়, বরফের ঢিবি, বরফের সমতলভূমি। সেখানে যাওয়া মানে সীমাহীন বরফের রাজত্বে প্রবেশ করা। জাহাজে যাওয়াও কষ্টকরতো বটেই। আজও জীবনের ঝুঁকি নিতে হয় পদে পদে। সাউথ্ পোল পয়েন্টে প্লেন বা হেলিকপ্টার ছাড়া পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।

সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে : আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণে ৫০° সাউথ ল্যাটিচ্যুড, প্রশান্ত মহাসাগরের ৫৫°—৬২° সাউথ ল্যাটিচ্যুডে, ভারত মহাসাগরও প্রায় ৫৬° থেকে ৬৩° লাটিচ্যুডে। এই সীমাকে বলা হয় কন্‌ভারজেন্স বেল্ট। এই সীমাতেই দক্ষিণের তিন মহাসাগরের জল দক্ষিণমেরুর ঠাণ্ডা বরফের জলের সাথে মিশেছে। দক্ষিণ মেরুর এই বরফের চাদর অভিযাত্রী ও পর্যটকদের এক বিরাট আকর্ষণ। আন্টার্কটিকের জলজ প্রাণীর আকর্ষণে মৎস ব্যবসায়ীরা বিরাট বিরাট জাহাজ নিয়ে তিমি ও সীল শিকার করে। আন্টার্কটিকের খাঁটি বরফের চাই ভাঙার উপায় নেই। এই বিরাট মহাদেশটির ৯৬% বরফ। মাত্র ৪% বরফ গলা জল। আন্টার্কটিকের পাহাড়ি অঞ্চলের উচ্চতা গড়ে ১০০০ মিটার। সবচেয়ে উঁচু অংশ মাউন্ট ভিন্‌সন (Mt. Vinson) উচ্চতা ৫১৪০ মিঃ (5140 m.)। এখানকার বরফের পাহাড় যখন জলে ভাসে কখনও কখনও তার উচ্চতা ৫০ মিঃ আর বিস্তৃতি প্রায় ১০০ কিলোমিটার। এখানকার ঠাণ্ডা গরমের সময় -৩০° সেঃ আর শীতের সময় -৫০° সেঃ। তাছাড়া আছে প্রায় অনবরত তুষার ঝড়। এই রুক্ষ আবহাওয়া ও বরফের ওপর কোন জন্তু জানোয়ার বাঁচতে পারে না তবে কনভারজেন্স বেল্টের কাছাকাছি অর্থাৎ যেখানে বরফ ও জলের মিশ্রণ, সেখানে জলজপ্রাণীর প্রাচুর্য্য। নানাধরনের মাছ তো বটেই

আর রয়েছে পেংগুইন, সীল, তিমির ঝাঁক। মানুষ সেখানে যাচ্ছে অদেখা আর অজানার আকর্ষণে, সীমার বাইরে যাওয়া মানুষের জন্মগত নেশা। সেই নেশার জন্যই মানুষ যাচ্ছে এভারেস্টে, ডুব দিচ্ছে মহাসাগরে ; পাড় হচ্ছে সাহারা আর যাচ্ছে কুমেরু ও সুমেরুর হিমল হাওয়ার স্পর্শ পেতে। যারা যাচ্ছে সবাই কিন্তু ফিরছে না। তা সত্ত্বেও সেই চিরন্তন অভিযানের যেন শেষ নেই। বৈজ্ঞানিকদের কাছে আন্টার্কটিকা একটা বিরাট গবেষণা ক্ষেত্র। পৃথিবীর জলবায়ু, ওজোন গ্যাসের স্তর আর পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক পরীক্ষা নিরিক্ষা করার উন্মুক্ত গবেষণাগার।

উত্তর মেরুর বরফের সীমানা ঠিক গোলাকারভাবে প্রসারিত নয়। কিন্তু দক্ষিণ মেরুর বরফের সীমানা অনেকটা গোলাকৃতি ধরনের। দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণে আর্জেন্টিনা ও চিলি তার ভৌগোলিক সীমা রেখে সরাসরি নীচে নেমে গিয়েছে। অনেকটা কুমীরের লেজের মত। জল ও পাথর ধাক্কাধাক্কি করে সৃষ্টি করেছে হাজার হাজার দ্বীপ। ঠিক সেই লেজ ধরে আরও নীচে নেমে সেই লেজাকৃতি ভূখণ্ড প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগ স্থলে অদৃশ্য হয়ে যেন ডুব দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই অংশটি পৃথিবীর ছটি মহাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণাংশ, চিলির দিকে পাওয়া যাবে ম্যাজেলান ডেট্রয়েট (Detroit of Magellan), টেরা ডেল্ ফুয়েগো (Terra Del Fuego)। আর্জেন্টিনার অংশে পাওয়া যাবে রিও গ্রাণ্ডে (Rio Grade) উশুয়াইয়া (Ushuaia)। একদম নীচে ক্যাপ হর্ন (Cape Horn)।

বেশ কয়েক বছর আগে ইউনাইটেড কিংডমের শাসনাধীনে ফাল্ক্ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে আর্জেন্টিনা ও ইউনাইটেড কিংডমের সংঘর্ষের কথা আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। ফাল্ক্ল্যাণ্ড (Falkland Island) ৫২° ল্যাটিচ্যুডে আর ক্যাপ হর্ন ৫৬° ল্যাটিচ্যুডে। আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া (Ushuaia) প্রায় ৫৫° ল্যাটিচ্যুডের কাছাকাছি। উশুয়াইয়া থেকেই আমরা জাহাজে যাবো আন্টার্কটিক্ পেনিনশুলায়। আন্টার্কটিকের প্রায় গোলাকার কচ্ছপের মত অংশ থেকে লেজের মত অংশটি উত্তরের দিকে উঠে এসেছে। একটু কল্পনার আশ্রয় নিলে ম্যাপে দেখা যাবে যে একটা দৈত্যাকৃতি বরফের কচ্ছপ যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে চিৎ হয়ে শুয়ে ধরে রেখেছে। ঠাণ্ডাবাতাস, বরফের পর বরফ পড়ে সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়। দক্ষিণ মেরুর বরফ যদি গলতে শুরু করে তাহলে ভারত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক এই তিন সমুদ্রের জল সতেরো আঠারো মিটার উঁচুতে উঠে পৃথিবীর বুকে বন্যা বইয়ে দেবে। আমি বৈজ্ঞানিক নই, ঐতিহাসিকও নই। আমি বার বার আমার ডায়েরিতে লিখেছি আমার অক্ষমতার কথা। সাধারণ পর্যটক হিসেবে আমার যতটুকু জানা দরকার তাই জেনেছি। অন্যান্য পর্যায়ের মত এই আন্টার্কটিক অধ্যায়েও তার কিছুটা লিখতে বাধ্য হলাম।

আন্টার্কটিক গ্রীক শব্দ আর্কটিক শব্দ থেকে এসেছে। আর্কটিক মানে উত্তর 'আন্ট' বিপরীত অর্থাৎ আর্কটিকের বিপরীত আন্টার্ক্টিক। গ্রীক্ ও রোমান ইতিহাসে আন্টার্কটিক্কে বলা হত অজানা দেশ। সেই দেশ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই এবং জানারও দরকার ছিল না। সমুদ্র পেড়িয়ে যাবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা হয়তো সে

যুগে ছিল না। আন্টার্কটিকের কথা ইউরোপে প্রথম আনে ফরাসী নাবিক এক্সপ্লোরার কেরগুয়েলেন (French Explorer Kerguelen) ১৭৭২ সালে। তারই কয়েক মাস পর ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন কুক্ (Capt. Cook)। ১৭৭৫ সালে ক্যাপ্টেন কুক্ আন্টার্কটিকের চারপাশে ঘোরেন। তিনি তার ডায়েরিতে মন্তব্যে লিখেছিলেন, "আন্টার্কটিক দ্বারা পৃথিবীর কোন লাভ হবে না। ক্যাপ্টেন কুকের এই মন্তব্য কয়েক বছর পরই মিথ্যা প্রমাণিত হল। ক্যাপ্টেন কুকের ইনফরমেশন নিয়ে বহু নাবিক দক্ষিণ মেরুতে যায় সীল ও তিমি শিকারের জন্য। আস্তে আস্তে দক্ষিণ মেরুর এই শিকার ভীষণভাবে লাভজনক হয়ে উঠল। ফলে দলে দলে অর্থলোভে ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ মেরুর সীল ও তিমিমাছ শিকার করে সেখানকার এই জন্তুগুলোকে প্রায় উচ্ছেদ করার উপক্রম করেছিল। তারপর বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী জাতির হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। সীলের চামড়া, তিমি মাছের চর্বি ও মাংস ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খুব প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় আন্টার্ক্‌টিকে গবেষণামূলক অভিযান চালান হয়। উইল্‌কেস্ (Wilkes), রস (Ross) এবং দ্য উরভিল (D'urville) গবেষণা ক্ষেত্রে এই তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরাই দেখলেন যে এই মাছ শিকারীদের জন্য আন্টার্ক্‌টিকে সীল (Seal) জন্তুগুলো প্রায় উধাও হবার মুখে। এতো গেল আন্টার্কটিকের জলভাগের কথা। এরপর শুরু হল আন্টার্কটিকের মূলকেন্দ্রে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতা। মূল কেন্দ্রে অর্থাৎ সাউথ পোল পয়েন্টে।

১৯০৯ সালে একজন আইরিশ্ নাবিক আর্নেস্টশ্যাকলেটন (Earnest Shackleton) সাউথ পোল পয়েন্টের প্রায় ৯৭ মাইল দূরত্বে পৌঁছেছিলেন। মাত্র ৯৭ মাইল হলেই তিনি হতেন প্রথম দক্ষিণ মেরুবিন্দুর মানুষ। তিনি অভিযানে বিফল হলেও তার এই অমানুষিক পরিশ্রম, পরিকল্পনা আর প্রচেষ্টার জন্য তিনি বিশেষ সম্মানীয় নাইটহুড (Knighthood) পেয়েছিলেন।

দক্ষিণ মেরুবিন্দু (South Pole Point) অভিযান শুরু হল আরও ব্যাপকভাবে। তিমি শিকার, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ, নতুন আবিষ্কার, লাভ, সন্মান আর খেতাবের আশায় অভিযাত্রীরা ঝাপিয়ে পড়ল দক্ষিণ মেরুর জলে আর গ্লেসিয়ারের রাজত্বে।

দক্ষিণ মেরু অভিযানের গল্পে ইতিহাসের পাতা ভর্তি। আমরা হিমালয়ের দেশের লোক। এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি ইত্যাদি শৃঙ্গ আরোহনের গল্প শুনে অভ্যস্ত। দক্ষিণ মেরু অভিযানের গল্পও প্রচুর। মেরু অভিযানের দুটি অমর চরিত্র রোয়াল্‌ড্ আমুন্‌ড্‌সেন ও রবার্ট স্কট। এ দুজনের অভিযানও ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে। সংক্ষেপে তাদের গল্পটাও শোনাই :

১৪ই ডিসেম্বর ১৯১১ সাল। রোয়াল্ড আমুন্ডসেন দক্ষিণ মেরু অভিযান সফল করে দঃ মেরুবিন্দুতে ওড়াল নরওয়ের জাতীয় পতাকা। আমুন্ডসেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি দক্ষিণ মেরুর সর্বদক্ষিণে ৯০° দ্রাঘিমাংশ স্পর্শ করেছিলেন। তার মাত্র ৩৫ দিন পর ব্রিটিশ ক্যাপটেন স্কট্ সেখানে পৌঁছে দেখেন যে, নরওয়ের পতাকা উড়ছে।

কি আফশোষ। সাংঘাতিক মানসিক বিপর্যয়। ক্যাপ্টেন স্কটের উক্তি "ছোটবেলা থেকেই আমি নর্থপোল যাবার স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু ভাগ্যের কি খেলা নিজেকে নিয়ে গেলাম সাউথ পোলে।"

রোয়াল্ড আমুন্ডসেনের (Roald Amundsen) জন্ম ১৬ই জুলাই, ১৮৭২ সালে। অস্লোর কাছাকাছি হাভ্লের (Havler) দ্বীপে। ছোটবেলা থেকেই তার সাগরের প্রতি আকর্ষণ। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছোট রোয়াল্ড বেড়িয়ে পড়ত তার ছোট্ট নৌকো নিয়ে ফিওর্ডের (Fjiord) অজানা দ্বীপগুলোর সন্ধানে। নৌকো মেরামতি ও নৌকোর ছেড়া পালের দড়ি টাঙানোর ব্যাপারে সে দক্ষ। মাঝে মাঝে তাতে দু'চার পয়সা হাতেও আসতে লাগল। বাবাও ছিলেন নৌকো মেরামতের কারিগর। বাবার কাছেই হাতেখড়ি। একটু বড় হতেই সে স্বপ্ন দেখতে লাগল উত্তর মেরুবিন্দুতে যাবার। আর পুরোনো পুঁথি ঘেটে অনুসন্ধান করতে লাগল কিভাবে কানাডার উত্তর দিয়ে আর্কটিক সাগর ডিঙিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছানো যায়। রোয়াল্ডের মা কিন্তু ছেলের এই অভিযান ও বড় হওয়ার ভাবধারা পছন্দ করতেন না। তার ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। বাবা নীরব রইলেন। মার ইচ্ছায় রোয়াল্ড্ ভর্তি হল মেডিকেল কলেজে। মা মারা গেলেন এক বছর পর। মা মারা যেতেই রোয়াল্ড্ কলেজ ছেড়ে দিয়ে আবার ঝাপিয়ে পড়ল সামুদ্রিক ও উত্তর মেরু অভিযান পরিকল্পনায়। তার বয়স তখন মাত্র একুশ বছর। তখন নরওয়ে সরকার ফ্রাম পরিকল্পনায় অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। ফ্রাম (Fram) উত্তরের বরফ ভাঙ্গার জন্য বিশেষ সরঞ্জামপূর্ণ একটি জাহাজ। আর্কট্িক্ সাগরে বরফ ভেঙে তার মধ্য দিয়ে এই জাহাজটা অনায়াসে যাতে এগিয়ে যেতে পারে তা জন্য নরওয়ে সরকারের এই প্রথম বিরাট পরিকল্পনা। আমুন্ডসেনের উৎসাহ, জ্ঞান ও কর্মতৎপরতায় নরওয়ে সরকার তাকেই নিয়োগ করলেন এই জাহাজের ক্যাপ্টেন পদে। ইতিমধ্যে রোয়াল্ড দক্ষ নাবিক হিসেবে সুপরিচিত হয়েছে। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে খবর এল যে ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল আমেরিকার রবার্ট এড্উইন্ পিয়ারী (Robert Edwin Peary) নর্থ পোল অভিযান সফল করে সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা গেঁথে এসেছে। নরওয়ের কাছে এটা একটা বিরাট দুঃসংবাদ। রোয়াল্ডের স্বপ্ন ধুলোয় ঢাকা পড়ল। লক্ষ লক্ষ টাকার ফ্রাম প্রোজেক্ট-এর ওপর পড়ল বজ্রপাত। কিন্তু রোয়াল্ড্ জন্মেছে অভিযানের স্বপ্ন নিয়ে। তার রক্তে রয়েছে নাবিকের উৎসাহ আর নির্ভিকতা। মাসখানেকের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়াল তার হাতিয়ার "ফ্রাম" (Fram) কে তিনি কাজে লাগাবার জন্য বিরাট একটা পরিকল্পনা করলেন।

১৯১০ সালের জুন মাসে তিনি নরওয়ের রাজা সপ্তম হাকোনকে (King Haakon VII) জানালেন যে, তিনি উত্তর মেরুতে যাচ্ছেন না তিনি যাবেন দক্ষিণ মেরু অভিযানে। এবং কথামত তিনি জাহাজের মুখ ঘোরালেন দক্ষিণের দিকে। তার এই ঘোষণা ইংল্যাণ্ডের অভিযাত্রী মহলে তুমুল তর্কের সৃষ্টি করল। ইংল্যাণ্ড রেগে

গেল, কারণ অনেকদিন আগেই ক্যাপ্টেন ফাল্কন্ স্কট্ (Capt. Falcon Scot) ঘোষণা করেছেন যে তিনি আন্টার্কটিক অভিযানে যাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন আমুণ্ডসেনকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন—আমি জাহাজের মুখ আন্টার্ক্টিকের দিকে চালাচ্ছি ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে শুরু হল দুই নাবিকের আন্টার্কটিক অভিযানের প্রতিযোগিতা। দু'জনের পেছনেই রয়েছে প্রচুর আর্থিক ভাণ্ডার। একদিকে নরওয়ের রাজা আর অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেনের রাণী। ১৯১১ সালের ১৪ই জানুয়ারী ফ্রাম আন্টার্কটিকের বরফের জমিতে নাবিয়ে দিল আটজন অভিযাত্রী। রস্ সী বেরিয়ারে এই প্রথম পড়ল অভিযাত্রীদের পা। জাহাজ রইল সমুদ্রে। রস সী বেরিয়ারে তাঁবু খাটানো হল সাউথ পোল যাবার প্রস্তুতির জন্য। ক্যাম্পের নাম দেওয়া হল ফ্রামহাইম্ (Framheim)। পনেরটি তাঁবু, অভিযানের বিরাট মালপত্র, একশ যোলটি হাস্কি কুকুর, প্রচুর পরিমাণে রান্নার জন্য ও দলের বিভিন্ন প্রয়োজনে কয়লা, কুকুর চালিত শ্লেজ, দশদিনের জন্য এই প্রস্তুতি-শিবির। বলাই বাহুল্য যে তাদের সঙ্গে রয়েছে ৬০টি কুকুরের বিরাট পরিমাণ খাদ্য। প্রস্তুতি-শিবির থেকে সব মালপত্রগুলো ভাগ করে তিনটি শিবিরে পাঠানো হবে। তাদের ডিঙোতে হবে বরফের পাহাড়। অর্থাৎ বরফের ওপর বরফ পড়ে তৈরি হয়েছে পাহাড়। পাথরের ওপর বরফ নয়। জানুয়ারী মাস দক্ষিণ পোলের গরমকাল। তাদের সঙ্গে রয়েছে এক বছরের খাবার। শুধু খাদ্যদ্রব্যের ওজনই হচ্ছে একহাজার পাঁচশ কিলো। অধিকাংশই কৌটোবন্দী। ফ্রাম জাহাজে আছে পাঁচ বছরের মজুত খাদ্য, কয়লা আর জাহাজের নাবিকদের জন্য আলাদা সব কিছু। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আর রেডিও। জাহাজ ছেড়ে বহু দূরে প্রস্তুতি শিবির ছেড়ে এবার শুরু হল তাদের সত্যিকারের সাউথ পোল অভিযান। চলতে চলতেই তারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে সেই অভিজ্ঞতাতেই তারা এগিয়ে যাবে।

তারা তখন জানতই না যে ব্রিটেনের ক্যাপ্টেন স্কটের অভিযাত্রী দল এই রস সী বেরিয়ারেরই আর এক প্রান্তে তাদের প্রস্তুতি শিবির খাটিয়েছে।

দক্ষিণমেরুতে কয়েকমাস পরেই শুরু হল শীত। অর্থাৎ মার্চ মাসে শুরু হল তুষার সংগ্রাম। সাধারণ তাপমাত্রা মাইনাস ২০° (-20^0C)। আর বরফের প্হাড় অতিক্রম করার সময় কখনও কখনও -৮০° (80^0C)। সেই সময় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের অনেকেরই ধারণা ছিল যে, আন্টার্কটিকের রুক্ষ ও ভয়াবহ বরফের আবহাওয়ার পর নিশ্চয়ই কোন এক জায়গা পাওয়া যাবে সুজলা সুফলা দেশ। আমুন্ডসেনের মনে কিন্তু কোনদিনই আন্টার্কটিকের রঙিন স্বপ্ন দেখা দেয়নি। সে তার দলকে আগে থেকেই পুরোপুরি সাবধান করে দিয়েছিল যে, তারা যাচ্ছে বরফের এক দুঃসাধ্য মরুভূমি অতিক্রম করতে। মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই, তার চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে দক্ষিণ পোলের শুকনো মাইনাস ৬০/৭০ ডিগ্রীর ঠাণ্ডা হাওয়া। তাদের একমাত্র লক্ষ্য অভিযান দক্ষিণ পোলের ৯০ ডিগ্রীতে নরওয়ের পতাকা ওড়ানো।

অক্টোবর পর্যন্ত আমুন্ডসেন খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তিন নং শিবির স্থাপন

করলেন। এক নম্বর ও দুই নম্বর শিবিরে তিনি উপযুক্ত মালপত্র রেখে দিলেন আসবার সময় কাজে লাগানো হবে। জনমানবহীন এই বরফের রাজত্বে চুরি হবার ভয় নেই আর গরমে খাদ্যসামগ্রী পচে যাবারও সম্ভাবনা নেই। আন্টার্কটিক্‌কে বলা হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ন্যাচারাল রেফ্রিজারেটর।

১৭ই নভেম্বর শুরু হল আমুণ্ডসেনের এই বিরাট অভিযানের শেষ অধ্যায়। নভেম্বরে তাপমাত্রা বেড়েছে, গরমের শুরু। আমুন্ডসেন তার দলের বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ার করে দিলেন। হান্‌সেন (Hansen) কুকুর বিশেষজ্ঞ (Husky Dog Trainer), হাসেল (Hassel) কুকুর চালিত শ্লেজ গাড়ির দক্ষ (Specialist Dog Sled) বিয়াল্যাণ্ড (Bjaaland) নরওয়ের শ্রেষ্ঠ স্কিয়ার (Champion of Ski), উইস্টিং বর্শা দিয়ে সিন্ধুঘোটক ও তিমি মাছ শিকারে পারদর্শী। আর আমুন্ডসেন ধরলেন সরাসরি নেতৃত্বের ধ্বজা।

দলের এক একজনের অধীনে এক একটা বিরাট মালবোঝাই শ্লেজ গাড়ি। মোট পাঁচটি শ্লেজ। প্রতিটি শ্লেজ বারোটি কুকুর টানছে। মোট ষাটটি কুকুর। দীর্ঘ উনত্রিশ দিন ধরে চলল দেহ ও মনোবলের পরীক্ষা। অভিযানের শেষ পর্ব বরফের পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে আরও একহাজার দুশ কিলোমিটার (1200 km)। তাদের এই শেষ পর্বে বরফের পাহাড় ডিঙোতে হল যার উচ্চতা তিন থেকে চার হাজার মিটার। পথ হয়ে উঠল দুর্গম। চারদিকে দেখা দিতে লাগল বরফের ফাটল। তারা প্রায় চারপাশে খাদের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ল। কিন্তু দক্ষ নাবিকের মত আমুন্ডসেন তার দলকে নিয়ে চললেন স্থায়ী গ্লেসিয়ারের দিকে। সেখানে ফাটল নেই কিন্তু পদে পদে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা। এখান থেকে শুধু নীচে নামার পালা। কুকুরগুলো ক্লান্ত ও আধমরা। হানসেনের পরামর্শে দুটো শ্লেজ ছেড়ে দিতে হল। ক্লান্ত কুকুরগুলোকে মেরে তাদের ইহকালের দুঃখ থেকে রেহাই দেওয়া হল। অতি সন্তপর্ণে মাত্র তিনটে শ্লেজ আর আঠারোটি কুকুর নিয়ে জীবনকে হাতের মুঠোয় ধরে নামতে লাগল হাকসেল হেইবার্গ-এর (Haxel Heiberg) পিচ্ছল গ্লেসিয়ারে। পরবর্তীকালে এই নামার পথটিকে নাম দেওয়া হয়েছে দৈত্যের নাচ-ঘর (Salle De Danse De Diable)। যেখানে মানুষের পদে পদে মৃত্যুভয় সেখানে দৈত্যের শুরু হয় নাচ।

১৪ই ডিসেম্বর ১৯১১ সাল আমুন্ডসেন উপস্থিত হলেন পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। বার বার মেপে সূর্য্যের অবস্থান দেখে সেখানে স্থাপন করলেন তার তাঁবু শিবির "Polheim"। তার ওপর ওড়ালেন নরওয়ের বিজয় পতাকা। তাদের জীবন হল সার্থক। তারা তিনদিন সেখানে কাটালেন। তাঁবু আর তুললেন না। শিবিরে রইল বাড়তি খাদ্য ও সরঞ্জাম। তাঁবুর ভেতরে একটি এনভেলপে রোয়াল্‌ড্‌ আমুন্ডসেন ক্যাপ্টেন স্কটের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি রেখে দিলেন তাতে লেখা :

"প্রিয় কম্যাণ্ডার স্কট, সম্ভবত : আমাদের পর আপনারাই প্রথম এই শিবিরে এসে পৌঁছবেন। জানিনা আমরা নরওয়ে ফিরে যেতে পারবো কি না। যদি সম্ভব হয় সংলগ্ন এই খামটা নরওয়ের রাজা সপ্তম হাকোনকে দেবেন। এই তাঁবুতে আমাদের দলের

অনেক জিনিস রেখে গেলাম। যদি প্রয়োজন বোধ করেন কাজে লাগাতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আমি আন্তরিকভাবে আপনার প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করি।—আপনার একান্ত রোয়াল্ড্ আমুণ্ডসেন”

আসলে ব্রিটানিক এক্সপেডিশন ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। ক্যাপ্টেন স্কট হাস্কি কুকুরপ্রেমী। নর্থপোল এক্সপেডিশনে অনেক সময় অভিযাত্রীরা বরফে আটকে পড়ে। দিনের পর দিন ঐ সাংঘাতিক আবহাওয়ায় মরনাপন্ন অবস্থায় কুকুরদের মৃত্যুযন্ত্রনার কষ্ট দেখতে না পেরে তাদের মেরে ফেলেন। শুধু তাই নয়, সেই কুকুরের মাংস, অবশিষ্ট কুকুর ও নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এটাই বাঁচার একমাত্র পথ। ক্যাপ্টেন কুক এই সব গল্প জানতেন তাই তিনি আন্টার্কটিক অভিযানের জন্য কুকুরের শ্লেজ নেওয়ার কথা চিন্তা করেননি। তিনি বেছে নিয়েছিলেন পনি। মালপত্র বহন করার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে শীতকালে পনির ব্যবহার খুবই প্রচলিত, ইংলাণ্ডে তো বটেই। তাই তিনি আন্টার্কটিকে মালপত্র বহন করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন পনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই পনি ইউরোপের দারুন শীতকে সহ্য করতে পারলেও আন্টার্কটিকের শীত সহ্য করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাছাড়া আর এক বিরাট অসুবিধা দেখা দিল। স্কটের অভিযাত্রীদের মাল নিয়ে রস্ পাহাড়ের গ্লেসিয়ার পার হবার সময় পনিগুলো ভীষণভাবে ঘামতে লাগল। শীতের মাত্রা সেখানে মাইনাস ৬০° সেন্টিগ্রেড। কোন কোন সময় সত্তর আশী। পনিগুলোর ঘাম বেরোবার সাথে সাথে সেই ঘাম জমে গিয়ে পনিরগুলোর দেহ বরফের শক্ত চাদরে ঢাকা পড়ে গেল। পনিগুলো সেই শক্ত আবরণকে কিছুতেই ঠেকাতে পারল না। একে একে সব পনিগুলোই মারা পড়ল। হাস্কি কুকুরদের ঘন পশমের জন্য এরা কিন্তু ঠিক মানিয়ে নিতে পারতো যেমন হয়েছে রোয়াল্ড্ আমুন্ডসেনের ক্ষেত্রে।

পনির অভাবে মালপত্র সহ শ্লেজগুলোকে টানতে হল ক্যাপ্টেন স্কটের লোকজনদের. তার ফলে হয়ে গেল দেরী। রস সী বেরিয়ারে আমুন্ডসেনের দল কয়েক সপ্তাহ আগে আসা সত্ত্বেও এই মালপত্র বহনের অজানা সমস্যার সন্মুখীন হওয়ার দরুণ তাদের দক্ষিণ পোলে পৌছতে ৩৫ দিন দেরী হয়ে গেল। স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেই দেখতে পেলেন আমুন্ডসেনের ওড়ানো পতাকা দেখেই এক বিরাট হতাশায় তিনি ভেঙে পড়লেন। ফেরার পথে তাদের মনোবল আর শারীরিক বল ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দক্ষিণ মেরুর প্রথম মানুষ তিনি হতে পারলেন না। তার গর্ব ধুলিসাৎ হয়ে গেল। এই ধরনের বিরাট এক্সপেডিশনে একবার মনোবল হারালে তাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন স্কট আর আন্টার্কটিক ছেড়ে ফিরে আসেননি। তার দলের সবাইই একে একে মনোবল হারিয়ে শীত, ক্লান্তি ও অনাহারে সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ওদিকে দক্ষিণ মেরু বিজয়ী রোয়াল্ড্ আমুন্ডসেন নরওয়েতে ফিরে এলেন সগৌরবে। পরের বছর তিনি আবার বেড়িয়ে পড়লেন দক্ষিণ মেরুতে। ফ্রামহাইম্ বেস থেকে আবার ঘুরে এলেন ৯০° দক্ষিণ ল্যাটিচ্যুড। তবে এবারে সময় লাগল মাত্র সাতানব্বই দিন। পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্য তিনি হয়ে উঠলেন দক্ষিণ মেরু বিশেষজ্ঞ।

দক্ষিণ মেরু বিজয়ী আমুন্ডসেন তার পুরোনো স্বপ্ন নর্থপোল যাওয়ার কথা ভুলে যাননি। কয়েক বছর পর তিনি আবার তার ফ্রাম উত্তর সাগরের জলে ভাসালেন। এবারে তিনি আর স্থলভাগ দিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না। তিনি জলপথে জাহাজ তারপর প্লেন ও হাইড্রোপ্লেন নিয়ে ঘুরে এলেন নর্থ পোলে। হাইড্রোপ্লেনে তার পাইলট ছিল ইটালীর বিখ্যাত পাইলট নোবিলে (Nobile)। সেটা ছিল ১১ই মে ১৯২৬ সাল (11.05.1926)। তারও দু'বছর পর তিনি খবর পেলেন যে তাঁর পাইলট বন্ধু নোবিলের একটা বেলুন এক্সপেডিশনে এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। উত্তর মেরুতে। তিনি হাইড্রোপ্লেন নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন নোবিলকে উদ্ধার করতে। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! তিনি নোবিলকে খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা নিজেই হারিয়ে গেলেন উত্তর মেরুর কোন এক জায়গায়। রোয়াল্ড্ আমুন্ডসেনের দেহ বা তার হাইড্রোপ্লেনের কোন অস্তিত্ব কেউ পায়নি। এইভাবে একটি অ্যাডভেঞ্চারাস জীবনের শেষ হল। হারিয়ে যাওয়ার সময় আমুন্ডসেনের বয়স ছিল মাত্র ছাপ্পান্ন বছর।

ক্যাপ্টেন স্কট ও আমুন্ডসেনের পর থেকেই আন্টার্কটিক অভিযান দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে উঠল। ১৯২৯ সালে রিচার্ড ই বীর্ড (Richard e. Byrd) নামে একজন আমেরিকান ফটোগ্রাফার প্লেন থেকে দক্ষিণ মেরুর প্রচুর ফটো তুললেন। তার উদ্দেশ্য আন্টার্কটিকের বিশদ্ বিবরণ সকলের কাছে তুলে ধরা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও অভিযাত্রীদের কাছে। মিঃ বীর্ডই প্রথম আন্টার্কটিকের ভাল ম্যাপ প্রকাশ করলেন। আন্টার্কটিক সকলের কাছে আরও পরিচিত হল।

আন্টার্ক্টিক কোন্ দেশের অধীনে?

আন্টার্কটিক কোন্ দেশের অধীনে এই প্রশ্নটার একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, এটা পৃথিবীর সর্বজাতির অধীনে। মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ। এটাই বর্তমান জগতের অভিমত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আসার মূলেও আছে ইতিহাস। রাজ্যলোভী দেশগুলো অত সহজে কি এই কথা স্বীকার করেছিল?

ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে আন্টার্ক্টিকা (১৭৭২-৭৫) পরিক্রমার পর থেকে বৃটিশরাজ ধরে নিয়েছিল যে আন্টার্ক্টিকা তাদেরই শাসনাধীনে। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরাসরি ঘোষণা করল যে আন্টার্ক্টিকা তাদের। আমুন্ডসেনের দক্ষিণমেরু বিজয়ের পর নরওয়ে ঘোষণা করল দক্ষিণমেরু তাদের। তাদের ঘোষণা শোনামাত্র আর্জেন্টিনা ও চিলি ঘোষণা করল আন্টার্কটিকা তাদের। কারণ তারাই আন্টার্কটিকার সর্বনিকটে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কোন ঘোষণা বা দাবী করল না। ১৮২০ সালের পর থেকে বারোটি দেশ আন্টার্কটিকে অনুসন্ধানমূলক, গবেষণামূলক অথবা বাণিজ্যিক কারণে রীতিমত যাতায়াত শুরু করেছিল। আর তাদের মধ্যে সাতটি দেশ দাবী করছে আন্টার্কটিকের বিভিন্ন অংশ।

ব্রিটিশ, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, চিলি, সোভিয়েত দেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করল। তাদের সাথে যোগ দিল বেলজিয়াম, জাপান, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ফ্রান্স।

এই বারোটি দেশের সবাইই শক্তিশালী। আন্টার্কটিকাকে তারা বার্থডে কেক কাটার মত করে যে যার পছন্দমত ম্যাপ বার করতে লাগল। তাতে দিন দিন আন্তর্জাতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েই চলতে লাগল। শেষে ১৯৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক বর্ষে এই সব জাতিগুলো একসঙ্গে বসলেন এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য। বহু তর্ক বিতর্কের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এল মীমাংসার জন্য। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সক্রিয় সহযোগিতায় ও পরামর্শে সর্বজাতির এক মিলিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। তারা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ১৫ই অক্টোবর ১৯৫৯ সালে ওয়াশিংটনে। সিদ্ধান্তে বলা হল—

আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের স্বাধীনতা বজায় রাখা হবে। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যহার করা হবে। এখানকার আইনগত স্থিতাবস্থা বহাল রাখা হোক। শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তাদের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেন কোন রকম রাজনৈতিক বাঁধা না পড়ে সে বিষয়ে সর্বজাতিকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আন্টার্ক্টিকাকে সব রকম বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দূষণ থেকে মুক্ত রেখে সমগ্র মাবনজাতির মিলিত সম্পদ হিসেবে একে রক্ষা করতে হবে।

আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আন্টার্ক্টিকার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে উপরিউক্ত স্বাক্ষরিত চুক্তি বজায় রেখেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে ভারতের দক্ষিণ থেকে সরাসরি অক্ষাংশ ধরে দক্ষিণে নামলে পাওয়া যাবে আন্টার্কটিকা। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে ভারতের দাবী একান্তই ন্যায্য। ভারতের যে অংশটা ভারতীয় আন্টার্কটিকা হিসেবে দাবী করা যেতে পারে সে অংশটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে নিয়েছে কারণ অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েল্‌থের সভ্য এবং যে সময় আন্টার্কটিকার ভূ-ভাগ নিয়ে কল্পিত সীমার সৃষ্টি করে তাকে কেক ভাগের মত বৃহৎশক্তিরা ভাগাভাগি করেছিল সে সময় ভারত ছিল ব্রিটিশ রাজের অধীনে। কিন্তু আজ ১৯৯৮। ভারত একটি স্বাধীন দেশ। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে বিশাল ভারতের নামে নামকরণ হয়েছে ভারত মহাসাগরের। আজ আন্টার্ক্টিকার কিয়দংশ ভারতের হওয়াই, ভারতের ন্যায্য অধিকার। ভারত ১৯৮৩ সালের ১৯শে আগস্ট আন্টার্কটিক ট্রীটী পার্টিতে যোগদান করে (Antarctic Treaty Parties)। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—যে রাশিয়ার কোন অংশই সরাসরি আন্টার্কটিকার সাথে যুক্ত নয়, অথচ তাদের দাবী উপেক্ষা করা হয়নি। রাশিয়া আজ পনেরো ভাগে ভাগ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তবু তাদের দাবী অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আন্টার্ক্টিকের ওপর রাশিয়ার দাবী কিভাবে স্বীকৃত হল বুঝতে পারলাম না। ইন্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার (International Geophysical Year July 1, 1957 to December 31, 1958) এ বারোটি দেশ একত্রিত হয়ে আন্টার্কটিকার চিরশান্তিচুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলেন। আর তার পরেই বিভিন্ন দেশের উৎসাহে ও তাদের আগ্রহে আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল বিভিন্ন গবেষণাগার। মূল আন্টার্কটিকা ভূখণ্ডে আজ গড়ে উঠেছে প্রায় চল্লিশটি স্টেশন। আরও কুড়িটি স্টেশনের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সাবআন্টার্ক্টিক দ্বীপগুলোতে।

সাউথ্ পোল পয়েন্টে সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও (প্রাচীন) রাশিয়ার দুটো উল্লেখযোগ্য স্টেশন। বিভিন্ন দেশ আন্টার্কটিকা পার হবার জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারী ব্যবস্থাপনা করে রেখেছে তবে সেগুলো সবই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই সাধারণ টুরিস্টদের সে সব স্টেশনে যেতে হলে বিশেষ ব্যবস্থা ও অনুমতির প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক বর্ষ (International Geophysical Year) ছাড়াও আন্টার্কটিকার নিরপেক্ষতা ও সর্বপ্রকারের বিপদমুক্তির জন্য আরও অনেকগুলো কনফারেন্স হয়েছে। সব কনফারেন্সের লক্ষ্য একই। The Antarctic Treaty. A unique agreement for a unique place.

১৯৭৮ সালে আন্টার্ক্টিকার সীল সংরক্ষণ অধিবেশন।

১৯৮০ সালে আন্টার্কটিকার সমুদয় জীবজন্তুর সংরক্ষণ অধিবেশন।

১৯৯১ সালে আন্টার্কটিকার দূষণমুক্ত জলবায়ু সংরক্ষণ অধিবেশন।

মোট কথা আন্টার্কটিকার ওপর যে যাই দাবী করুক না কেন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমার জন্য কোন চেক্‌পোস্ট আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। আন্টার্কটিকা

অভিযানে বা সফরের জন্য যে দেশ থেকে মহাসাগর পাড়ি দেবার জাহাজ বা প্লেন নিতে হবে সে দেশের ভিসাই যথেষ্ট। যেমন নিউজীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা ও চিলি থেকে জাহাজ নিলে সে সব দেশের ভিসা নিতে হবে। ফাল্‌ক্‌ল্যাণ্ড বা সাউথ জর্জিয়া যেতে হলে চাই ব্রিটিশ ভিসা।

ভারত থেকে যদি কেউ ভারতীয় জাহাজ নিয়ে সরাসরি সত্তর, আশী ও নব্বই ডিগ্রী অক্ষাংশ ধরে দক্ষিণে এসে আন্টার্কটিকা স্পর্শ করে তাহলে তার ভিসার কোন প্রশ্নই আসে না। এটা আমাদের দেশগত ও জলসীমাগত অধিকার। সবচেয়ে সুখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর যুদ্ধ প্রতিযোগী দেশগুলোর বহু জাহাজ আন্টার্কটিকার চারপাশে ঘোরাফেরা করলেও আজ পর্যন্ত আন্টার্কটিকায় কোন রকম যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি। সে কারণে আন্টার্কটিকা আজ অভিযাত্রী পর্যটকদের স্বর্গভূমি। আন্টার্কটিকায় ভারতের দুটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আছে, একটির নাম দক্ষিণ গঙ্গোত্রী আর একটির নাম মৈত্রী। প্রথমটি ভারতীয় নৌবাহিনীর অস্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে। দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে তারই কাছে দ্বিতীয় কেন্দ্রটি (মৈত্রী) তৈরি হয়। আমাদের গর্বের বিষয় যে, দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে সারা বছরই বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী ও নৌবাহিনীর লোকেরা বসবাস করে। শীতের সময় ২০ জন এবং গরমের সময় ৪০ জন। তবে দুঃখের বিষয় যে অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রগুলোর মতো ভারতীয় কেন্দ্রে বেসরকারী অভিযাত্রীদের যাতায়াতের সুযোগ নেই। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে যুব, ক্রীড়া ও শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে বিবেচনা করবেন। আমার এই মন্তব্যটা ২০০১ সালের।

আন্টার্ক্‌টিকার পথে

যারা ভারতীয় নৌবাহিনীতে আছে তাদের কথা আলাদা কিন্তু সাধারণ পর্যটক হিসেবে কাউকে ভারতবর্ষ থেকে আন্টার্কটিকা সরাসরি যেতে হলে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশনের বন্দোবস্ত করতে হবে। তারজন্য চাই বিপুল আয়োজন আর আর্থিক বন্দোবস্ত। ভারতমহাসাগর পাড়ি দিয়ে আন্টার্কটিকা পৌছবার পরিকল্পনার জন্য চাই এক্সপ্লোরার টীম। আমি এক সাধারণ ভবঘুরে। আমি প্রতিযোগিতা, নাম বা ধ্বজা ওড়াবার পথ ধরিনি। আমি দুচোখ ভরে দেখছি এই রহস্যভরা জগতকে। যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। যত দেখছি ততই নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই জন্ম স্বার্থক। ডিস্‌কভারি কথাটা বিদেশী বা গর্বিত ছোট্ট মানুষদের সৃষ্টি এক শব্দ বাহবা কুড়োবার আর ব্যবসার এক যন্ত্র। এই জগৎটা সৃষ্টি হয়েই আছে। জগৎ তার বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার সাজিয়ে বসে আছে। এই রূপকে না দেখা আমাদের দুর্বলতা আর তা দেখাতেই উপলব্ধি। মানুষের বাহাদুরী কোথায়? ঈশ্বর সৃষ্ট এই সাজানো বাগানের ফল তুলে খাওয়ায় গর্ব, যশ, নাম বা বাহাদুরী নেই। যেটা দরকার তা হচ্ছে সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে মাথা নত করে সেই না দেখা সৃষ্টি কর্তাকে বার বার প্রণাম করা।

আন্টার্ক্‌টিকা যাবার কথা ভূ-পর্যটনের সময় ভাবিনি কারণ আমার ইচ্ছা ছিল দেশ ও মানুষ দেখা। আন্টার্কটিকা দেশ নয়, সেখানে নেই মানুষ। আজকালকার এই যান্ত্রিকযুগে প্রচুর সুবিধা। অল্প চেষ্টায় হেলিকপ্টারে এভারেস্টে যাওয়া যায়, লাসা কৈলাসনাথ আজ আর দূরে নয়। শুধু আর্থিক সামর্থ থাকলে ভ্রমণের কোন অসুবিধা নেই। জগৎটা দিন দিন হয়ে আসছে ছোট।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড বা সাউথ আফ্রিকা হয়ে সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে আন্টার্কটিকা যাওয়ার খরচ প্রচুর। আমার সুবিধা হচ্ছে আর্জেন্টিনা হয়ে দক্ষিণের উশুয়াইয়া থেকে জাহাজ নেওয়া। সময় ও খরচ দুটোই কম—আর বিপদের ঝুঁকিও কম। সাইবেরিয়া থেকে ঘুড়ে এলাম মাত্র একমাস আগে। জেনেভায় ডিসেম্বর মাস কাটালাম। এখানে এখন শীত। জুরা (Jura) ও আল্পসের ওপর বরফ পড়ে প্রকৃতি, চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমিকে আরও সুন্দরতর করে সাজিয়ে ক্রিসমাস ও নিউইয়ারের জন্য তৈরি হয়েছে। ইউরোপে এই সময়টা আমার খুব প্রিয়। জেনেভাতেই উৎসব কাটালাম।

১৯৯৮ সালের ২রা জানুয়ারি জেনেভা থেকে রওনা দিলাম আর্জেন্টিনার উদ্দেশ্যে আর্জেন্টিনার ভারিগ এয়ারওয়েজে।

আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ার, স্প্যানীস ভাষায় বুয়োনোজাইরেস্। স্থানীয় লোকেরা বলে "বাইরেস্"। এই শহরে এর আগেও দুবার এসেছি। মূল শহরে এবার না থেকে শহর থেকে চল্লিশ কিমি. দূরে নদীর ধারের এল্ টিগ্রে (El Tigre) শহরে উঠলাম। বুয়েনোস এয়ারের শহরতলী। নদীর নাম এল্ টিগ্রে আর এই প্রাচীন ব্রিটিশ ধরনের শহরটির নামও এল টিগ্রে। টিগ্রে অর্থাৎ বাঘ। হোসে আমার পুরোনো বন্ধু, বয়সে ছোট। সে এয়ারপোর্টে এসেছিল। তারই ইচ্ছে যে আমরা বহুদিন পর একসঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাব। হোসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ফ্রান্সে। তখন সে ছিল অবিবাহিত ও ছাত্র। এখন বিয়ে করেছে, দুই মেয়ে। এল্ টিগ্রেতেই থাকে। নিজস্ব ট্রাভেলিং এজেন্সি। স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে কাজ করে। ওর বাড়ির সামনে আমরা এসে পার্ক করলাম। আভেনিডা সার আলেক্সাণ্ডার ফ্লেমিং (Avenida Sir Alexander Fleming)। তিন তলায় মাঝারি ধরনের এ্যাপার্টমেন্ট, পরিচিত হলাম ওর সুন্দরী স্ত্রী ও দুই কন্যার সাথে। হোসের বয়স বিয়াল্লিশ। পরিবারের মত আমাকে সবাই সাদরে গ্রহণ করল। বুয়েনোস এয়ার থেকে এক ঘন্টার পথ এল্ টিগ্রে। সম্ভ্রান্ত এলাকা। শহরের দম আটকানো আবহাওয়া থেকে পালাবার সহজ উপায়। আমরা একটু বিশ্রাম করে সপরিবারে বেড়িয়ে পড়লাম বেড়াতে নদীর ধারে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জানুয়ারি মাস অথচ সুন্দর গরম আবহাওয়া। ইউরোপের শীতকাল এখানকার গরমকাল। বুয়েনোস এয়ার, দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ৩৫ ডিগ্রী দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

নদীর ধারে আমরা একটি বর্ধিষ্ণু এলাকায় এসে পৌঁছলাম। নদীর ধারে সুন্দরভাবে বাঁধানো রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো ভেনিসিয়ান ধরনের। নদীর ওপারে সুন্দর একটি ভিকটোরিয়ান বাড়ি। তার ডান দিকে বোট ক্লাবের এলাকা। এল্ টিগ্রে নদীটা গভীর, বেশি চওড়া নয়। হাওড়া স্টেশনের কাছে গঙ্গার অর্দ্ধেকেরও কম। ওপারের লোকজনদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সামান্য ভাড়ায় লঞ্চ যাতায়াত করছে। আমরাও ফেরী ঘাটে গিয়ে পার হলাম। রাত্রিবেলা নদীর দুধারের দৃশ্যটা শান্ত নিস্তব্ধ। আমরা নদী পার হয়ে ভিকটোরিয়ান ধরনের পুরোনো বাড়িতে এসে উঠলাম। অতি সুন্দর সাজানো বাগানের মধ্যে এই বাড়িটাই বিখ্যাত ক্লাব দে রেগাতাস্ দ্য লা মারিনা (Le Club Des Regatas De La Marina)। ক্লাবের মধ্যে ভাল রেস্ট্রোরেন্ট আছে। আমরা সেখানেই রাতের খাওয়ার জন্য বসলাম। নদীর মাছ ও আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ফাইন বফ্ এখানকার স্পেশাল মেনু। খেতে খেতেই আমাদের গল্প ও পরিচয় শুরু হল। দুটি ফুটফুটে মেয়ে তিন ও পাঁচ বছরের। স্ত্রী ফেরনাণ্ডা খুব হাসিখুশি ও মিশুকে।

হোসে ফ্রান্সে গিয়েছিল ভাষা শিক্ষার জন্য। ফেরনাণ্ডা আর্জেন্টিনার বাইরে বেরোয়নি। মেয়েরা বড় হলে দুজনে যাবে আমেরিকা ও ইউরোপ ঘুরতে। আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। পরের দিন আমরা দুজনে সাইট্ সীইং-এ বেরোলাম। হোসের ফরাসী গাড়ি "পেজো চারশ পাঁচ"। আর্জেন্টিনা সাধারণতঃ ইউরোপের সাথেই বেশি আমদানী রপ্তানী করে।

এল্ টিগ্রে শহরতলীর নাম, নদীর চলতি নামও এল্ টিগ্রে। তবে আসলে এই নদীটা আর্জেন্টিনার বিখ্যাত পারানা নদীরই একটি শাখা। পারানা নদীর এই ডেল্টা অঞ্চলকে বলা হয় লেস্চুয়ের দ্যু রিও দ্য লা প্লাত (L'estuaire Du Rio De La Plata) অর্থাৎ পারনা নদীর ডেল্টা। এই ডেল্টা অঞ্চল প্রায় চৌদ্দ হাজার কিলোমিটার স্কোয়ার (14000 km^2)। নদীর ধারে সুন্দর সুন্দর বাংলো আর নদীতে বিভিন্ন ধরনের বোটগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের অবস্থা ভালই। নদীর ধারের বড় রাস্তা ধরে আমরা প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে এসে অবাক হয়ে গেলাম। নদী এখানে অসংখ্য ছোটখাটো দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। দ্বীপগুলোয় সুন্দর সুন্দর বাড়ি। কোন গাড়ি যেতে পারে না। তাদের বোট রয়েছে, অনেকটা ভেনিসের মত। এই সৌখিন বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে ইউরোপ কন্টিনেন্টের নোস্টালজি এদের এখনও যায়নি। ফেরার পথে দেখলাম কয়েকটি জেটিতে পুরোনো বোট, বোট মিউজিয়ামটাও এক নজরে দেখলাম। মিউজিয়ামের ইতিহাস যেন পুরোনো ইউরোপের ইতিহাস।

গাড়িতে যেতে যেতেই মাঝে মাঝে এসে যেতে লাগল ওর ইউরোপ ট্যুরের কথা। আমরা একসাথে ঘুড়েছি মারসেই মঁপলিয়ে নিস্ ও কান্। আর মাঝে মাঝে একসাথে যেতাম কামার্গের বুনো ঘোড়া ধরতে সেটা ছিল আমাদের বেপরোয়া জীবনের এক অধ্যায়। ফ্রান্সের কামার্গেই হোসের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তখন আমাদের দু'জনেরই হর্স-রাইডিং ছিল প্রধান নেশা।

পারানা নদীর এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটা এত বর্দ্ধিষ্ণু ও আকর্ষণীয় তা আমার জানা ছিল না। মনে হচ্ছে যে বুয়েনোস এয়ারের ধনীরা সবাই এ অঞ্চলে তাদের বাড়ি করেছে। নতুন বাড়িগুলোর সাথে পুরোনো বাড়িগুলো সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার ফুটবল খেলা। খেলোয়াররাই এখানকার এক নম্বর স্টার। তাদের অনেকের বাড়ি এই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর এখানকার ভিলাগুলো। বিশেষ করে ভিলা লাম্বারেনে (Villa Lambarene), ভিলা ট্রম্পিতা (Villa Trompita), ভিলা লস্ মিলাগ্রোস (Villa Los Milagros), এল্ ফরটিন (El Fortin), লা লুনা (La Luna), লা আল্মারিলা (La Almarila) ও ভিলালিন্ড্রভ্ এ্যান্ড হিস্ বয়েস্ (Villa Leandrov And His Boys)। মনে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্কিটেক্টরা তাদের সেরা মডেলগুলোর এক বিরাট প্রদর্শনী করেছে। সবুজ ও সুন্দর নদী ও দ্বীপগুলোর মাঝে মানুষের এক অপূর্ব সৃষ্টি। আরও আশ্চর্য হলাম এখানকার রেস্কোর্স কাজিনো ও

তার সংলগ্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখে। হোসের সঙ্গে না এলে এই সুন্দর ধনী এলাকায় কোনোদিনই হয়তো আসতাম না।

বুয়েনোস এয়ার, বুয়েনোজাইরেস, বাইরেস্ একই রাজধানীর বিভিন্ন নাম ও উচ্চারণ। রাজধানীর অনেক আকর্ষণ কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে এখানকার বিখ্যাত আভেনিডা নাইন্ দে জুলিও (Avenida 9 De Julio)। রাস্তা নয়তো যেন মাঠ। একশ পঁচিশ মিটার চওড়া। রাস্তাটা আর্জেন্টিনার স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। শহীদ মনুমেন্ট ওবেলিস্ক্ (Obelisque)। আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১৮১৬ সালের ৯ই জুলাই (9th July, 1816)। এই রাস্তাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে চওড়া রাস্তা। রাস্তার মাঝখানটা হাইওয়ের মতো তার দুপাশে পার্ক আর তারপর সাইড লেন। রাস্তার দুপাশে বিরাট বিরাট বাড়ির অরণ্য। তারই মধ্যে ছোট বাইলেন বা গলির মধ্যে রয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন আকর্ষণ। বুয়োনোস এয়ারের কফিরুমগুলো আকর্ষণীয়। এখানে নিউইয়র্ক, রোম ও প্যারিসের মিশ্র কালচার সৃষ্টি হয়েছে।

আমার মত ভবঘুরেদের কাছে রাজধানীর আর একটা আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার ডক্ (Dock) এলাকা। পৃথিবীর সব জাতির এক মিলনক্ষেত্র অনেকটা নিউইয়র্কের মত। লা বোকা (La Boca), সান্ টেল্মোর আভেনিদা দে মাইও (Avenida De Mayo), পুরোনো বাজার (Quartier Des Antiuaires), ঘুরলে শুধু রাজধানীর নয় মনে হয় সম্পূর্ণ দেশের একটা পুরো ছবি পাওয়া যাবে। আর একটা আর্জেন্টিনার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার পশুবাজার লিনিয়ের (Linier)। পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট পশুবাজার। বলাই বাহুল্য যে আর্জেন্টিনার গরুর মাংস পৃথিবী বিখ্যাত।

আমি এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন ছিলাম একা। মনের ইচ্ছায় সে সব জায়গায় ঘুড়ে বেড়িয়েছি। এবারে আমি হোসের অতিথি কাজেই আমার জন্য ওই প্রোগ্রাম করে রেখেছে।

হোসে অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানী ঘোরার বা সাইট সীইং এর বন্দোবস্ত করেছে। আমি ওর প্রোগ্রাম অনুযায়ী চললাম। এখানকার ভাষা স্প্যানিস্ কিন্তু ইংরেজী ফরাসী এবং ইটালীয়ান ভাষাও চলে। টুরিস্ট ভাষা অবশ্য সব জায়গাই ইংরেজী। আমেরিকান বা আমার মত সাধারণ পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাজধানীকে ঐতিহাসিক এবং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিতে ৬টি দ্রষ্টব্যস্থানে ভাগ করা হয়েছে।

প্লাসোলেতা পেলেগ্রিনি (Plazoleta Pellegrini) :

রাজধানীর ফরাসী এলাকা। এখানে এলেই মনে হয় যেন প্যারিসে এসে পড়েছি। ফরাসী বণিকেরা তাদের স্মৃতি রেখে গেছে বিভিন্ন বাড়িঘর ছাড়াও রয়েছে ফরাসী রেস্ট্রোরেন্ট ও বিভিন্ন ধরনের বুটিক।

লা রেকোলেতা (La Recoleta) :

এই এলাকাটা সম্পূর্ণ পুরোনো ধর্মীয় এলাকা। একটা চার্চ, একটা কুভঁ

(Couvent) অর্থাৎ সিস্টারদের হোস্টেল, একটা বিরাট সিমেটিয়ের (Cimetier) অর্থাৎ কবরখানা। পুরোনো আমলের ক্রিশ্চান পাদ্রীদের এটাই ছিল প্রধান ধর্মীয় এলাকা। বর্তমানে তার সাথে যুক্ত হয়েছে অনেক সম্ভ্রান্ত রেস্ট্রোরেন্ট, ন্যাশনাল লাইব্রেরী আর অ্যাকাডেমী অফ্ ফাইন আর্টস্।

কারতিয়ে (Quartier) :

পুরোনো রাজধানীর আদি এলাকা ছোট ছোট বাড়ি, কাফে, রেস্ট্রোরেন্ট, স্কুল সব একটার সঙ্গে আর একটা লাগানো। অনেকটা শ্যামবাজার এলাকার মত। পুরোনো ট্রাডিশন এরাই বহন করে আসছে।

লা বোকা (La Boca) :

আর্জেন্টিনায় প্রথমে ইউরোপ বিশেষ করে স্পেন ও ইটালী থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করেছিল। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্জেন্টিনাকে তাদের অধিকারে এনে ব্যবসা বাণিজ্য করার। লা বোকা সে সময় ছিল বন্দর এবং এখানে ইটালীয়ান বণিকদের ছিল প্রথম ও প্রধান ঘাঁটি। এখানে তাই পাওয়া যায় ইটালীয়ান স্থাপত্যের নমুনা। আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ট্যাংগো (Tango) নৃত্য এখানেই শুরু হয়। ট্যাংগো নৃত্যের উঠোনটা এখনও আগের মতোই আছে।

আভেনিদা দ্য মাইও (Avenida De Mayo) :

এই এভেন্যুতে পাওয়া যাবে সব রকমের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মূল কার্য্যালয়। এই এভেন্যুর প্রায় প্রত্যেকটি মোড়ে আছে ঐতিহাসিক মনুমেন্ট। কাসারোসাডা (Casa Rosadaza) বা পার্লামেন্ট হাউজ্, কংগ্রেস হল (Congress Hall), আর প্রচুর অতি আধুনিক ও সুন্দর সুন্দর সরকারী বাড়ী। অনেকগুলো অভিজাত হোটেল ও আকর্ষণীয় রেস্ট্রোরেন্ট ও কাফে কর্ণার।

প্লাসা লাভাল্ (Plaza Lavalle) :

প্লাসা লাভাল্ বলতে গেলে এভেন্যু মাইওরই কন্‌টিন্যুয়েশন। তবে আরও সবুজে ঢাকা। এই অঞ্চলটাকে রাজধানীর মূল কালচারাল কেন্দ্র বলা যায়। এখানকার আভিজাত্যপূর্ণ থিয়েটার হল ও তার চারপাশের সাজানো বাগান উন্নত শিল্পীমনের উদাহরণ। দেশ বিদেশ থেকে শিল্পীরা আসে এই জাতীয় থিয়েটার কোলন দেখতে। আর তারই পাশে রয়েছে ল্য প্যালে দ্য ট্রিব্যুনো (La Palais Des Tribunaux) অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট।

স্থানীয় লোকেদের সাথে পরিচয় থাকলে এটাই সুবিধে দেশ শহর ও মানুষ সম্পর্কে আরও জানা যায়। হোসে আমার ইনটারেস্ট জানে তাই সব ঘুড়িয়ে দেখাতে লাগল। বুয়েনোস এয়ারের শহরতলী পাম্পা দিনের পর দিন তার রূপ পাল্টাচ্ছে। সমুদ্রের ধারের এই ছোট্ট জেটিটি আগে ছিল জেলে নৌকোর কেন্দ্র, তারপর হল

ইউরোপীয় উপনিবেশ, তারপর হয়ে উঠল বন্দর। পাম্পা ছিল একটা ছোট্ট দ্বীপ। ইউরোপীয় উপনিবেশ সে সময় এই দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকাল সেই ছোট্ট পাম্পোই রাজধানীর এক আকর্ষণ।

আমরা রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা ও গলিঘুরে বিকেল চারটের সময় আভেনিদা দ্য মাইও (Avenida De Mayo)'র একটা সম্ভ্রান্ত কফি হাউসে এসে বসলাম। এখানে ফেরনাণ্ডা আমাদের সাথে এসে যোগ দেবে। কাফে হাউসটির নাম ল্য কাফে টরটনি (Le Cafe Tortoni)। অবাক হয়ে গেলাম চারদিকের দেয়াল সুন্দর সুন্দর পুরোনো তৈলচিত্রে ভর্তি। হলটা ইটালীয়ান আর্ট গ্যালারির মত। অফিসের শেষে অনেকে রিল্যাকসের জন্য এখানে এক কাপ কফি খেয়ে তারপর বাড়ি ফেরে। অতি সৌখিন পরিবেশ। ঠিক সময়মতো ফেরনাণ্ডা এল। সে হাসিমুখে জানাল যে মেয়েরা তাদের মাসীর সাথে আজ থাকবে। কাজেই ফিরতে রাত হলে কোন অসুবিধা হবে না। আমরা তিনকাপ চুরোস্ (Chuross)-এর অর্ডার দিলাম। চুরোস অর্থাৎ গরম চকোলেট। অনেকটা আমাদের দেশের ওভোমাল্টিনের মত। ফেরনাণ্ডা চারদিকে তাকিয়ে বলল আজকে বসার জায়গা পাওয়া গেছে কিন্তু উইক এণ্ডে এখানে জায়গা পাওয়া মুশকিল। মন্ত্রীরাও এখানে আসে পানীয়কে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে। কথায় কথায় জানলাম যে হোসে ও ফেরনাণ্ডা ট্যাংগো নাচে দক্ষ। অবশ্য আর্জেন্টিনার প্রায় সকলেই ট্যাংগো জানে। ইউরোপে ট্যাংগো যে কোন আধুনিক নাচের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে কোন বল্ রুমে (Ball room) ট্যাংগো নাচ না হলে তার পূর্ণতা বজায় থাকে না। ট্যাংগো নাচ আমার মতে স্প্যানিশদের ফ্রেমিংগো ও টরেডার মিশ্রণে তৈরি। বীরত্ব, দেহের সাবলীল ভঙ্গি আর কামরসযুক্ত। আমরা সেখান থেকে উঠে পড়লাম।

বুয়েনোজাইরেস-এর ট্যুরিস্ট আকর্ষণ অনেক। মনুমেন্ট থেকে শুরু করে অতি আধুনিক রেস্ট্রোরেন্ট পর্যন্ত কোন কিছুরই অভাব নেই, তা সত্ত্বেও রাতের বাইরেস (বুয়েনোস এয়ারের চলতি নাম) সম্পূর্ণ এক আলাদা জগৎ। রাতেই যেন রাজধানী তার প্রাণ পায়। হোটেল, রেস্ট্রোরেন্ট, ড্যান্সিং ক্যাবারে, নাইট ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা আর অজস্র চোখঝলসানো আলোর খেলায় রাজধানী যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমরা এলাম রু সুইপাচা (Rue Suipacha)-র অ্যাকাডেমি দ্য ট্যাংগোতে। ফেরনাণ্ডা এখানেই ট্যাংগো নাচ শিখেছে। একতলার সুন্দর কাঠের মেঝে তার ওপর তিনজন যুবক ও তিনজন যুবতী নাচ অভ্যাস করছে। এই নাচে সঙ্গী ও সঙ্গীনীর একান্তই প্রয়োজন। পাশে টেপে বাজনা চলছে। সুন্দর নাচ। ইউরোপের বহু অঞ্চলে ব্যালে, ভাল্স্ থেকে শুরু করে পোল্কা ইত্যাদি অনেক দেখেছি। ব্রাজিলে দেখেছি সাম্বা ফ্লামেংগো আর এখানে দেখছি ট্যাংগো। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আকর্ষণ করার ক্ষমতা তো বটেই। আধঘণ্টা নাচের মহরা দেখে আমরা বেরোলাম। আমরা এবার ঢুকলাম একটা অতি জমজমাট রাস্তায় নাম ফ্লোরিডা। এখানেই সব রকমের মানুষের এক বিরাট মিশ্রণ। স্প্যানিস, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, আমেরিকান,

ইণ্ডিয়ান আর আফ্রিকান অরিজিন, সবাই যেন নাচছে। সবাই উৎসবে যোগ দিয়েছে। আমরা একটা স্প্যানিস্ রেস্ট্রোরেন্টে ঢুকলাম। দূরে মিউজিক্যাল পার্টি, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান আর গল্পগুজবের এক সুন্দর আপনকরা পরিবেশ। আমরা বিয়ার পান করলাম। খেলাম পায়লা, নাচলাম। তারপর বাড়ি ফেরার পালা। আনন্দের নেশায় আমরা প্রায় মাতাল। ফিরতে ফিরতে রাত একটা হয়ে গেল।

আমার এই ডায়েরিটি আর্জেন্টিনার জন্য লেখা নয়। ইউরোপ থেকে আর্জেন্টিনা হয়ে যাচ্ছি দক্ষিণ আমেরিকারই সর্বদক্ষিণে উশয়াইয়া। যাবার পথে এখানে থেমেছি কাজেই যতটুকু পারছি লিখছি। ভবিষ্যতে কেউ যদি এই পথে আন্টার্কটিকা যায় তাহলে গাইড হিসেবে এই ডায়েরিটা কাজে লাগতে পারে।

আর্জেন্টিনা বিরাট একটি দেশ। এখানকার ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা সে সব, কিছুই আমার এই ডায়েরিতে পাওয়া যাবে না। আমি কয়েক বছর আগে এখানকার ইগুয়াচ্ছু (Iguacchu) জলপ্রপাত দেখতে আসার সময় এ দেশে সম্পর্কে বিশদ্ লিখেছি। ইগুয়াচ্ছু জলপ্রপাত পৃথিবীর তিনটি প্রধান জলপ্রপাতের মধ্যে একটি। তিনটি জলপ্রপাত : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডার নায়াগ্রা, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া আর এখানকার ইগুয়াচ্ছু। পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর আর পশ্চিমে করদিয়েরা দেস্ আন্দেস্ পর্বত প্রাচীর দ্বারা দেশটি সুরক্ষিত। আর্জেন্টিনা একটি বিরাট দেশ। জলবায়ু ভৌগোলিক টোপোগ্রাফি আর বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সুন্দর একটি রাজধানী। এই উন্নতির মূলে রয়েছে এখানকার বন্দর রিও দ্য লা প্লাতা (Rio De La Plata)। এই বন্দর যখন ইউরোপিয়ানরা আবিষ্কার করল তখন থেকেই শুরু হয়েছে অঞ্চলের পরিবর্তন।

১৫৩৬ সালে পেদ্রো দ্য মেন্দোসা (Pedro De Mendosa) প্রথম চেষ্টা করেন দেশটিকে আধুনিক করার। কিন্তু তার প্রচেষ্টা খুব বেশি এগুতো পারেনি। ইউরোপীয় কায়দায় সাজাতে হলে চাই ইউরোপীয় সহযোগিতা। দূরত্বই ছিল প্রধান বাধা। পরে ১৫৮০ সালে জুয়ান দ্য কারে (Juan de Caray) শহরকে আধুনিক করার জন্য পেদ্রো মেন্দোসার পরিকল্পনার ওপর জোর দেয়। তারপর হঠাৎ ১৭৪০ সালে বুয়েনোস এয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্নতির পথে। এর মূল কারণ বন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য এই বন্দর খুলে দিল তার দ্বার। বন্দর গড়ে উঠল ইউরোপীয়ান শক্তির সহায়তায়। তারপর থেকেই শুরু হল এর উন্নতি। প্রগতি আজও অব্যাহত।

বুয়েনোস এয়ার নামটি আসলে বিরাট একটি নামের অপভ্রংশ মাত্র। আসল নাম, নুয়ে স্ত্রা সিনিওরা দ্য সান্তা মারিয়া দেল বুয়েনো আইর (Nuestra Seniora De Santa Maria Del Buenoaire)। বুয়োনোস এয়ারকে বলা হয় Port De Extreme Europe অর্থাৎ একস্ট্রিম ইউরোপের দরজা।

আর্জেন্টিনার কালচারাল ব্যাকগ্রাউণ্ড এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। বিশেষ করে উত্তর আর্জেন্টিনার প্রাচীন ইন্কা সভ্যতার সাথে স্প্যানিস ক্রিশ্চান ধর্মের এক মিলনে সৃষ্টি

হয়েছে এক আশ্চর্য পরিবেশ। পুনা (Puna) অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় দেখেছি ইন্‌কা ধ্বংসস্তূপের পাশে সাদা মিশনারীদের গীর্জা। আর গ্রামবাসীদের জীবনেও সেই সংমিশ্রণ ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতো আর্জেন্টিনার আদিবাসীরাও স্প্যানিসদের অমানুষিক অত্যাচার ধ্বংস আর লুঠতরাজের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ইতিহাসের সেই কলঙ্ক অধ্যায়ের নমুনা আজও পাওয়া যায়।

আমি অবশ্য সেই সব বিষয়ে আমার ডায়েরিতে কিছু লিখব না। কারণ তা লিখতে গেলে আমার আন্টার্কটিকা সফর বাদ দিতে হবে। যতটুকু না লিখলে নয় ততটুকুই লিখলাম মাত্র। বুয়েনোস এয়ারে হোসে ও ফেরনাণ্ডার আতিথেয়তায় আমার হোটেলের খরচ বেচে গেল তবে বাইরে রেস্ট্রোরেন্টে আমিই বিল মেটালাম। তাতে আমাদের বন্ধুত্বের ভারসাম্য বজায় রইল। কৃতজ্ঞতা জানালাম সকলকে। তিন দিন চার রাত্রি থাকার পর আমাকে আবার হোসে এয়ারপোর্টে পৌছে দিল।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৯৮ সকাল ৯টা : প্লেন ছাড়ল। জানলা দিয়ে বুয়োনোস এয়ারকে বিদায় জানালাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহরের দৃশ্য উধাও হয়ে তার বদলে দেখা দিল আটলান্টিক মহাসাগরের সীমাহীন জলভাগ।

লা পাতাগনী (La Patagonie) (চলতি ভাষায় পাতাগনিয়া) :

আর্জেন্টিনার দক্ষিণের প্রদেশ। এই প্রদেশের নাম পাতাগনী। পাতাগনীর পশ্চিমে চিলি ও করদিয়ের দেস্ আন্দের উচ্চ পর্বতশ্রেণী। বিরাট পাচিলের মত এই পাহাড়টা পাতাগনীকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বিভক্ত করে রেখেছে। পাহাড়ের উচ্চাংশ চিলির অধীনে। প্লেনের ডানদিকের জানলা থেকে দেখলাম চিরতুষারাবৃত পাহাড়ি সৌন্দর্য। পাশের ভদ্রলোক আমার উৎসাহ দেখে বললেন এই পাহাড়গুলোর মধ্যে আপনি পাবেন কতগুলো নামকরা শৃঙ্গ, যেমন টোরেস্ ডেল পেইন (Torres Del Paine), সেরো টোরেস্ (Cerro Torres) আর পর্বতারোহীদের স্বপ্নের মাউন্ট ফিট্‌স্‌রয় (Mont Fitzroy)। এয়ারপোর্টের ফরমালিটি সেরে যখন বাইরে দাঁড়ালাম তখন ঘড়িতে দেখি সাড়ে এগারোটা। এয়ারপোর্টের নাম ত্রেলো (Trelew)। এয়ারপোর্টে হোটেলের বাস দাঁড়িয়েছিল। বাসের গায়ে লেখা হোটেল পুয়ের্তো মাদ্রীন (Hotel Puerto Madryn)। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা রাস্তা। বাসে আমরা এগারোজন। হোটেল পুয়ের্তো মাদ্রীন আমাদের ভালভাবেই রিসিভ্ করল। পাতাগনীর মূল আকর্ষণ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। উত্তর আর্জেন্টিনা থেকে এই অংশকে বিভক্ত করেছে এখানকার নদী ল্য রিও নেগ্রো (Le Rio Negro)। নেগ্রো, শুরু হয়েছে করদিয়েরা পাহাড় থেকে আর্জেন্টিনার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পড়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে।

হোটেলে পরিচিত হলাম এক ফরাসী দম্পতির সাথে। তারা পাঁচ মাসের জন্য আমেরিকা কন্টিনেন্ট ঘুড়তে বেড়িয়েছেন। উত্তরের সান্ অন্টেনিও দ্য আরেকো ও

বুয়েনোস আইরেসের দক্ষিণে পিগে (Pigue) অঞ্চলের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় পঞ্চমুখ। তাদের মতে আর্জেন্টিনার তিনটে জিনিস—পাম্‌পা, গাউচো ও ট্যাংগা (Pampa, Gaucho, Tango)। পাম্‌পা হচ্ছে বিরাট তৃণভূমি। গরু ও ঘোড়া চারণক্ষেত্র। পাম্‌পার শয়ে শয়ে কিলোমিটার ধুধু করছে শুধু ঘাস ভরা। আর্জেন্টিনার গরুর মাংস খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি নাকি পুষ্টিকর। হাজার হাজার গরু চড়াবার জন্য রয়েছে ঘোড়ায় চড়া কাউবয়ের দল। আমেরিকার ওয়েস্টর্ন ফিল্‌মের মত এই কাউবয়দের পোষাক-আশাক। তাদেরই বলে গাউচো। এই গাউচোদের জীবনযাত্রা প্রাচীন ইউরোপের মতই। এরা অধিকাংশই স্প্যানিস অরিজিন অথবা স্থানীয় মেট্রিস ইণ্ডিয়ান। শুধু আর্জেন্টিনাই নয় এই আমেরিকা কন্টিনেন্টে প্রথম যখন ইউরোপীয়ানরা এসেছিল তখন তারা ছিল কাউ বয়দের মতই।

প্রতি বছর দশই নভেম্বর সান আন্তেনিও দ্য আরেকোয় এই গাউচোদের (10th November, San Antonio De Areco, Gauchos) বিরাট মেলা বসে। এই মেলাতে সমস্ত আর্জেন্টিনা থেকে কয়েক হাজার গাউচোর সমাবেশ হয়। প্রত্যেকে আসে ঘোড়ায় চড়ে। এই সমাবেশে যোগদান করার জন্য, অনেকে দশ-বারো দিন এমন কি পনেরো দিন ধরে ঘোড়ায় চড়ে আসে। এই বিরাট সমাবেশ সত্যি দেখবার জিনিস। তাদের মিউজিক আর স্যাঁকা মাংসের গন্ধ এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই ফরাসী দম্পতির কাছ থেকে জানলাম আর্জেন্টিনার আর এক দিক। পাম্‌পা অঞ্চলে হাজার হাজার ভেড়া, গরু ও ঘোড়ার চারণভূমি। আর যারা তাদের তদারক করছে ঘোড়ায় চড়া এক সম্প্রদায় যাদের পেশাই হচ্ছে গবাদি পশুপালন, তাদেরই বলে গাউচো। আমরা যারা দূরে থাকি তারা আর্জেন্টিনার ফুটবল টীম ও ট্যাংগো ড্যান্সের সঙ্গে পরিচিত। আর তার সঙ্গে যোগ গাউচো।

হোটেলের রিসেপ্‌সন ডেস্কেই সব ইনফরমেশন পেলাম। ফরাসী দম্পতি মিশেল ও আলিস্ আমার সাথে যোগ দিল। আমরা ড্রাইভার সমেত একটা ফোর হুইল ড্রাইভ ভাড়া করলাম শেয়ারে, খরচ বাঁচল। হাফ্ ডে ছ'ডলার (6 US.$) আর তেল আলাদা। খাওয়া দাওয়া সেরে ২টোর সময় বেড়িয়ে পড়লাম। আমাদের উদ্দেশ্য ভালদেস্ পেনিনসুলা (Valdes Peninsula) ভ্রমণ। ভালদেস্ ন্যাচারাল প্রটেক্টেড এরিয়া। অনেকটা সুন্দরবন এলাকার মত জলাভূমি। রাস্তা জানা না থাকলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই অঞ্চলের টুরিস্ট ম্যাপ পাওয়া গেল না। উচু-নীচু উপত্যকা মাঝে মাঝে কেয়া গাছের বন আর অসংখ্য কাশ ফুল। রাস্তায় চলতে চলতেই চোখে পরল প্রচুর বনখরগোশ। খড়গোশের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে সরকার শিকারের পারমিশন দেয়। এখানকার অধিবাসীরা সেই সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকে। আমরা সাড়ে তিনটের সময় সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলাম। একটা পাহাড়ি এলাকা বেছে নিয়ে জীপ দাঁড়াল। সামনে অনন্ত বিস্তৃত আটলান্টিক। সমুদ্রের তীর ঘেষা বিরাট লাইন জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে। তারপর চোখে সেই দৃশ্য সহ্য হয়ে গেলেই ভুল ভাঙল। আসলে সমুদ্রের তীরঘেষা

জলে ভেসে রয়েছে অসংখ্য পাখী, শয়ে শয়ে নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। সামুদ্রিক এই পাখিগুলো এখানে স্থায়ীভাবে বছরের পর বছর থাকে। তাদের ভাসমান বিষ্ঠায় তৈরি হয়েছে সাদা ভেলার মত স্তর। দ্বীপের মত সেই ভাসমান বিষ্ঠার (মল) ওপরই পাখিগুলো তাদের স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলেছে। এই ধরনের পাখিগুলোকে বলা হয় নান্দু (Nandou)। এখানে আর এক ধরনের সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক নজরে পড়ল তাদের নাম গুয়ানাকোস (Guanacos)। গুয়ানাকোস ও নান্দু অনেকটা বক ও মুয়েতের (Muette) মত দেখতে অর্থাৎ সারসপাখি ধরনের। ভালডেসের বুনো এলাকা ঘুরে আমরা একটা ফরেস্ট বাংলোতে কফি খেলাম, হোটেলে ফিরলাম সাতটা নাগাদ।

পরের দিন ভোরবেলা উঠে আমি শহরটা ঘুড়তে বেরোলাম। ছোট্ট শহর স্প্যানিস কলোনিয়াল ধরনের বাড়িঘর। ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট রেঞ্জ রেস্তোরা। প্রচুর সুভ্যেনির ষ্টল। সবচেয়ে ভাল লাগে এখানকার খেতিবাড়িগুলো। দক্ষিণ ফ্রান্সের কামার্গ অঞ্চলের মত। শহরটা ছোট্ট হলেও গাড়ীর অভাব নেই। প্রচুর জীপের আড্ডা, সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়। আমি হোটেলে ফিরলাম ব্রেক্ ফাস্টের জন্য। কফি, পাউরুটি, জ্যাম আর ফল দিয়ে সুন্দর আহার হল। তারপর দিক আটটায় বেড়িয়ে পড়লাম। হোটেলরই ব্যবস্থাপনা। মিনিবাসে আমরা বারোজন। উদ্দেশ্য পুন্তা তুম্বো (Punta Tumbo)। যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও ভারতীয় নাগরিক। সারাদিনের প্রোগ্রাম।

রাস্তায় একবার থেমে এগারোটায় এসে পৌঁছলাম পুন্তা তুম্বো। বাস থামতেই চারদিক থেকে মনে হল শয়ে শয়ে খুদে মানুষগুলো আমাদের ঘিরে ফেলেছে। অনেকটা গ্যালিভারের গল্পের মত। ভারী মজার। নেমে দেখি এরা খুদে মানুষ নয় মাঞ্চো (Mancho) বা পেংগুইন। দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় পেংগুইন রিজার্ভ। শুরু হল পেংগুইনদের সাথে ছেলেখেলা। রিজার্ভের রেস্ট্রোরেন্টেই ভাল খাবার ব্যবস্থা। স্থানীয় লোকেদের সুন্দর ব্যবহার আমাদের আপন করে তুলল।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৯৮ : উশুয়াইয়া। সকাল ১০টা। ত্রেলো (Trelew) থেকে উশুয়াইয়া প্লেনে লাগল মাত্র একঘণ্টা। ত্রেলোতে দু'রাত্রি দু'দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝলাম না। আমার প্লেনের টিকিটের বন্দোবস্ত করেচে সুইস্ টুরিং ক্লাব আর হোটেলের বন্দোবস্ত করেছে জেরিকান এক্সপেডিশন (Jerrycan's Expedition)। বুয়েনোস এয়ারে ছিলাম হোসের সাথে। এ পর্যন্ত সবই সুন্দরভাবে প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয়েছে। উশুয়াইয়াতে চারদিনের জন্য হোটেল বুক করা আছে, প্রয়োজনে বাড়ানো যাবে। এয়ারপোর্ট থেকেই নীচের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ল।

বিগ্‌ল ক্যানেলের ধারে একটি সুন্দর গ্রাম্য শহর। ছোট ছোট বাড়িঘর। একনজরে দেখলে মনে হবে একটা বর্ধিষ্ণু মাছ ধরার জেটি। বিগ্‌ল ক্যানেলের (Beagle) স্বচ্ছ জল আর পাহাড়ি দৃশ্য। আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে হোটেল ডেল গ্লাসিয়ারে (Hotel Del Glaciar)। বেড এ্যান্ড ব্রেক্ফাস্ট ১২০ ডলার। হোটেলটি সুন্দর,

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। রিসেপ্সনিস্টের ব্যবহারও খুব ভাল। প্রাকৃতিক দৃশ্যও নয়নাভিরাম। শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে। একতলার একটি সুসজ্জিত ঘর। জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে বিগ্‌ল ক্যানেলের সুন্দর দৃশ্য। হোটেলটি ফাইভ স্টার না হলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই পরে। হোটেলটি শহরের উত্তরে। পাহাড়ি এলাকা। রিসেপ্সনিস্ট আমাকে পরামর্শ দিল এখান থেকে ন্যাশনাল গ্লেসিয়ার পার্ক কাছেই হবে। এখান থেকে ট্যাক্সি যাবে চেয়ার লিফ্‌ট (Chair Lift) পর্যন্ত। সেখান থেকে গ্লেসিয়ার বেসের সুন্দর দৃশ্য। আমি তার কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। রেস্ট্রোরেন্ট থেকে সামান্য কিছু খেয়েই বেড়িয়ে পড়লাম। হোটেলেরই কার এখন মাত্র দুটো। ড্রাইভারকে দেখেই চিনলাম এয়ারপোর্ট থেকে এই গাড়িতেই এসেছি। কথায় কথায় ড্রাইভার জানাল যে সিটি থেকে গ্লেসিয়ার দেখার জন্য বাসের বন্দোবস্ত আছে। যাতায়াত মাত্র ৫ ডলার। কিন্তু সময়ের ঠিক নেই। ট্যাক্সিতেই সুবিধা, মাত্র কুড়ি ডলার। যাবার পথেই পাহাড় থেকে দেখতে লাগলাম উশুয়াইয়ার সুন্দর দৃশ্য। মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছলাম চেয়ার লিফটের কাছে। সেখান থেকে এক ডলারের টিকিট কিনে উঠলাম অবজারভেটরীতে। হঠাৎ চোখের সামনে সুন্দর ভয়াবহ প্রকৃতি দেবীর এক অপরূপ লীলাময়ী দৃশ্য ভেসে উঠল। একটা বিরাট নদীর জলকে মন্ত্রবলে যেন বরফে পরিণত করা হয়েছে। গ্লেসিয়ারের শেষে ঠাসা জমাট বরফগুলো লম্বালম্বিভাবে কেটে গিয়ে বিরাট বিরাট সবুজ স্তম্ভের সৃষ্টি করেছে। এই দৃশ্য শুধু দেখাই যায় ঠিক মত বর্ণনা করা যায় না। উশুয়াইয়া শহরের নাম। এই এলাকার নাম টিয়েরা ডেল ফুয়েগো (Tierra Del Fuego)। Fuego মানে আগুন। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে "অগ্নিস্থান"। আমরা গ্লেসিয়ারের আরও উঁচুতে আছি। এখান থেকে গ্লেসিয়ারের ফাটা স্তম্ভগুলো হাজারো খুদে পর্বতশৃঙ্গের সৃষ্টি করেছে। ঘন সবুজ, নীল আর সবুজ ও নীলের এক মায়াবী খেলায় মত্ত হয়েছেন প্রকৃতিদেবী। অদ্ভুত সুন্দর। উশুয়াইয়ার এটাই মূল আকর্ষণ। সমস্ত এলাকাটাই সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকা। স্থানীয় ভাষায় বলে পার্ক নাসিওনাল টিয়েরা ডেল ফুয়েগো (Parque Nacional Tierra Del Fuego)। আমি অবজারভেটরী থেকে নীচে এসে মূল পার্কের গেটের সামনে এলাম। আমার ট্যাক্সি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। লোকজনের খুব ভীড় নেই। ড্রাইভারকে নিয়ে পাশের কফি স্টলে এক কাপ করে কফি খেয়ে শরীরটাকে সুস্থ করলাম। এখন জানুয়ারী। এখানকার গরমকাল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এই শেষ অংশ আন্টার্কটিকা পেনিনসুলা প্রায় স্পর্শ করেছে। কাজেই বেশ শীত। আমি আনোরাক্ (Anorac) ও বুট পড়েই ছিলাম। কফি খাওয়ার পর আমরা আর একটি অব্জারভেটরীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ড্রাইভার মেন্দেসা (Mendesa) এবার আমার সঙ্গেই চলল। অবজারভেটরী এখান থেকে প্রায় দেড়ঘণ্টার পথ। টিকিট কাটতে হল ৫ ডলারের। মেন্দেসার টিকিট লাগল না কারণ স্থানীয় লোকদের জন্য ফ্রি।

টিকিটে লেখা আয়েরোসিলা (Aerosilla)। মেন্দেসা বলল যে কয়েকমাস যাবৎ সে ছ'কিলো ওজন বাড়িয়েছে কাজেই মাঝে মাঝে সময় ও সুযোগ পেলে সে হাঁটতে

ভালবাসে, ভালবাসে মানে দেহের জন্যই। মেদ্ ঝরাবার জন্য। এখন গরমকাল। সূর্য্যের আলো প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আজ হাওয়া নেই। হাওয়া থাকলে সাথে সাথেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দক্ষিণের গ্লেসিয়ার ধোয়া হাওয়ায় কান, ঠোঁট, গাল ফেটে যায়। যারা অভ্যস্ত নয় তাদের কাছে অসহ্য তো বটেই। আর শরীরকে এক মুহূর্তে কাহিল করে ছাড়ে। মনে মনে ভাবলাম ভাগ্য তো বটেই। পাহাড়ি পথ ধরে যত এগুতে লাগলাম ততই দৃশ্য পাল্টাতে লাগল। শেষে এসে পৌঁছলাম দ্বিতীয় অবজারভেটরী আয়েরোসিলায়। এখান থেকে বিগ্‌ল চ্যানেলের (Chanel) একটা পুরো ছবি পেলাম। আটলান্টিকের জল টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর ভেতর পাঁচিল কাটার মত করে ঢুকে গিয়েছে। দুধার পরিষ্কার ভাবে প্রাকৃতিক কারণেই মসৃণ দেওয়ালের সৃষ্টি করেছে। তাই এটাকে নদী বা ফিওর্ড না বলে বলা হয়েছে চ্যানেল। গ্লেসিয়ারের দৃশ্য আরও সুন্দরতর হয়েছে। উশুয়াইয়া শহর ও তার পরে মহাসাগর সব দৃশ্যটাই পরিষ্কার ছবির মত। প্লেন থেকে এ দৃশ্য দেখার সুযোগ পাইনি। এখান থেকে এয়ারপোর্টেরও পুরো ছবি পেলাম। এয়ারপোর্টটা সত্যি বেখাপ্পা পজিসনে। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে জল ও দ্বীপের সংমিশ্রণের জন্য ঠিক সমতলভূমির অভাব। দূরে আটলান্টিক মহাসাগর। ওদিকে বন্দর উশুয়াইয়া। দক্ষ পাইলট না হলে এখানে প্লেন নামানো মুশকিল। মেন্দেসা বলল যে এই আন্তর্জাতিক উশুয়াইয়া এয়ারপোর্ট এক বছর হল খুলেছে। আগে বড় প্লেন আসতে পারত না। শুধু আর্জেন্টিনার ডোমেস্টিক ফ্লাইট আসতো অর্থাৎ আয়েরোলিনিয়াস আর্জেন্টিনাস (Aerolineas Argentinas)-এর প্লেনগুলা। আজকাল ভারিগ্ (ব্রাজিল এয়ারলাইন্‌স্), লাডেকো (Ladeco), ভাস্‌প (Vasp) আসছে। নতুন রানওয়ে দুই পয়েন্ট সাত কিলোমিটার (2.7 km) লম্বা। টুরিস্টদের আনার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। দেড় কিলোমিটার, যাতায়াতে আমরা প্রায় তিনঘন্টায় তিন কিলোমিটার হেঁটে ফিরে এলাম ট্যাকসি স্ট্যান্ডে। হোটেলে ফিরলাম প্রায় সাতটার সময়। সময়টা কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝলাম না। হোটেলে ঢুকেই আমি টেলিফোন করলাম। জেনেভায় সবাইকে জানিয়ে দিলাম আমার উশুয়াইয়ার পৌঁছানোর সংবাদ।

হোটেলের ঠিকানা : Hotel Del Glaciar
Glaciar Martial Road
Ushuaia 9410, Argentina
Tel : 090 30636

আর একটা কথা জানিয়ে রাখি। উশুয়াইয়ার নতুন বাড়িগুলো সব রেডিমেড্। আমেরিকা ও নরওয়েতে তৈরি, জাহাজে এসেছে। নতুন বসতি স্থাপনের জন্য সরকার সহজেই পারমিশন দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আগামী দশ পনেরো বছরে উশুয়াইয়া, আন্টার্কটিকা যাবার প্রধান বন্দর হিসেবে তৈরি হচ্ছে। উত্তর আমেরিকা থেকে যে হাইওয়ে সেন্ট্রাল ও সাউথ আমেরিকা হয়ে সরাসরি পৃথিবীর এই শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে তার ইম্পর্টেন্সিও দিন দিন বাড়ছে।

হোটেলের বিভিন্ন লিফ্‌লেটের মধ্যে পেলাম এখানকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে যেমন সোনার লোভে স্প্যানিসরা হত্যা, অত্যাচার আর লুণ্ঠনের কলঙ্কিত অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল—দক্ষিণ আমেরিকার এই নাম না জানা অঞ্চলটাও সেই অত্যাচার থেকে বাদ যায়নি। এখানকার আদিবাসীরাও সেই আদিবাসী নিধন যজ্ঞের বলি হয়েছিল। তবে অসংখ্য দ্বীপ ও কঠিন আবহাওয়ার জন্য অনেকে বেঁচে গেছে। ইউরোপে এই অঞ্চলের কথা প্রথম জানিয়েছিলেন বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ম্যাজেলান। তিনি ইউরোপ থেকে আটলান্টিক পাড় হয়ে এই অঞ্চল দিয়ে সরাসরি এশিয়ার "মশলার দেশে" (ভারত) যাবার সংক্ষিপ্ত জলপথ খুঁজছিলেন। এই অঞ্চলের ডেট্রয়েট দিয়ে তিনি পার হয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার এই স্থলভাগ। তার সেই আবিষ্কৃত জলপথই আজ ডেট্রয়েট অব্ ম্যাজেলান নামে খ্যাত। পর্তুগীজ নাবিক ম্যাজেলানের জন্ম ১৪৮০ সালে। মৃত্যু ফিলিপিনে ১৫২১ সালে। টিয়েরা ডেল্ ফুয়েগোর এই জলপথ দিয়ে তিনি পার হয়েছিলেন ১৫২০ সালে। তার মৃত্যুর বহু বছর পর এই জলপথকে তার নামেই নামাঙ্কৃত করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার এই শেষ অংশ বর্তমানে আর্জেন্টিনা ও চিলি লম্বালম্বিভাবে ভাগ করেছে। কিন্তু সেই সময় এই অংশটা কোন দেশের অন্তর্গত ছিল না। ডেট্রয়েট অফ্ ম্যাজেলান আবিষ্কারের ফলে আটলান্টিক থেকে জলপথে সরসারি প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পৌঁছনো যায়। নাবিকদের আর একটা বিরাট সুবিধা হল এই যে, এই সংক্ষিপ্ত জলপথের জন্য কেপ্ হর্ন হয়ে বিপরীত স্রোত ও বাতাসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। বলাই বাহুল্য যে সেই যুগে সব জাহাজই ছিল পাল তোলা। বাতাস ও সমুদ্র স্রোতের উপর নির্ভর করেই তাদের চলতে হত।

ম্যাজেলান নামটা ইংরেজদের দেওয়া। ফরাসীতে বলে ম্যাজেলাঁ। আসল পর্তুগীজ নাম ফেরনান্দ দ্য মাগেহায়েস্ (Fernand De Magelhaes)। যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয়, সেই সময় এই অঞ্চলের বিশেষ কোন নাম ছিল না অথবা থাকলেও নাবিকদের জানা ছিল না। রাত্রির অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে আগুন ধরিয়ে তার চারপাশে বসে গল্পগুজব নাচ-গান করতো। সেটাই ছিল তাদের সামাজিক রীতি। সারাদিন তারা শিকার করতো আর রাতে আগুনের চারদিকে বসে আহার ও পরে নিদ্রা। নাবিকেরা বহু দূর থেকে সেই আগুন দেখতে পেতো। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে আগুন দেখে তারা প্রথমে ভেবেছিল হয়তো আগ্নেয়গিরি অথবা উষ্ণপ্রস্রবনের আগুন। এই দৃশ্য দেখে তারা এই অঞ্চলের নাম রেখেছিল টিয়েরা ডেল ফুয়েগো অর্থাৎ অগ্নিস্থান। দুর্ভাগ্যের বিষয় তারা আজ আর আগুন জ্বালে না, স্প্যানিসরা সেই সম্প্রদায়কে প্রায় সমূলে উচ্ছেদ করেছে।

সেই আদিবাসী আমেরিণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা ব্রিটিশ মিশনারীদের বিভিন্ন রিপোর্টে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ওনা (Ona), হাউশ (Haush), ইয়াহ্গান (Yahgan) ও আলাকালুফ (Alacaluf)।

১৫২০ সালে এই টিয়েরা ডেল ফুয়েগো অঞ্চলটা ইউরোপীয়ানরা আবিষ্কার করলেও স্প্যানিস বণিক বা রাজ্যলোভী সৈন্যেরা এ অঞ্চলে কোন রকম উপনিবেশ স্থাপন করেনি। তার একশ ত্রিশ বছর পর ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ মিশনারীরা এই অঞ্চলে আসতে শুরু করে। ১৮৪৪ সাল থেকে ফাল্‌ক্‌ল্যান্ডে (Falkland Island) ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস স্থানান্তরিত হয়। ফাল্‌ক্‌ল্যান্ড দ্বীপের রাজধানী শেতল্যান্ড (Shetland) থেকে ব্রিটিশ মিশনারীরা এ অঞ্চলে যাওয়া আসা শুরু করল এবং তারাই শুরু করল আদিবাসীদের ধর্মান্তর প্রথা। ইংল্যান্ড থেকে সেই সময় জাহাজ আসতো সুদূর ফাল্‌ক্‌ল্যান্ড পর্যন্ত। তারপর সেখানে জাহাজ মেরামতি ও নাবিকদের বিশ্রাম করার পর ম্যাজেলান স্ট্রেট হয়ে অথবা ক্যাপ হর্ন হয়ে তারা যেতো ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাশ (California Goldrush)। টিয়েরা ডেল্ ফুয়েগো তাদের যাতায়াতের পথেই পড়ত। সে কারণে ব্রিটিশ মিশনারী ও নাবিকদের চোখ এড়ানো সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ কলোনীয়াল মিশনারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভ্যাগাবন্ড আর রিটায়ার্ড আর্মি মেন। তারাও চাইতো নিত্য নতুন অ্যাডভেঞ্চার। অত্যাচার ও বলপূর্বক ধর্মান্তরের ইতিহাস জানা যায় লুকাস ব্রীজের (Lucas Bridges) লেখা "The Uttermost Part of the Earth" বইয়ে। লুকাস ব্রীজ-এর জন্ম ১৮৭৪ সালে উশুয়াইয়ায়। পিতা ছিলেন মিশনারী। বলাই বাহুল্য যে সে সময় মিশনারীরা ছিল একাধারে নাবিক, সৈনিক, বণিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধি।

১৮৮৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা সরকার রাজ্যের গুরুতর অপরাধী বন্দী ও অবাঞ্ছিত নাগরিকদের এই অঞ্চলে পাঠিয়ে দিত শাস্তি হিসেবে। এখানে তাদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হত অথবা দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হত, নির্ভর করতো তাদের বিচারের ওপর।

১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার উশুয়াইয়ায় সাউথ্ আমেরিকান মিশনারী সোসাইটির পারমানেন্ট আউটপোস্ট স্থাপন করে (South American Missionary Society's First Permanent Outpsot)। কিন্তু তা সত্ত্বেও উশুয়াইয়াকে আর্জেন্টিনা সরকার কেড়ে নিয়েছে। বর্তমানে উশুয়াইয়া আর্জেন্টিনারই দক্ষিণাংশ। আন্টার্কটিকার যে অংশ আর্জেন্টিনা দাবী করে রেখেছে এই উশুয়াইয়া থেকেই তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। উশুয়াইয়া বর্তমানে আন্টার্কটিকা যাবার সবচেয়ে কাছের বন্দর।

১১ই জানুয়ারি ১৯৯৮ : হোটেল গ্লাসিয়ার, উশুয়াইয়া। সকালবেলা আমি ব্রেকফাস্ট-এর জন্য নীচের রেস্ট্রোরেন্টে এসে বসেছি। এমন সময় পাশে এসে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন

—"আপনিই কি মিঃ বিমল দে।"

হ্যাঁ, উত্তর দিয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। ভেবেছিলাম হোটেলেরই কোন কর্মচারী হবে। কিন্তু না, ভদ্রলোক আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—

—আমার নাম ড্যানি, আমি ইয়াটোর ইনফরমেশন অনুযায়ী আপনার সাথে কনট্যাক্ট করতে এসেছি।

—ইয়াটো মানে International Association of Antarctica Tour Operators তাই না?

—হ্যাঁ ঠিক।

—আমি তো জানি তার হেড্ কোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে। এখানে যে অফিস আছে জানতাম না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। IATO'র হেড কোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে। কিন্তু সব রকম ইনফরমেশন তারা তাদের মেম্বারদের ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দেয়। আমিও মেম্বর হিসেবে সেই ফ্যাক্স পেয়েছি। তারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে।

—আচ্ছা, বুঝলাম ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বুঝলাম এর পেছনে ব্রায়ান-এর (Capt. Bryan Shoemaker, U.S. Navy) হাত রয়েছে। সে আমেরিকান পোলার সোসাইটির সেক্রেটারি।

যাইহোক, ড্যানিকে (Dany) পাশে বসালাম। ইতিমধ্যে আমার ব্রেকফাস্ট এল। ড্যানির জন্য কফির অর্ডার দিলাম। ড্যানিকে পেয়ে সুবিধাই হল। আমরা শুরু করলাম গুরত্বপূর্ণ আলোচনা। ড্যানি "তারাসোভা" জাহাজের গাইড। ওর কাজ আন্টার্কটিকের বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করা আর উশুয়াইয়ায় বিভিন্ন এক্সপেডিশন গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করা। ড্যানির সঙ্গে চা-কফি খেতে খেতে আলোচনা করতে লাগলাম। তারপর আমরা দুজনেই বেড়িয়ে পড়লাম শহরের দিকে। ড্যানির গাড়িতেই এলাম।

গাড়িতে যেতে যেতেই দেখলাম যে উশুয়াইয়া শহরটিকে পরিষ্কার তিনভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরের পাহাড়ি এলাকা যেখানে আমাদের গ্লেসিয়ার হোটেল, ন্যাশনাল পার্ক, তারপর প্রায় সমতলে শহরের কেন্দ্রস্থল। আর দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দর এলাকা ও এয়ারপোর্ট। ছোট শহর কিন্তু পরিষ্কার সাজানো গোছানো। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটা আর্জেন্টিনার অংশ হলেও এখানে পেসো বা আর্জেন্টিনার পয়সা প্রায় অচল। কেনা-বেচা হচ্ছে সবই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে। আন্টার্কটিকা ভ্রমণ ও অভিযানই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। প্রচুর হোটেল, ফাইভ্ স্টার থেকে আরম্ভ করে ছোট ইউথ হোস্টেল পর্যন্ত সবই আছে। তবে ড্যানি বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল "এখানকার ছোট বড় সব হোটেলগুলোই ভর্তি। আগে থেকে রিজার্ভেশন না করে আসা উচিৎ।" গাড়িটাকে পার্ক করে আমরা প্রথমে এলাম টুরিস্ট অফিসে। মিউনিসিপ্যালিটির টুরিস্ট অফিস বা মিউনিসিপ্যাল ডিরেকসন দ্য টুরিজ্মা (The municipal Direccion de Turisma, 660 Avenue San Martin, Tel. : 90 32000)। সেখানে গিয়ে নাম ঠিকানা, পাশপোর্ট নাম্বার, রিফেরান্স ঠিকানা সব রেজিস্ট্রি করতে হল। কারণ ভবিষ্যতে নিখোঁজ হলে এই ইনফরমেশনগুলো কাজে লাগবে। টুরিস্ট অফিসের সবাইই অতি ভদ্র ও বিনয়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত টুরিস্ট ডকুমেন্টের একান্তই অভাব।

আন্টার্কটিকা যাত্রীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা আর স্থানীয় হোটেল বুক করাই তাদের প্রধান কাজ। অবশ্য বেচার জন্য কিছু স্যুভেনিরও রয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির ফরমালিটি সেরে আমরা বসলাম একটা কফি হাউসে। এবার আমাদের মূল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

উশুয়াইয়া থেকে আন্টার্কটিকা যাতায়াতের ব্যবস্থা :

ড্যান প্রথমেই প্রস্তাব দিল ওর জাহাজে যাতায়াত করার জন্য। অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করার আগে ও আমাকে অনুরোধ করল ওর জাহাজ পরিদর্শন করার। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করল—

—ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিসে তোমার পাশপোর্ট ও ন্যাশনালিটি দেখলাম ইণ্ডিয়ান।

—আমি হেসে জবাব দিলাম "কেন আমাকে দেখে কি ইণ্ডিয়ান মনে হচ্ছে না—তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু আমেরিণ্ডিয়ান নই। আমি খাঁটি ভারতীয়। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান।"

—আমি ভেবেছিলাম সুইজারল্যাণ্ডের।

—না, আমি সুইস নই। জেনেভা থেকে আমি নর্থপোল ও সাউথ পোলের যাবার সব ব্যবস্থা করেছি। জেনেভা সুইজারল্যাণ্ডেরই একটি শহর। জেনেভা থেকে পৃথিবীর সব জায়গায় যাতায়াতের সব রকম সুযোগ সুবিধা আছে আর অনুসন্ধান করারও সুবিধা।

—আচ্ছা তাই! কারণ আমরা শুনেছি তুমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে আসছ, কাজেই সুইস্।

আমি ড্যানের দিকে তাকিয়ে বললাম

—তোমাকে নিরাশ করলাম, সত্যি আমি দুঃখিত।

ড্যান আমাকে আশ্বস্ত করে বলল

—আমি এই প্রথম একজন খাটি ভারতীয়র সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। তোমাকে ধন্যবাদ।

আমরা সমুদ্রের ধার ধরে এগুতে লাগলাম। রাস্তাটা বেশ চওড়া—এভেন্যু মালভিনা আর্জেন্টিনা (Av. Malvina Argentina) আধঘন্টা হাঁটার পর আমরা মেইন টুরিস্ট ডিপার্চার পয়েন্ট (Main Tourist Departure Point) পৌঁছলাম। এটাই উশুয়াইয়া বন্দর। দূরে দশ-বারোটা ইয়ট্ আর একটা জাহাজ। বাঁ দিকে কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ী। আরও একটু এগুতেই নজরে পড়ল একটা বিরাট নোটিশ বোর্ড তাতে লেখা রয়েছে কোন কোন বোট এখন বন্দরে আছে। ড্যান সেদিকে তাকিয়ে আমাকে বলল—দেখ এখন আলা তারাসোভা ছাড়া আর কোন জাহাজ বন্দরে নেই। সবাই বেড়িয়ে পড়েছে হয় এক্সকারসনে অথবা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে। অক্টোবর মাস থেকেই এখানে বসন্ত (Spring) আরম্ভ হয়। আন্টার্কটিক সমুদ্রের বরফের চাই ভাঙতে শুরু হয় আইস্ ব্রেকার চলতে পারে। চল ভিজিট করা যাক।

সত্যি কথা বন্দরে একটা জাহাজই আছে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠলাম। জাহাজের দু'জন নাবিক আমাদের স্বাগতম জানাল। জাহাজের গায়ে বিরাট করে লেখা Alla Tarasova। আমরা ডেকে উঠলাম, লোয়ার ডেক্, মেইন ডেক, আপার ডেক। পরিপাটি করে সাজানো। ঠিক যেন সম্ভ্রান্ত বীচ্ গার্ডেন। ড্যান কেবিনগুলো খুলে দেখাতে লাগল। অধিকাংশই ডবল্ বেড্ আর কয়েকটা চার বেড্ ও তিন বেডের কেবিনও রয়েছে। ড্যানের মতে এই জাহাজটা খুবই ভাল। কমফোর্ট ও সিকিউরিটি দুইই আছে। দুদিন আগে ও সেকেন্ড ট্রিপ দিয়ে এল। পাঁচ দিনের বিশ্রাম। তারপর আবার যাবে আন্টার্কটিক পেনিনসুলা। এটা শুধু সাধারণ জাহাজ নয় এটা আইস্ ব্রেকারের কাজও করে। এটা তৈরি হয়েছে ১৯৭৪ সালে, আন্টার্কটিকা অভিযানের জন্য। ১৯৯২ সালে রাশিয়ার একটা আইস্ ব্রেকার কোম্পানি এই জাহাজটাকে আবার নতুন করে মেরামতি করেছে। আন্টার্কটিকা যাবার এই ধরনের সুবন্দোবস্ত খুব কমই পাবে। তাছাড়া এখন জানুয়ারি। সব জাহাজ ফুল বুক।

ড্যানি আমাকে জাহাজ সম্পর্কে আরও তথ্য জানাতে লাগল। আলা তারাসোভা একশ মিটার লম্বা। চওড়ায় ১৬.২২ মিটার। জলের তলায় গভীরতা ৪.৯ মিটার। চলার ওজন ৪,৩৬৪ টন (4,364 tonnes), মেশিন ২×২,৬৪০ হর্স পাওয়ার (2×2,640 hp), গতি ১৩ N.Km (13 N.Km.), নাবিক ৭৫ জন, প্যাসেঞ্জার ৯৪ জন। গত বছরে ৯টা ট্রিপ দিয়েছে। সাতবার কোয়ার্ক এক্সপেডিশন, আর ২ বার GMMS ভাড়া নিয়েছিল। আমি নিজে ন'বার গিয়েছি আন্টার্কটিকা পেনিনসুলায়। এ বছরে দু'বার ঘুরে এলাম। জাহাজটি সত্যিই ওয়েল ইকুইপ্ট—স্বীকার করতেই হবে।

এবার আসল প্রশ্নটা করে ফেললাম।

—রেট কিরকম?

—রেট্, মাথা চুলকে বলল চল অফিসে বসে আলোচনা করা যাবে। তবে আমরা যাচ্ছি আন্টার্কটিকা পেনিনসুলায়। সব ছকে বাঁধা। বারো দিনের ট্যুর। ভাড়া নির্ভর করছে কেবিনের ওপর। চল অফিসে সব বলছি।

আমরা এবার আলবাট্রোস হোটেলে এলাম (Hotel Albatros) ৫০৫, মাইপু এভেন্যু। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নজর পড়ল আন্টার্কটিকা অফিস (Oficina Antarctica)। তারই পাশে লেখা আর একটা অফিস "Quark Expeditions"। অফিস না বলে বলা ভাল একটা স্টল। ভেতরে ঢুকতেই খাতির করে আমাকে বসাল। অফিসে একজনই ছিল। ড্যানের কাছ থেকে আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রি বুক বার করে ভদ্রলোক বলল—হ্যাঁ, বিমল দে জেনেভা। আমি তাকে শুদ্ধ করে দিয়ে বললাম বিমল দে অফ্ ইণ্ডিয়া। ভদ্রলোক খাতায় শুদ্ধ করে লিখলেন।

১৪ই জানুয়ারি সকাল দশটায় জাহাজ ছাড়বে। আপনার নামে রিজার্ভ করা হয়েছে মেইন ডেকে দু বেডের কেবিন। মন্ডোরাম ট্রাভেলিং এজেন্সি আপনার নাম বুক করেছে। আপনি একা এবং প্রফেশনাল ট্রাভেলার হিসেবে কমিশন পাচ্ছেন। সব

বাদ দিয়ে টোটাল দাঁড়াল—চার হাজার দশ ডলার (4010 US $)। চার হাজার দশ ডলারে কভার হচ্ছে। উশুয়াইয়ায় এক রাত্রি বেড অ্যান্ড ব্রেক্‌ফাস্ট (হোটেলে)।

জাহাজে থাকাকালীন খাওয়া ও থাকার সম্পূর্ণ খরচ অর্থাৎ কেবিন, স্নান করার বন্দোবস্ত সমেত, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার এবং দুটো ড্রিংক। টি কফি স্ন্যাক্‌, টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স ওপেন বার, গাইড ও বৈজ্ঞানিকদের রানিং কমেন্ট্রি এবং পোর্ট ট্যাক্স সমেত।

ইন্‌স্যুরেন্স খরচ এর মধ্যে ধরা নেই তার জন্য আপনাকে দিতে হবে ষাট ডলার। তার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম। উশুয়াইয়া থেকে দশবারো দিনের আন্টার্কটিকা সফরের খরচ ধরে রেখেছিলাম আট হাজারের মত।

আমি বিকেলবেলা চেক দেবো বলে ধন্যবাদ দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। তারপর ঢুকলাম পাশের আন্টার্কটিকা অফিসে। অবাক হয়ে গেলাম ওদের অতি সুন্দর ও আপনকরা ব্যবহার দেখে। সরকারি অফিসে এই ধরনের আন্তরিকতা সত্যি দুর্লভ।

আমার পরিচয় দিতেই তারা সঙ্গে সঙ্গে উশুয়াইয়ার বন্দর থেকে আন্টার্কটিকা যাবার চার্ট বের করে বলতে লাগলেন যে এর মধ্যে চোদ্দটা গ্রুপ আন্টার্কটিকা পাড়ি দিয়েছে তার মধ্যে আটটা গ্রুপ প্রাইভেট আর ছটি সরকারি।

—চৌদ্দই জানুয়ারি অর্থাৎ দুদিন পর কোয়ার্ক এক্সপেডিশন (Quark Expedtion)-এর পরিচালনায় আর একটা গ্রুপ যাবে আন্টার্কটিকা পেনিনসুলায়। তাছাড়া অন্য কোন অ্যানাউন্সমেন্ট হাতে আসেনি।

প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন

—আপনার কি সরকারি অভিযান বা বেসরকারি?

—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অভিযান নয় ভ্রমণ, আমি জবাব দিলাম।

ভদ্রলোক একটু হেসে জবাব দিলেন

—আন্টার্কটিকায় যারা যায় তার সবাইই এক্সপ্লোরার।

—আমি আলা তারাসোভার জাহাজে কেবিন রিজার্ভ করেছি।

—খুব ভাল! খুব ভাল! কোয়ার্ক এক্সপেডিশন অর্গানাইজার, রাশিয়ান জাহাজে, খুব ভাল ব্যবস্থা।

—তাছাড়া সপ্তাহখানেকের মধ্যে আর কোন জাহাজ যাবে না। ভদ্রলোক লিস্ট দেখে বললেন—আপনি এক্সপ্লোরার শিপিং-এ খোঁজ নিতে পারেন। ওরা ২রা ফ্রেব্রুয়ারী আবার যাবে। আর তাছাড়া মেরিন এক্সপেডিশন (Marine Expedition)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওরা প্রোগ্রাম ছাড়াও ইন্‌ডিভিজুয়াল এ্যারেঞ্জমেন্ট করে। ভদ্রলোক আমার হাতে দুটো নম্বর দিয়ে বললেন টেলিফোন করে দেখুন—Explorer Shipping , Tel. : 800 323, 7308, Marine Expeditons, Tel. : 800 263, 9147

ভদ্রলোক আরও বললেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সরকারি ও

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আন্টার্কটিকা যাবার ব্যবস্থা করে। তাদের সংস্থা বা প্রতিনিধি সবাই এখানে নেই। এটা শুধু বন্দর ডিপার্চার পয়েন্ট। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যান্ডের আন্টার্কটিকা এক্সপ্লোরার অর্গানাইজাররা উশুয়াইয়াতে আসে না। ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্থাগুলো উশুয়াইয়া হয়েই যায়। কোয়ার্ক এক্সপেডিশন গ্রুপ আমেরিকান অর্গানাইজার। জাহাজ রাশিয়ান। তারা সরাসরি বিভিন্ন ট্রাভেলিং এজেন্সির মাধ্যমে প্যাসেঞ্জার ধরে। রাশিয়ান হলেও অত্যধিক খরচের জন্য মস্কো বা সেন্ট পিটারস্‌বুর্গ থেকে কোন যাত্রী আসে না।

আমি একবছর যাবৎ আন্টার্কটিকা যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। গত সেপ্টেম্বর মাসে (৯৭) ভূ-মধ্যসাগরে কাতামারা নিয়ে ঘুরে এলাম স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে। একমাস আগে ঘুড়ে এলাম সাইবেরিয়া। আল্পসের থেকে ওয়াকিং স্কি ও শ্বাসপ্রশ্বাস কন্ট্রোল করার কৌশল শিখলাম। আর বিশেষ প্রয়োজনে আমার সখা হিসেবে আছে বিভিন্ন আসন ও প্রাণায়াম। উশুয়াইয়াতে এসে দেখছি ওই সব প্রস্তুতির সত্যি প্রয়োজন ছিল না। আমার বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আসলে বিভিন্ন অভিযাত্রী ও প্রেস মিডিয়া আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। সাধারণ ব্যাপারটাকে অসাধারণ করে বিলি করা হয়েছে। বর্তমান জগৎটা এক বিরাট প্রচারের ওপর চলছে। আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা সেই প্রচারের ফাঁদে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কুড়ি বছর আগে আন্টার্কটিক যাবার যে সমস্যাগুলো ছিল আজ সে সমস্যাগুলো আর নেই।

আন্টার্কটিকা সেন্টারের স্ট্যাটিস্‌টিক অনুযায়ী ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দু'বছরে আন্টার্কটিকায় প্রায় (১৮০০০) আঠারো হাজার টুরিস্ট ও অভিযাত্রীর পদক্ষেপ পড়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় আশি ভাগই রাশিয়ান জাহাজে যাতায়াত করেছে। কারণ সবচেয়ে সস্তা, বিপদের ঝুঁকি কম, আরামের সফর, বৈজ্ঞানিকদের সরাসরি সাহচর্য আর তার ওপর রয়েছে জাহাজের অভিজ্ঞ নাবিক ও ক্যাপটেন। তবে সংগঠক আমেরিকান সংস্থা। এই বিশদ্‌ বিবরণ পাওয়ার পর মনে মনে ভাবলাম "আলা তারাসোভা"ই ঠিক। আমার ট্রাভেলিং এজেন্সিকে ধন্যবাদ দিতেই হবে।

দুপুরে হোটেলে না ফিরে আমি শহরেই থেকে গেলাম। সমুদ্রের ধারে একটা জমজমাট রেস্ট্রোরেন্ট দেখে সেখানে ঢুকে পড়লাম। "সেইলারস্‌ কর্ণার", দেখে মনে হল নতুন হয়েছে। ভেতরে ঢুকে বসলাম। আমার সামনেই একজন বিয়ার ও সিগারের ধোঁয়ায় নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। আমার প্রয়োজন কিছু খাওয়ার, কাজেই ভদ্রলোকের দিকে আর তাকালাম না। কিন্তু আমি বসতেই ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন—

—গুড্‌ মর্নিং, স্যার

আমেরিকান ডলারের মতোই ইংরেজিটাও এখানে প্রায় একচেটিয়া।

—গুড্‌ মর্নিং, হেসে উত্তর দিলাম।

বয়কে একটা ভেজিটারিয়ান স্যান্ডউইচ অর্ডার দিলাম। ভদ্রলোক নিজেই উপযাচক হয়ে আলাপ শুরু করলেন,

—কোথায় উঠেছেন।

—হোটেল গ্লেসিয়ারে।

—খুব ভাল, খুব ভাল তবে খুব খরচ। ডাউন টাউনে চলে আসুন। চল্লিশ পঞ্চাশ ডলারে বেড্ অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট পেয়ে যাবেন। তবে হ্যাঁ, আগে থেকে রিজার্ভ না করলে অসুবিধা। কোথায় যাবেন, আন্টার্কটিকা? তা বেশ, তবে নিজের বোট নিয়ে যাবেন না অনেক ঝামেলা। আমি নেভিম্যান ছিলাম। এখন ডকে কাজ করি। আমি সব জানি....

ভদ্রলোক আমাকে উপদেশ দিতে লাগলেন। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি। কিন্তু ঘন ঘন চুরোটের টানে ওনার মুখের সামনে ধোঁয়ার পর্দার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমাকে উঠতে হল। কারণ ভদ্রলোক আমার মুখের ওপরই কথা বলতে বলতে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে টুরিস্ট জেটির (Tourist Jetty) কাছে আবার এলাম। এখানে ছোট ছোট অনেক বোট রয়েছে আশেপাশের সাইট্ সীইং এর জন্য। বোটের ওপরই সাইনবোর্ডে লেখা আছে বিবরণ : ডেস্টিনেশন, ইস্‌লা দ্য ল্‌স লোবোস (Isla De Los Lobos), সি লায়ন দেখার জন্য আড়াই ঘণ্টার সফর। লস্ লোবোস দ্বীপে যাতায়াতের জন্য পার হেড্ চল্লিশ ডলার। বাহিয়া লাপাতাইয়া (Bahia Lapataia), পঁয়তাল্লিশ ডলার। ওটারি বা সমুদ্রিক ভোদর দেখার জন্য সাউদার্ন সী আইল্যান্ড, লোবো মারিনো (Lobo Marino) আইল্যান্ড, ইস্‌লা বা আইল্যান্ড পাহারোস, বিগ্‌ল চ্যানেল, এস্‌টানসিয়া হারবেরতোন (Estancia Harberton) ইত্যাদি দ্বীপগুলোতে একদিন বা এক বেলার মধ্যেই যাতায়াত করা যায়। এস্‌তান্‌সিয়া হারবেরতোন পেংগুইন কলোনীর জন্য বিখ্যাত। সেখানে যাতায়াতের জন্য খরচ ষাট ডলার। বুঝলাম যে আন্টার্কটিকা যাওয়া ছাড়াও উশুয়াইয়ার সংলগ্ন দ্বীপগুলোয় সামুদ্রিক জীবজন্তু দেখার জন্য টুরিস্টরা আসে।

আমি আরও কিছুক্ষণ জেটির এদিক ঘুড়ে তারপর এলাম উশুয়াইয়ার বিখ্যাত "মুরাল" বা উশুয়াইয়ার প্রাচীন "প্রাচীর এলাকায়"। এখানেই আদিবাসী সম্প্রদায়দের মিলন উৎসব হত। তারা বিরাট আগুন জ্বালিয়ে তার চারদিকে নাচ-গান ও আনন্দ উৎসবে মিলিত হত। আজকাল আর সেই প্রাচীন প্রথার কিছু নেই। আছে শুধু একটা পাঁচিল আর একটা প্রস্তরলিপি। এই রাস্তার ওপরই নজরে পড়ল কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা, তিমি মাছ সংরক্ষণ, সীল ও সিন্ধুঘোটক সংরক্ষণ আর গ্রীণপীসের একটা অফিস। হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে এসে পৌঁছলাম।

হোটেলে আর একটা জিনিস নজরে পড়ল। সেটা হচ্ছে, হোটেলের টুরিস্টরা প্রায় সবাইই পঞ্চাশোর্দ্ধে। কৌতুহল দমন করতে না পেরে সরাসরি একজন টুরিস্টকে জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনারা কি কন্‌ডাক্‌টেড ট্যুরে এসেছেন। আপনদের দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশোর্দ্ধে। আমিও কিন্তু আপনাদেরই দলে।

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে একটু এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন—

—"আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি কন্ডাক্‌টেড ট্যুরে আসিনি। আমি একাই।"

ভদ্রলোক তার আমেরিকান অ্যাক্‌সেন্টে আমার সাথে আলাপ শুরু করলেন। নাম মাইক, ইলিনয়ের বাসিন্দা। আশেপাশের আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম যে, অক্টোবর মাসে যুবকেরা আসে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। কিন্তু আন্টার্ক্‌টিকার অধিকাংশ যাত্রীরাই পঞ্চাশোর্দ্ধে। তার দুই কারণ এই বয়সের যাত্রীদের হাতে সময় আছে আর আর্থিক সামর্থও আছে। জগতের ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে সরে এসে তারা খোঁজে শান্ত ও নির্বিঘ্ন মুহূর্ত। হোটেলের ভাষায় এদের বলা হয় সিনিয়র ট্রাভেলারস। উশুয়াইয়াতে টুরিস্টদের হৈচৈ নেই।

১৪ই জানুয়ারি, বুধবার, ১৯৯৮ : সকাল দশটায় বহু প্রতীক্ষিত আলা তারাসোভা জাহাজে উঠলাম। জাহাজের নাবিকেরা সবাইই প্রায় রাশিয়ান। ক্যাপ্টেন সদলে ডেকে দাঁড়িয়ে। নীচে জেটি সংলগ্ন সিঁড়ির কাছে দু'জন মেয়ে আমাদের স্বাগতম জানিয়ে হাসিমুখে উপরে উঠতে বললেন। যাত্রী ছাড়া জেটিতে সী অফ্ করার জন্য বিশেষ কৌতুহলী জনসমাগম হয়নি। ভারত, গ্রীস, তুরস্ক ইত্যাদি জায়গায় যেমন পুলিশ দিয়ে সী অফ্ করতে আসা জনতাকে সামলাতে হয়। পৃথিবীর এই দক্ষিণাংশে ঠিক তার উল্টো। অবশ্য এখানে কেউ কাউকে চেনে না। আমরা সবাই নিজের দেশ থেকে বহুদূরে। একে একে সবাই উঠলে সিঁড়ি তোলা হল। ডেকের চেয়ারে আমরা বসলাম। ক্যাপ্টেন ক্রু সমতে আমাদের স্বাগত জানালেন। ক্যাপ্টেন নিজেই একে একে সকলের নাম, দেশ ঘোষণা করলেন, সকলের মানে যাত্রীদের। তারপর নাবিকেরা আমাদের নেভী সেল্যুট দিয়ে যে যার পোস্টে চলে গেল।

জাহাজ ছাড়ল ঠিক এগারোটা পনেরো মিনিটে। জাহাজের হর্ন বাজার সাথে সাথে মনে আনন্দ শিহরণ দেখা দিল। চোখের সামনে উশুয়াইয়ার ঘরবাড়ি, বন্দর আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। জাহাজ তার নিজস্ব গতি নিল। অধিকাংশ যাত্রীরা একদিন আগে জাহাজের কেবিনে তাদের মালপত্র রেখেছে। আমার মালপত্রগুলো হোটেল থেকে সকালে ড্যান (অনেকে ডাকে ড্যানি বলে) নিয়ে এসেছে। কেবিনে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম ল্যারী ম্যাক্‌ডুগাল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কানাডিয়ান, পেশায় প্রফেসর। জাহাজ ছাড়ার আধঘণ্টা পর মেইন ডেকের হলঘরে সবাইকে আসার জন্য অনুরোধ করা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই হলঘরে এসে বসলাম। ক্যাপ্টেন সবাইকে আবার স্বাগত জানিয়ে এমার্জেন্সি লাইফ সেভিং নিয়মাবলী বলতে লাগলেন এবং দেখাতে লাগলেন, "আপার ডেক্ ও খোলা রেলিং-এর ধারে যাবার আগে সবাইকেই সেফ্‌টি জ্যাকেট অবশ্যই পরতে হবে। আন্টার্কটিকার হঠাৎ হাওয়া অথবা সী সিক্‌নেসের জন্য জাহাজ থেকে সহজেই জলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। রাত্রিতে একা একা ডেকে এলে অবশ্যই যেন হাত খালি থাকে। রেলিং আঁকড়ে ধরে চলাফেরা করতে হবে। জাহাজে ফার্স্ট এইড ও মেডিকেল ইউনিট চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে। অ্যালকহল নিয়ে খোলা ডেকে আসা বারণ। বিশেষ কারণে ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিলে জাহাজের সাইরেন দুবার বাজবে এবং এই

সাইরেন বাজার সাথে সাথে যে যেখানেই থাকুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে সেফ্‌টি জ্যাকেট পড়ে নেবেন। প্রত্যেকটা সেফ্‌টি জ্যাকেটের সাথে অটোমেটিক এয়ার ফিল্ আপ্ (Air Fill Up) করার বন্দোবস্ত আছে। সমুদ্রে পড়ার সাথে সাথে জ্যাকেটে লবন জল লাগলেই অটোমেটিক লাল আলো জ্বলে উঠবে, আর জ্যাকেটের সামনেই আছে হুইসিল। হুইসিল বাজিয়ে রেস্‌কিউ পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে জাহাজের সাইরেন দুবার বাজলেই আপনাদের বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।" এইবার দুবার সাইরেন বাজিয়ে সকলকে শোনাল হল।

ক্যাপ্টেন এবার সবাইকে রিল্যাক্স হতে বললেন এবং হেসে বললেন আমরা এক সম্পূর্ণ অন্য জগতের দিকে এগিয়ে চলেছি। যেখানে বিপদে আপদে সহজে রেস্‌কিউ টিম পাওয়া যাবে না। কাজেই আমাদের প্রতি মুহূর্তে সাবধানে থাকতে হবে। আমাদের টীম অভিজ্ঞ এবং এই পথ আমাদের মুখস্ত কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনারা রিল্যাক্স থাকুন। আন্টার্কটিকা সফর ও অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব আমাদের। আসুন, বার খোলা হয়েছে অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ড্রিংক করুন। প্রথম ড্রিংক ফ্রি অফ্ কস্ট। রাত্রিতে হবে ক্যাপ্টেনের ওয়েলকাম ডিনার।

প্রায় চার ঘন্টা চলার পর আমরা এসে পড়লাম সমুদ্রের মধ্যে। দূরে পড়ে রইল দক্ষিণ আমেরিকার শেষ দক্ষিণাংশ। আমরা এগিয়ে চলেছি ড্রেক্ প্যাসেজের (Drake Passage) দিকে। একদিকে দক্ষিণ আমেরিকার কেপ্ হর্ন (Cape Horn) ও আন্টার্কটিকার সাউথ শেত্‌ল্যান্ড আইল্যান্ড (South Shetland Island), আর অন্যদিকে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থল। ৬০ থেকে ৭০ ডিগ্রী অক্ষাংশ আর ৬০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ এই ড্রেক প্যাসেজ ছুঁয়েছে।

সারাদিন জাহাজে একটার পর একটা কর্মসূচীর মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি সময় কেটে গেল। জাহাজ চলছে ঢেউয়ের তালে। জাহাজের কাফেটারীয়া বা রেস্ট্রোরেন্ট ভালই ব্যবস্থা। জাহাজে অনেকেই ভেজিটারীয়ান। আগে থেকেই সবাইকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে প্রথম দিকে ভাল টাটকা সব্‌জি পাওয়া যাবে শেষের দিকে ডীপ্ ফ্রীজ ফুড্ খেতে হবে। মাছ মাংস প্রথম থেকেই ডীপ্ ফ্রীজ প্রোডাক্ট। আমি প্রচুর পরিমাণে ড্রাই ফুড সঙ্গে এনেছি। তাছাড়া হাল্‌কা কুকিং মেটেরিয়াল সঙ্গেই আছে। জাহাজের খাবার পছন্দ না হলে আমার ক্যাম্পিং গ্যাসের স্টোভ তো রয়েছেই। কেবিনেও প্লাগ পয়েন্ট আছে, হিটার চলবে। জাহাজে অ্যাল্‌কহল নিষেধ নয় তবে রেষ্ট্রিকটেড। জাহাজের ওপন ডেকে অ্যালকহল নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও জাহাজের বার সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা। ফরাসী কায়দায় সাজানো বার। কফি-টি, কোনিয়াক, রেড্ অ্যান্ড হোয়াইট্ ওয়াইন্, হুইস্‌কি, রাম, বোজলে থেকে আরম্ভ করে উজো, সাকো, ক্রোনেন্‌বুর্গ, হেইনিকেন, সেরভেজা, কোরোনা ইত্যাদি প্রায় সব দেশেরই পানীয় পাওয়া যায়। আর তাছাড়া রয়েছে সব রকমের ফ্রুট্ জুস্। অসুস্থ না হলে কেবিন সার্ভিস বা রুম সার্ভিস নেই। প্রধান খাদ্যের মধ্যে স্যুপ্, গাজর, আলু,

শাক্, চিকেন, শুয়ার, গরুর মাংস। মাছ চাইলে পাওয়া যায়। দুঃখর বিষয় যে এই সমুদ্রে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়ালেই নীচে চোখে পড়ে হাজার হাজার মাছের ঝাঁক। মাছের রাজত্বে মাছের অভাব। কি আর করা যাবে, লোকের রুচি অনুযায়ী ব্যবস্থা।

সন্ধ্যে সাতটার সময় রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তারপর কন্‌ফারেন্স হলে ডাক পড়ল জোডিয়াক্ গ্রুপের। Zodiac Group বা এক্সপ্লোরারস (Explorers)। যাত্রীদের মধ্যে যারা সব রকমের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রাবার বোটে বিভিন্ন জায়গায় ল্যান্ডিং করতে আগ্রহী তাদের বলা হয়েছে এক্সপ্লোরার্স। এর জন্য দরকার পূর্ব অভিজ্ঞতা আর ডাক্তারের বিশেষ সুপারিশ। জাহাজের কেবিন রিজার্ভ করার সময়ই তা জানিয়ে দিতে হয়।

আমরা দলে সবশুদ্ধ চল্লিশ জন অর্থাৎ জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক যাত্রীই অভিযানে ইচ্ছুক। আমাদের জন্য একটা জোডিয়াক সব সময়ই প্রস্তুত। জোডিয়াকে মাত্র পনেরো জন ধরবে। কাজেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের ভাগ। জাহাজের ক্যাপ্টেন সবাইকে একসঙ্গে বেড়োতে দেবেন না। ছোট ছোট গ্রুপে মনিটরের সঙ্গে বেড়োতে হবে। তাতে বিপদের ঝুঁকি কম। জাহাজে তিনটে বড় জোডিয়াক্ আছে। সামান্য ব্রিফিং-এর পর আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত হলাম। এর মধ্যে আমরা, আমি বাদে সকলেই কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, ব্রিটিশ, ইটালী, ফ্লান্স, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীর। বয়স সবচেয়ে কম ক্যালিফোর্নিয়ার ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলে আর যার বয়স সবচেয়ে বেশি সে হচ্ছে বাষট্টি বছর বয়সের হল্যান্ডের এক ভদ্রলোক।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করে দেখা গেল যে আমিই সবচেয়ে বেশি ঘুড়েছি। চারবার নর্থপোলার সার্কেল, হিমালয়, আল্পস্, কর্দিয়েরা দেস্ আন্দেস্ ও ফুজি ভ্রমণ করার জন্য সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। আর আন্টার্ক্‌টিকার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইয়টিং (Yachting)-এর সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে টেক্‌নিক্যাল অ্যাডভাইসর হিসেবে নিযুক্ত করা হল। তবে নামে মাত্র। যা বুঝলাম তাতে দেখা গেল আমার বিশেষ কিছু করার নেই। তবে মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তর দিতে হবে। বলাই বাহুল্য যে আন্টার্ক্‌টিকার পথে আমার এই প্রথম ভ্রমণ।

১৫ই জানুয়ারি, বুধবার, ১৯৯৮ সাল : আলা তারাসোভা (Alla Tarasova) আইস ব্রেকার, ১নং কেবিন, মেইন ডেক। ভোর ৭টার সময় আমি উপযুক্ত পোষাক পরে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছি। ভোরের আলো সবে সমুদ্রের পূর্বাকাশকে আলোকিত করেছে। সূর্যোদয় দেখা যায় আরও অনেক পরে কারণ আকাশ মেঘে ঢাকা। ফ্রন্ট ডেকে দাঁড়িয়ে জাহাজের ঢেউ ফাটানো অগ্রসর দেখতে খুব ভাল লাগে। জাহাজের জনমানবহীন ডেক্ আর চারদিকে অনন্ত বিস্তৃত শুধু জল আর জল। মাথার ওপর আকাশ। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে আমি একাই যাত্রী। এগিয়ে চলেছি কোন নাম না জানা দিগন্তের দিকে। জাহাজের ডেকে বেশ ঠাণ্ডা কোন কোন জায়গায় মনে হচ্ছে

হালকা বরফের স্তর পড়েছে। মাথায় কানঢাকা টুপী, হাতে ভারী চামড়ার দস্তানা, পায়ে মুন বুট, প্যান্ট ও জ্যাকেট, মাউন্টেইন জ্যাকেট, মুখের অর্দ্ধেকটা মাফলারে ঢাকা। তা সত্ত্বেও উপযুক্ত নড়াচড়ার অভাবে কোথা দিয়ে যেন শীত ঢুকছে তাই একটু পায়চারী আরম্ভ করলাম। আজ জাহাজের দোলটা আরও বেড়েছে। ঢেউগুলো বিরাট প্রশস্ত। বেশ উঁচু, সামনের দিকে তাকালে মনে হয় জাহাজটা ওপরের দিকে উঠছে আর নামছে। এই অবস্থায় সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে সী-সিকনেস্ দেখা যায়। হঠাৎ আর একজন যাত্রী বেড়িয়ে এল খোলা ডেকে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে হাত তুলে "হ্যালো" জানালাম। পোষাকের জন্য ঠিক মুখটা দেখতে পেলাম না। রেলিং-এর ধারে এসে আমাকে শুধু মর্নিং জানিয়ে ভেতরে আসতে বলল। তার ইশারা অনুযায়ী আমি ভেতরে ঢুকলাম। মাথার টুপী খুলে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলাম। ভদ্রলোক জাহাজেরই একজন ক্রু। আমাকে অনুরোধ করলেন যে একা একা খোলা ডেকে গেলে অবশ্যই যেন লাইফ্ সেফ্‌টি জ্যাকেট পরি। লাইফ জ্যাকেটের উজ্জ্বল অরেঞ্জ কালার সহজেই চোখে পড়ে আর তাছাড়া বাইচান্স নীচে পড়লে সিকিউরিটির দিক থেকে সুবিধা। আমাদের কেবিনে বেডের নীচেই সেফ্‌টি জ্যাকেট রয়েছে। আমি তাকে পরমর্শের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিলাম আর এবার থেকে সেফ্‌টি জ্যাকেট ছাড়া বাইরে বেরোবো না বলে কথা দিলাম। তারপর এলাম ডাইনিং হলে ব্রেকফার্স্টের জন্য। ভদ্রলোক আমার পাশেই বসলেন এক কাপ কফি নিয়ে। পরিচিত হলাম রাশিয়ান নাবিক পেত্রোভস্কির (Petrovoski) সাথে। কথায় কথায় তাকে জানালাম যে এই মাত্র একমাস আগে আমি ঘুড়ে এলাম সাইবেরিয়া থেকে।

—সাইবেরিয়ার কোথায়?

—দক্ষিণে বাইকাল হ্রদ থেকে আরম্ভ করে ইয়েনিসেয়ি নদীর উত্তর প্রান্তে নোরিল্‌স্ক পর্যন্ত।

পেত্রোভ্‌স্কি আমার কথায় খুব উৎসাহিত হয়ে বলল

—আমি সেন্ট পিটার্সবুর্গ-এর লোক। সাইবেরিয়ায় কোনদিন যাইনি। একবার নোভোসিবির্ক্‌স্ (Novosibirisk) যাবার খুব ইচ্ছা।

—আমি ওখানে কয়েকদিন ছিলাম। ওখানাকার আকাডেমি নগর দেখার মত।

আমাদের আলোচনা বেশ গভীরে পৌঁছতে লাগল। দক্ষিণ মেরুতে বসে উত্তর মেরুর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বেশ মজা। কিন্তু আমি সময় নষ্ট না করে জানতে চাইলাম—এই জাহাজের না জানা ইতিহাস।

পেত্রোভ্‌স্কি বিনা দ্বিধায় আমাকে জানাতে লাগল। কম্যুনিস্ট আমলে যে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল আজকের স্বাধীন কম্যুনিস্টমুক্ত রাশিয়ায় সেই সব বাঁধা দূর হয়ে গেছে, কাজেই বিনা দ্বিধায় পেত্রোভ্‌স্কি উৎসাহিত হয়ে শুরু করল :

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রাশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়, রাশিয়া দক্ষিণমেরুর কিয়দংশ হাতে রাখার জন্য এবং পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক

মহলে আন্টার্ক্টিকার ওপর নিজেদের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উত্তর সাইবেরিয়ার তিনটি আইস ব্রেকার দক্ষিণ মেরুতে পাঠায়। তারা নিয়মিতভাবে আন্টার্ক্টিকায় চলাফেরা করত এবং বিশেষ করে আন্টার্কটিকার রাশিয়ান স্টেশন, মোলোঢেজ্নাইয়া (Molodhezhnaya)'র গবেষণাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই আইস্ ব্রেকারগুলো খুব সদাজাগ্রত ছিল, যেমন আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড আইস ব্রেকারগুলো। পেরেস্ট্রয়কার পর বিভক্ত স্বাধীন রাশিয়ার মিলিটারী বাজেট সীমিত হয়ে পড়েছে। আর আন্টার্ক্টিকা ট্রিয়েটী'র জন্য আগের মত সতর্কতারও প্রয়োজন নেই। কাজেই এই আন্টার্ক্টিকার উপযুক্ত সেমি-আইসব্রেকার জাহাজগুলোকে তার নাবিক সমেত রাশিয়ায় ফেরৎ না পাঠিয়ে তাদের ভাড়া দেওয়া হয় পোলার শীপ উইথ্ কোয়ালিফায়েড্ এক্সপেরিয়েন্সড্ ক্রুজ (Pollar Ships with qualified and experienced crues) সমতে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় দক্ষিণমেরু অভিযান, ভ্রমণবিলাসী অভিযাত্রীদের একটা নতুন নেশা। ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে যাওয়া একটা বিরাট খরচের ব্যাপার আর তাছাড়া রয়েছে মাসের পর মাস প্রস্তুতি পর্ব। এই ঝামেলা এড়াবার জন্য এবং অযথা বিপদের ঝুঁকি এড়াবার জন্য আজকাল গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অভিযান সংস্থা। আমাদের এই কোয়ার্ক নিঃসন্দেহে অভিযাত্রী মহলে নাম করেছে।

এই দেখুন না আমরা সামনের বছর (১৯৯৯) ট্যুরিস্ট নিয়ে আসছি সম্পূর্ণ আন্টার্ক্টিকা প্রদক্ষিণ করতে। উশুয়াইয়া থেকে সাউথ শেত্ল্যান্ড, ওয়েডেল সী, রস্ সী হয়ে সম্পূর্ণ আন্টার্ক্টিকা প্রদক্ষিণ করে আবার ফিরে আসা হবে উশুয়াইয়ায়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন রিসার্চ স্টেশনে ঘোরার সুবন্দোবস্ত হয়েছে। জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার তাদের গবেষনাগার পরিদর্শন করার অনুমতি দিয়েছে। হেলিকপ্টারে ও প্লেনে সাউথ্ পোল্ পয়েন্ট যাবারও বন্দোবস্ত হয়েছে।

—কত দিন সময় লাগবে?

—মাত্র ছেষট্টি দিন (66 days)

—সবশুদ্ধ কত নটিক্যাল কিলোমিটার।

—মাত্র ১৯,৩০০ (N. Km.)। পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর মেরু কমলালেবুর মতই। পরিধি সেখানে কম কাজেই কম দূরত্ব।

—কত খরচ মাথা পিছু?

—সেটা নির্ভর করছে আপনার কেবিন অনুযায়ী? যেমন : যদি তিন বেডের শেয়ার কেবিন নেন তাহলে পড়বে ৩০,০০০ ইউ. এস ডলার (30,000 U.S. $)। পারসনাল কেবিন পড়বে ৫৬,০০০ U.S. $ (56,000) আর স্যুট (Suite) পড়বে ৯৫,০০০ US $ (95,000)। বুঝতেই পারছেন দুমাস দুদিন, এর মধ্যে রয়েছে রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেটিভ্ প্রোগ্রাম আর ভ্রমণের অফুরন্ত আনন্দ। খাওয়া-দাওয়া আর বিভিন্ন রকম মনোরঞ্জন তো আছেই।

পেত্রোভ্স্কির প্রোগ্রাম শুনতে ভালই লাগল কিন্তু অঙ্কের পরিমাণ শুনে ভাবলাম এই অভিযান আমার জন্য নয়। যাইহোক তার আলোচনার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে উঠলাম।

জাহাজে সামুদ্রিক জীবজন্তু বিশেষজ্ঞরা আজ দশটার সময় ভিডিও প্রোগ্রামে এখানকার জীবজন্তু সম্পর্কে বলবেন এবং যাত্রীদের প্রশ্নোত্তর দেবেন। তাতে সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া হবে আর তাদের দেখলে চেনা যাবে। কাজেই হাতে একঘণ্টার মত সময় আছে। এই সময়েই পেত্রোভ্স্কির দেওয়া ইন্‌ফরমেশনগুলো ডায়েরির পাতায় লিখে রাখলাম। কেবিন থেকে ছোট গোল জালনার ভেতর দিয়ে বাইরের সীমাহীন জলের ওঠা নামা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলাম। এ আর এক জগৎ, আর এক অভিজ্ঞতা।

হলঘরের কোণে বিরাট ভিডিওকে সামনে রেখে আমরা বসলাম। কোন রকম ভূমিকা না দিয়েই শুরু হল প্রোগ্রাম। ভিডিওর শুরুতেই ডঃ জন্ কুপার (Dr. John Cooper) আন্টার্ক্টিকার জীবজন্তু ও আবহাওয়াকে দূষণ মুক্ত রাখার জন্য পৃথিবীর নাগরিকদের প্রতি এক আবেদন জানালেন। ডঃ কুপার হচ্ছেন Chair of the Scientific Committee on Antartic Research. Bird Biology Sub Committee এবং Vice Chair of the Subantarctic Islands for the World Conservation Union Antarctic Advisory Committee.

ভিডিও শুরু হল বিভিন্ন ধরনের তিমি মাছ দিয়ে। কালো তিমি মাছ হাম্পব্যাক হোয়েল (Humpback Whale), দৈর্ঘ্যে সতেরো মিটার, ছোট বড় চিংড়ি এবং সামুদ্রিক শ্যাওলা খেয়ে জীবনধারণ করে। একদিনে খাদ্যের পরিমাণ প্রায় এক টন। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে যখন শীত তখন এই তিমি মাছের ঝাঁক উঠে আসে ইকুয়েটর (বিষুবরেখা)-এর দিকে। এই তিমি মাছের ঝাঁক সাধারণত কম গভীর জলে বাস করে।

নীল তিমি (Blue Whale) :

নীল তিমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তু। দৈর্ঘ্য প্রায় তেত্রিশ মিটার (33 M.)। ওজন একশ নব্বই মেট্রিক টন (190 metric tons)। এই তিমির বৈশিষ্ট্য হল এরা ডুব দেবার আগে লেজের অংশটা জলের ওপর তুলে ধরে। অন্যান্য তিমি মাছ তার পীঠটা মাত্র ভাসিয়ে রাখে ও ফোয়ারার মত জল ছিটোয়। নীল তিমি সাধারণতঃ একা একা বিচরণ করে এবং প্রায় সব মহাসাগরেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। জন্ম থেকে সম্পূর্ণ পূর্ণতায় পৌঁছতে লাগে পাঁচ বছর। দিনে প্রায় চার টন ছোট বড় সামুদ্রিক কীট, পতঙ্গ, শ্যাওলা, চিংড়ি খেয়ে জীবনধারণ করে।

তিমি মাছের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে মিংকে (Minke Whale)। দৈর্ঘ্য মাত্র দশ মিটার (10 M), ওজনে আট টন। ফোয়ারার মত জল ছিটোবার উচ্চতা মাত্র দুই মিটার।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আন্টার্ক্টিকা ও তার কাছাকাছি মহাসাগর তিমি মাছ

শিকারীদের তীর্থক্ষেত্র ছিল। তিমি মাছ খাদ্য হিসেব খুবই সুস্বাদু এবং তার চর্বি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য তিমি মাছের নাম হল—ফাইন্ হোয়েল (Fin Whale) স্প্যার্ম্ হোয়েল (Spern Whale), রাইট্ হোয়েল (Right Whale), সেই হোয়েল (Sei Whale)। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তু হলেও তিমি মাছ সাধারণতঃ সামুদ্রিক শ্যাওলা লতাপাতা আর তার সাথে সামুদ্রিক কীট-পতঙ্গ যা আসে তাই খায়। কখনও বড় মাছ বা সামুদ্রিক জীবজন্তুদের আক্রমণ করে না। তাদের স্বভাব শান্ত ও নির্লিপ্ত। হাঙ্গরের ঠিক বিপরীত। তাই তাদের নাম দেওয়া হয়েছে বিগ্ ভেজিটারিয়ান সী অ্যানিমেল। তবে সব তিমি কিন্তু ভেজিটারিয়ান নয়। ভেজিটারিয়ান নামে হলেও এরা মৎসপ্রেমিক।

কিলার হোয়েল (Killer Whale) :

তিমি মাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত হচ্ছে কিলার হোয়েল (Killer Whale) নামে তিমি মাছ হলেও আসলে বিরাট ডল্ফিন্ অর্থাৎ ডল্ফিন্ ফ্যামিলির মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের। দেখতে দৈত্যাকৃতি ডলফিন্। নাবিকেরা চলতি ভাষায় বলে অর্কাস (Orcas)। দৈর্ঘ্যে প্রায় আট মিটার (8 meters)। ওজন প্রায় নয় টন (9 Tons)। এদের যৌবনত্ব আসে বারো থেকে চোদ্দ বছরে। এরা ঝাঁক বেঁধে ঘুড়ে বেড়ায় আর যে কোন সামুদ্রিক মাছ ও জীবজন্তু খায়। পেংগুইনের প্রধান শত্রু। একটা আস্ত পেংগুইন এক ঢোকেই গিলে ফেলে। কিলার হোয়েল চিনতে অসুবিধা হয় না। জলের ওপর লাফিয়ে উঠলেই চোখে পরে পীঠের দিকটা কালো আর পেটের দিকটা সাদা। নাবিকেরা কিলার হোয়েল থেকে সব সময় সাবধানে থাকে।

আন্টার্কটিকার পাখি :

পেংগুইন কথাটা আন্টার্ক্টিকার সাথে ওতোপ্রোত-ভাবে জড়িত, আন্টার্ক্টিকার সিম্বল বা প্রতীক।

পেংগুইন পাখির মতো দেখতে, পাখির মতোই ডিম পাড়ে, পাখির মতোই ডানা আছে অথচ পালক নেই। লম্বা ঠোঁট আর দেহের পশম জলের উপযোগী, আর ভীষণ ঠাণ্ডার থেকে বেঁচে থাকার উপযোগী করে বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এরা পাখি হলেও ওড়েনা, স্থায়ীভাবে জল আর বরফের বাসিন্দা।

অনেক রকমের পেংগুইন আছে। সবচেয়ে বড় জাতের নাম এম্পেরর্ পেংগুইন (Emperor penguin)। ওজনে প্রায় চল্লিশ কিলো আর লম্বায় অর্থাৎ উচ্চতায় প্রায় এক মিটার বা কোন কোন সময় তার থেকেও বেশি। মাছ ও শ্যাওলা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ডুব দিয়ে থাকতে পারে প্রায় কুড়ি বাইশ মিনিট। একশ মিটারের বেশি গভীরে অনায়াসে যাতায়াত করে। জলে যখন ডুব দিয়ে যাতায়াত করে তখন মনে হয় ঠিক যেন পাখি উড়ে বেরাচ্ছে। ডিম পাড়ার পর পুরুষ পাখি তাতে তা দেবার দায়িত্ব নেয়। এই তা দিতে (Incubation) সময় লাগে ছেষট্টি দিন। তারপর প্রায় তিন মাসে সে যৌবনত্ব লাভ করে।

আন্টার্ক্টিকায় সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে কিং পেংগুইন (King Penguin)। অপেক্ষাকৃত ছোট ওজন পনেরো কিলোর মত। পেংগুইন দম্পতি তাদের শাবকদের খুবই যত্নে রাখে ও যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে বাঁচাবার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে থাকে। দম্পতি চিরদিন একই সঙ্গে বসবাস করে। তাই বহু সংস্থা আদর্শ পরিবারের বিজ্ঞাপন হিসেবে পেংগুইন পরিবারের ছবি ব্যবহার করে। অন্যান্য পেংগুইনদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : চীনস্ট্র্যাপ (Chinstrap), আদেলি (Adelie), জেন্টু (Gentu) এবং রয়্যাল (Royal)। লক্ষ লক্ষ পেংগুইন আন্টার্কটিকা ছড়িয়ে আছে।

আন্টার্ক্টিকার সীল :

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আন্টার্ক্টিকার প্রধান আকর্ষণ ছিল এখানকার সীল। সীলের পশমী চামড়া দিয়ে তৈরি হত শীতের সেরা কোট। সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মহলে সীল—চামড়ার কোটের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছিল আর সীল শিকারের জন্য আন্টার্কটিক সারকেলে বাণিজ্য তরীর আনাগোনাও ছিল প্রচুর। এক একটা জাহাজ কম করেও দুশ থেকে পাঁচশ সীল ধরে তাদের চর্বি ও চামড়া সংগ্রহ করে বাকি অংশটা ফেলে দিত। সীল শিকারের এই জঘন্যতা, আর নিরীহ প্রাণীহত্যার এই মর্মান্তিক দৃশ্য আস্তে আস্তে যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হতে লাগল তখন বিভিন্ন প্রাণী দরদীরা সংঘবদ্ধ হয়ে "সীল হত্যার" এই নিষ্ঠুর বাণিজ্য বন্ধের জন্য প্রতিবাদ শুরু করল। আজকাল তিমি মাছ শিকারের বিরুদ্ধে গ্রীণ পীস আন্দোলনের কথা কে না জানে। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজকাল তিমি শিকার আর সীল ধরার বাণিজ্য আন্তর্জাতিক আইন বলে সীমিত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে আজও অনেক অর্থলোভী শিকারীরা বেআইনি পথে তাদের বাণিজ্যতরী অব্যাহত রেখেছে।

আন্টার্ক্টিকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ পেংগুইন ও সীল। ভোদরের মত দেখতে কিন্তু দৈত্যাকৃতি তবে পা নেই, দুদিকে ডানা আর লেজের ওপর ভর দিয়ে ডাঙ্গায় পিছলে পিছলে চলে আর জলেই তার আসল জগৎ।

সীল মাছ অনেক রকমের হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ক্র্যাবইটার সীল (Crabeater Seal)। নামে ক্র্যাবইটার কিন্তু আসলে এরা খায় বিভিন্ন ধরনের মাছ। সীলগুলোকে দেখতে বিরাট ও হাত পা ছাড়া একটা জন্তু। আন্টার্ক্টিকার চারদিকে ছড়িয়ে আছে সীল। তারা সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। সীল এর আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা সাধারণতঃ নিরীহ ও শান্তিকামী। তবে কেউ তাদের আক্রমণ করলে তারা জলহস্তির মত বিরাট হাঁ করে ভয় দেখায় ও নিজেদের রক্ষা করে। পুরুষ সীলগুলো সাধারণতঃ স্ত্রী সীলের প্রায় দ্বিগুণ, সঙ্গী হিসেবে বেখাপ্পা। ক্র্যাবইটার সীল, পুরুষ দৈর্ঘ্যে তিন মিটার আর স্ত্রী সীলের দৈর্ঘ্য আড়াই মিটারের মত। এরা সাধারণতঃ পাথরের গায়ে জমে থাকা নরম প্যাক আইসে বসবাস করে, অর্থাৎ যেখানে বরফ ও পাথর একই জায়গায় পাওয়া যায়। একটা পুরুষ সীল দশবারোটি স্ত্রী সীল নিয়ে তার হারেম তৈরি করে। দক্ষিণ মেরুতে যখন শীত কমে

এসে বসন্তের হাওয়া বয় তখন শুরু হয় সীল জন্মলগ্ন। ক্র্যাবইটার-এর সংখ্যা প্রচুর। ১৯৯৬-৯৭ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় তিরিশ মিলিয়ন (30 million).

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সীল হচ্ছে সাউদার্ন এলিফ্যান্ট সীল (Southern Elephant Seal)। পুরুষের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ মিটার আর ওজন সাড়ে তিন মেট্রিক টন (3.5 Metrictons)। স্ত্রী সীলের ওজন সে তুলনায় খুবই কম মাত্র ন'শ কেজি (900 kg) আর দৈর্ঘ্যে তিন মিটার। দক্ষিণ মেরুর চারদিকেই সাউদার্ন এ্যালিফ্যান্ট সীল চোখে পড়বে। শীতের সময় এরা জলে বাস করে। আগস্ট মাসে তারা আবার চলে আসে স্থলভাগে সমুদ্র সৈকতে। স্থলভাগে এসেই শুরু করে তাদেব. দলভাগ। পুরুষ সীলগুলো অন্যান্য পুরুষ সীলগুলোর সাথে মারামারি করে যে যার হারেম তৈরি করে। সীলগুলোর চিৎকার অনেকটা জলহস্তির মত। শিশু সীল খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। প্রচুর পরিমাণে মায়ের দুধ খেয়ে মাত্র বাইশ দিনে তারা সাঁতার কেটে মাছ ধরতে পারে। ডুব দিয়ে তারা প্রায় এক কিলোমিটার যেতে পারে।

ওয়েডেল্ সীল (Weddel Seal) :

পুরুষ সীল লম্বায় তিন মিটার, ওজন চারশ কেজি। এই ধরনের সীল দক্ষিণ মেরুর সর্বদক্ষিণে সারা বছরই থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুতে যখন গরমকাল শুরু হয় তখনই দেখা যায় অসংখ্য ছোট ছোট বেবী সীল। এরা সাধারণতঃ বরফের গুহায় অথবা ভাঙা আইস্বার্গের আড়ালে থাকে এদের জীবন যাপন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা খুব বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। বিভিন্ন ধরনের সীলের মধ্যে একমাত্র এদেরই স্ত্রী পুরুষের ওজন ও দৈর্ঘ্যের তারতম্য কম।

লেওপার্ড সীল (Leopard Seal) :

অন্যান্য সীলের সঙ্গে এর তফাৎ হচ্ছে। স্ত্রী সীলের ওজন ও দৈর্ঘ্য পুরুষের থেকে বেশি। পুরুষ দৈর্ঘ্যে তিন মিটার, ওজন তিনশ কেজি। স্ত্রী দৈর্ঘ্যে চার মিটার ওজন চারশ পঞ্চাশ কেজি। পৃথিবীতে যত সীল আছে তার মধ্যে লেওপার্ড সীলের দুর্নামই বেশি। সমুদ্রে কিলার হোয়েলের মত এরাও এক একটা পেংগুইন আস্ত গিলে ফেলে। এদের ভয়াবহ দাঁত আর মুখের চেহারা দেখলেই অভিযাত্রীরা ভয়ে পালায়। অনেক বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানী অভিযাত্রীরা অন্যান্য সীলের সাথে এদের চরিত্রের তফাৎ না জেনে কাছে গিয়ে আহত হয়েছে।

লেওপার্ড সীল চেনা যায় তাদের বিরাট মাথা আর বিরাট চিবুক দেখে। সৌভাগ্যক্রমে এদের সংখ্যা কম আর এরা অধিকাংশ সময়েই জলে থাকে।

প্রায় পঁয়াতল্লিশ মিনিটের ভিডিওতে তিমি, সীল আর পেংগুইন পরিচিতি হল। তারপর একজন লেকচারার এগিয়ে এলেন সকলের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য। তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, এতদূর এসে জাহাজে ভিডিও দেখেই আমাদের ফিরতে হবে না, রিয়েল শো আমাদের চারদিকেই রয়েছে।

এরপর আরও কিছু আন্টার্ক্‌টিকার পাখির ছবি দেখানো হল যাদের দূর থেকে দেখলে সহজে চেনা যাবে না যেমন— বিভিন্ন ধরনের অ্যালব্যাট্রোস (Albatros), পেট্রেল্‌স্‌ (Petrels), করমোরান্টস্‌ (Cormorants), টের্নস্‌ (Terns), গাল্‌ (Gull) ইত্যাদি। বিভিন্ন পোলার বার্ডের বিভিন্ন স্বভাব। পাখি সম্পর্কে যারা উৎসাহী তাদের আর একদিন ডাকা হবে। প্রায় দেড়ঘন্টা পর আমরা মুক্তি পেলাম। জাহাজের মুক্ত ডেকে এসে হাফ ছাড়লাম। নীচের বিস্তৃর্ণ ও দোলানো ঢেউ-এর কার্পেটের ওপর দিয়ে আলা তারাসোভা নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে, ভারী মজার দোলনা।

অভিযাত্রী দল (Expedition Group) :

জাহাজের অস্থিরতা যেন বেড়েই চলল। বিকেলের দিকে এক্সপেডিশন গ্রুপের ডাক পড়ল। ডাইনিং হলে আমরা জমায়েত হলাম। সেখানে জাহাজের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের সাথে আরও ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম। তাদের মধ্যে রয়েছেন অরনিটলজিস্ট বা পক্ষী বিশেষজ্ঞ, বায়োলজিস্ট ও গ্লেসিয়লজিস্ট। তারা সংক্ষেপে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিলেন। জাহাজ থেকে আমরা যখন জোডিয়াক (Zodiac) বা রাবার বোট নিয়ে নীচে নামবো তখন আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে অযথা ঝুঁকি সব সময়ই এড়িয়ে চলতে হবে। যারা মনিটর এবং দলনেতা বা ট্যুর পরিচালক ও সংগঠক তাদের আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা একান্তই প্রয়োজন। মূল কথাগুলো আমাদের বার বার শোনানো হল। আন্টার্কটিকা কন্‌ভেন্‌সন অনুযায়ী পৃথিবীর এই সর্বজাতীয় পার্ক সংরক্ষণের দায়িত্ব সকলের। আন্টার্কটিকা পর্যটক মাত্রেই এই বিধিনিষেধ মানতে হবে, কনভেন্‌সনকে মানার জন্য ১৯৯১ সালে তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক ট্যুর অপারেটর সংগঠন। যার পুরো নাম International Association of Antartica Tour Operators, IAATO। পৃথিবীর ছটি দেশ এই সংগঠনের সভ্য। মূল দপ্তর নিউইয়র্কে। প্রধান দায়িত্ব যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে অধিকাংশই প্রফেসনাল পেশাদারী দলনেতা। তাদের জানতে হবে নতুন ধরনের ব্যবহার নীতি যাকে আর্ন্তজাতিক ভাষায় বলা হয় New Code of behaviour to protect the environment)।

বরফের ফাটলের দিকে না যাওয়া। স্নো স্টর্মের সময় যাতে মনোবল বজায় থাকে। জাহাজ হ্যারিকেন ঝড়ে পড়লে বা আইসর্বাগে আটকে পড়লে অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে যাতে প্যানিক সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। আন্টার্ক্‌টিকার পশু পাখীদের অযথা বিরক্ত না করা। সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে জাহাজ থেকে নীচে নেমে কোনো রকম আবর্জনা যেন না ফেলা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। জাহাজেই সব ফিরিয়ে আনতে হবে। যাত্রীদের প্রতি হুঁশিয়ার থাকতে হবে জাহাজের ডেকে ও জোডিয়াকে যেন কিছুতেই সেফ্‌টি জ্যাকেট ছাড়া কেউ না আসে। পাখি বা জন্তু-জানোয়ারদের খাবার দেওয়া নিষেধ।

নিউজিল্যান্ড সরকার ১৯৯৭ সালের এক আন্তর্জাতিক আইন বলে আন্টার্ক্টিকার পর্যটকদের কাছে নিবেদন করে বলেছেন যে, আন্টার্ক্টিকাকে দূষণমুক্ত রাখার দায়িত্ব প্রত্যেকটি মানুষের। আন্টার্ক্টিকায় ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বমোট টুরিস্ট-এর সংখ্যা ন'হাজার (9000)। প্রতি তিন বছরে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই নিউজিল্যান্ড সরকার এক নতুন আইন সৃষ্টি করেছেন যার নাম Environmental Impact Assessments (EIA). EIA are done to identify and predict the potential environmental impact of activities and to determine ways of preventing or minimizing any adverse effects.

এক্সপেডিশন গ্রুপের প্রতি টুকিটাকি আরও তথ্য জানানো হল। শেষে বারবার হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল আমি তার বঙ্গানুবাদ না করে হুবহু ইংরেজীটাই ডায়েরিতে লিখলাম—Operators, Leaders, and Explorers are warned, "The Antarctic environment is inhospitable, unpredictable and potentially dangerous. Do not expect a rescue service ; Self-sufficiency is increased and risk reduced by sound planning, quality of equipment and trained personnel of each expedition party.

জাহাজের ফ্রন্ট ওপ্ন্ ডেকের একটা বিরাট সুবিধা হচ্ছে যে জাহাজ অস্থিরভাবে ওঠানামা করলেও সামনে পড়ে যাবার ভয় নেই। অনেকটা পাঁচিল ডিঙিয়ে দেখার মত। এতে জীবনের ভয় নেই তবে ঠিক ঢেউ দেখা যায় না। আপার ডেক থেকে দৃশ্যটা আরও সুন্দর তবে জাহাজের গায়ে ঢেউ-এর ধাক্কা দেখা যায় না। আমি মাঝে মাঝে জাহাজের ওয়ার্লেস রুমে যাই। সেটা অনেক উঁচুতে আর সেখানে দাঁড়ালে মনে হয় জাহাজটা নাগরদোলার মত ঘুড়ছে। সেখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ নেই তবে সী সিক্নেস্ ও ডিজিনেস্ (Dizzyness)-এর ভয়ে সহজে কেউ যায় না। বলতে গেলে আমি একাই ওয়ার্লেস টাওয়ার স্পেস্ ব্যবহার করি। জাহাজের ক্যাপ্টেন সন্ধ্যার সময় ঘোষণা করলেন যে আমরা কন্ভারজেন্স বেল্ট লাইন (Convergent Belt Line) ক্রস্ করে দক্ষিণে কোল্ডার এরিয়াতে পড়লাম। এখন সন্ধ্যা। হাতের ঘড়িতে রাত আটটা। আমরা উশুয়াইয়ার সময়টাই ঘড়িতে ধরে রেখেছি। রাত আটটা কিন্তু সূর্য এখনও বেশ ওপরে রয়েছে। এখানে সূর্য্যাস্ত হবে সম্ভবতঃ রাত বারোটা নাগাদ। তারপর আকাশে রঙিনই থাকবে সারারাত। অনায়াসে রঙিন আকাশের আলোয় একটু কষ্ট করলেও খবরের কাগজ পড়া যায়। বুঝতেই পারছি আমরা এখন পৃথিবীর তলায়।

সন্ধ্যা হলেও দারুণ ঠাণ্ডা বাতাসে কিছুতেই সূর্য্যাস্ত দেখা সম্ভব নয়। কেবিনে ঢুকতে বাধ্য। কেবিনের হুব্লো (Hublo) থেকে পশ্চিম দিক্ দেখা যায় না তবে ঢেউ দেখার আনন্দ আছে—মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন ঢেউ-এর ওপর ভাসছি। মাঝে মাঝে যখন ঢেউগুলো গোল জানলার কাঁচে এসে ধাক্কা মারে তখন মনে হয় ঘরে যেন জল ঢুকে পড়েছে।

কন্‌ভারজেন্ট বেল্ট মানে যেখানে উত্তরের গরম জল দক্ষিণের ঠাণ্ডা জলের সাথে মিশেছে। এই জলের রেখা সমান নয়। আন্টার্ক্‌টিক সারকেল গোলাকার সেটা কল্পিত, কিন্তু কন্‌ভারজেন্ট লাইন বাস্তব। দক্ষিণ মেরুর চারদিকে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। নির্ভর করছে দক্ষিণ মেরুর অসীম জমাট বরফের আয়তন ও বিস্তৃতির ওপর।

১৬ই জানুয়ারি, শুক্রবার, ১৯৯৮ সাল। ড্রেক প্যাসেজ। আজ এই প্রথম আন্টার্ক্‌টিকার সূর্য্যোদয় দেখলাম। সাউথ পোলের গরমকালে দিনের আলো প্রায় কুড়ি ঘন্টা থাকে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পর টুইলাইট। ঠিক যেমন নর্থপোল নিশীথ সূর্য্যের দেশ ঠিক তেমনি। শুধু তফাৎ নর্থপোলে এখন শীতকাল আর এখানে এখন গরমকাল। নর্থপোলে এখন ছ'মাস রাত এখানে ছ'মাস দিন। তবে সত্যিকারের ছ'মাস দিন দেখতে হলে আরও দক্ষিণে যেতে হবে। জাহাজ থেকে সূর্য্যোদয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে ওয়ার্লেস্‌ টাওয়ার থেকে ভোর বেলা চারদিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় এই বিশ্বে আমি সম্পূর্ণ একা। চারদিকে শুধু অনন্ত জলরাশি ওপরে ঘন নীল আকাশ আর দূরে সমুদ্রের ওপর ভাসছে রঙিন সূর্য্য। এ দৃশ্য অভাবনীয়, অবর্ণনীয়। এই পরিবেশ জীবনের এক অব্যক্ত মুহূর্ত। সূর্য্য এখানে উজ্জ্বল তবে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য উপভোগ্য নয়। আমরা ভেসে চলেছি আরও আরও দক্ষিণে, পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই আইসব্রেকার শক্ত গ্লেসিয়ার ডিঙিয়ে সাউথ পোল্‌ পয়েন্ট স্পর্শ করতে পারবে না।

জাহাজের যাত্রীরা সবাইই সকালবেলা দেরীতে ওঠে। আমি এই নিস্তব্ধ ও নিঃসঙ্গ পরিবেশ পছন্দ করি। ভেসে চলেছি সুদূর অজানা অসীমের দিকে। এই পরিবেশে মন প্রবেশ করে তার গভীরতায় যেখানে নিত্য বিরাজিত আনন্দধাম। আনন্দ, শান্তি আর স্বস্তি সব কিছু এখানে মিশে গিয়েছে। মনে হচ্ছে মানব জন্মের এটাই তো চরম পাওয়া। পৃথিবীতে জন্মেছি ছোট হয়ে কিন্তু এই বৈচিত্র্যেভরা পৃথিবী দর্শনে আমার সেই ক্ষুদ্র আমিই ধীরে ধীরে বিরাটত্বে পরিণত হয়েছে। এটা আমার গর্ব নয়, এটা আমার উপলব্ধি। ভ্রমণ আমার জীবনের সাধনা। ভ্রমণ সাধানায় জীবনের পরিপূর্ণতা অনায়াস লব্ধ। সীমাহীন সৌন্দর্য আর নিঃসঙ্গতার মধ্যে হঠাৎ পাওয়া যায় পরিপূর্ণতার ছোঁয়া সেই ছোঁয়া বা স্পর্শকে যারা জীবনের প্রতি মূহুর্তে ধরে রাখতে পারে তারাই মহৎ, তারাই যোগী।

ভয়াবহ ভৌগোলিক অবস্থান এই ড্রেক প্যাসেজ। উত্তরে দক্ষিণ আমেরিকার শেষভাগের দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে আন্টার্কটিকার উত্তরাংশের দ্বীপপুঞ্জ। এই দুই স্থলভাগের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করছে পূর্বের আটলান্টিক মহাসাগর আর পশ্চিমের প্রশান্ত মহাসাগর। এই ড্রেক প্যাসেজে দুই মহাসাগর মিশেছে আর উত্তরের মহাসাগরীয় জলের সাথে মিশেছে দক্ষিণ মেরুর বরফ ভাঙা জল, সৃষ্টি করেছে কন্‌ভারজেন্ট বেল্ট। সব কিছু মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ভয়াবহ সামুদ্রিক স্রোত। স্রোতের সাথে সাথে সামুদ্রিক ঝড়, হ্যারিকেন। নাবিকদের আতঙ্ক এই ড্রেক প্যাসেজ।

দক্ষিণ আমেরিকার উশুয়াইয়া বন্দর থেকে আমরা এক হাজার কিলোমিটার পার হয়ে এসেছি। আমাদের ভাগ্য ভাল যে ঝড় ও সামুদ্রিক স্রোত আমাদের জাহাজকে আক্রমণ করেনি। কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ জাহাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ঘোষণা করা হল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সামুদ্রিক ঢেউ-এর সম্মুখীন হতে হবে। সকলকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল কেউ যেন খোলা ডেকে না যায়। সী সিক্নেস্ হলে অবশ্যই যেন ডিস্পেন্সারীতে আসে। মাথা ঘোরা ও বমির জন্য ট্যাবলেট্ বিতরণ করা হল। ক্যাপ্টেন বার বার যাত্রীদের অনুরোধ করলেন "একদম ভয় পাবেন না। আমরা অভিজ্ঞ নাবিক, এই পথ আমাদের পরিচিত। ড্রেক প্যাসেজের এই অশান্ত ঢেউ-এর সাথে আমাদের সখ্যতা।" রাশিয়ান নাবিক আমেরিকান কায়দায় সবাইকে আশ্বস্ত করলেন।

ঘন্টাখানেক পর সত্যি আরম্ভ হ'ল হ্যারিকেন। উশুয়াইয়া ছাড়ার পর এই প্রথম টের পেলাম ঢেউ-এর তাণ্ডব। বিকেলের দিকে জাহাজের নাচ তাণ্ডব নৃত্যে পরিণত হল। ঢেউগুলোর ওলোট পালট গতি জাহাজের যাত্রীদের অসুস্থ করে তুলল। যাত্রীরা অধিকাংশই যে যার কেবিনে আশ্রয় নিল। নাবিকেরা কোমর বেঁধে যে যার পোস্টে চলে গেল। জাহাজের গতি উঠছে আর নামছে, এটাই মাথা ঘোরার মূল কারণ। আজই সকাল বেলায় সূর্য্যোদয় দেখে ভাবছিলাম শান্ত ও নির্বিঘ্ন পরিবেশের কথা, এখন ঠিক তার উল্টো।

আমি মহাসাগরে এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে কোনদিন পড়িনি। তাই স্বচক্ষে বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। খোলা ডেকে যাবার দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কোনো যাত্রীই খোলা ডেকে যেতে পারবে না। বাধ্য হয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলাম। তিনি ভেতরেই ছিলেন। আমাকে ওয়েলকাম জানিয়ে ভেতরে বসালেন। আমি কোন রকম ভূমিকা না করেই তাকে আমার অভিপ্রায় জানালাম।

—আন্টার্ক্টিকা এসেছি সব রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। হ্যারিকেনের এই উন্মত্ত ঢেউ দেখার সৌভাগ্য থেকে কেন বঞ্চিত থাকবো। আপনি তো বলেছেন আপনাদের কাছে এ ঢেউ করায়ত্ব। আমরা সবাইই সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা সত্বেও বাইরে যাবার সব দরজা বন্ধ। আমাকে একটু দয়া করে খোলা ডেকে যাবার বন্দোবস্ত করে দিন। আমি সব রকমের বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এবং আপনাকে কোনো অভিযোগ করবো না।

ক্যাপ্টেন আমার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আমার হাত ধরে হ্যান্ডসেক করে বাঁ হাতে পিঠ চাপড়ে বললেন—

—ঠিক্, ঠিক্ কথা—কোনো আপত্তি নেই, তবে একা নয় আমি একজনকে সঙ্গে পাঠাচ্ছি। কোমরে সিকিউরিটি বেল্ট জড়িয়ে লম্বা দড়ি দিয়ে আংটার সাথে নিজেকে বেঁধে রাখলে ভয়ের কোন কারণ নেই, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও নেই। শুধু সেফ্টি জ্যাকেট, এই অশান্ত সমুদ্রে বোতলের কর্কের মত হারিয়ে যাবে।

তিনি বেল টিপলেন। এক মিনিটের মধ্যেই একজন নাবিক এসে স্যালুট করে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন রাশিয়ান ভাষায় তাকে ইন্‌স্ট্রাকশন দিয়ে আমাকে গুড্ লাক্ জানালেন।

ক্যাপ্টেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম খোলা ডেকের উদ্দেশ্যে। খোলা ডেকের সেফ্‌টি ডোর খুলতেই একটা ঢেউ আমাকে সাদর আহ্বান জানালো। মাঝখানের একটা আংটার সাথে আমি কোমরের দড়িটা বেঁধে দিলাম। যাতে বাতাস বা ঢেউ আমাকে বাইরে ফেলে না দেয়। নাবিক আমাকে ইসারায় জানিয়ে দিল বেশিক্ষণ থেকো না।

নিজেকে ভেবেছিলাম শক্ত, ভেবেছিলাম প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃত্য দেখার মত শারীরিক ও মানসিক বল আমার আছে। কিন্তু সেই ভয়াবহ ঢেউ, ঢেউ ভাঙার শব্দ আর ঠাণ্ডা বাতাস আমার মনটাকে এক মুহূর্তও রেহাই দিতে রাজি নয়। ঘন ঘন ঢেউ-এর জল ছিটকে চোখের কভার গ্লাসের ওপর পড়তে লাগল। চোখ থাকতেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাতাসে মনে হয় আমার লাইফ জ্যাকেটের একটা অংশ ছিঁড়ে উধাও হয়েছে। কোমরের সিকিউরিটি বেল্ট মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে। হ্যারিকেনের অভিজ্ঞতা, ঢেউ এর দৃশ্য, জাহাজের নৃত্য সব মনে থেকে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছে। আমি নিজেকে কোনো রকমেই স্থির করে ধরে রাখতে পারছি না। হ্যারিকেন আমাকে ভীষণভাবে বিব্রত করে তুলল। ঢেউ এর পর ঢেউ এর জল জাহাজের উঁচু পাঁচিল টপকে আমাকে নাস্তানাবুদ করে তুলল আর তার সাথে সাথে ঢেউ-এর গর্জন। আমার তখন সত্যি অসহায় অবস্থা। শুধু জানি যে আমি বিপদ্‌মুক্ত। আমার আমিত্ব সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। দু'জন নাবিক এসে আমাকে ডেক্ থেকে উদ্ধার করে ভেতরে নিয়ে গেল। রক্ষা পেলাম ভেতরে ঢুকে হাফ ছাড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম কতক্ষণ ছিলাম।

—কুড়ি মিনিট

—মাত্র কুড়ি মিনিট।

মনে হচ্ছে কয়েক ঘন্টা হ্যারিকেনের সাথে যুদ্ধ করে এলাম।

পোষাক পরিবর্তন করে বারে এসে এক কাপ কফি নিয়ে আমার এই কুড়ি মিনিটের অভিজ্ঞতাকে ডায়েরির পাতা ধরে রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুতেই সেই ভয়াবহ অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে ভাষায় রূপ দিতে পারলাম না। আর একবার প্রমাণিত হল যে প্রকৃতির এই লীলা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। ফটো, আলোচনা, ডায়েরি ইত্যাদি আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। সীমার মধ্যে যেমন অসীমকে ধরা অসম্ভব, তেমনি প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য লিখে বোঝানো অসম্ভব।

সন্ধ্যের পর আবার এসে উঠলাম ওয়াচ্ টাওয়ারে। সূর্য পশ্চিমে পরিষ্কার গোলাকৃতি লাল থালার মত দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সূর্যাস্তের কোন তাড়া নেই। অতি ধীর গতি। এর পর আরও নামবে তারপর আকাশকে রঙিন করে অস্তমিত হবে।

আকাশ সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার আগেই আবার চার ঘন্টার মধ্যেই সূর্যোদয় হবে। এখানে পূর্ব পশ্চিমের খেলাটা বড় অদ্ভুত। আমাদের পরিচিত চব্বিশ ঘন্টার দিন আর রাত্রির জ্ঞান সম্পূর্ণ ওলোট পালট হয়ে গেছে। অনেকটা সূর্যাস্তের সময় দিল্লী থেকে লন্ডন হয়ে নিউইয়র্কে প্লেনে আসার অভিজ্ঞতার মতই।

ওয়াচ্ টাওয়ার বা ওয়ার্লেস টাওয়ার থেকে পড়ে যাবার ভয় নেই। চারদিকে লোহার জাল কোমর পর্যন্ত উঁচু। সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ দেখার সুন্দর বিপদ্মুক্ত জায়গা। জায়গাটা বিপদ্মুক্ত হলেও কোন যাত্রীর ভিড় নেই। এখানে পাঁচ দশ মিনিট দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে। আমার সেই ভয় নেই। মাথাধরা, মাথাঘোরা, গা বমি করা ইত্যাদি উপসর্গগুলো ভগবানের আশীর্বাদে আমার নেই। আমরা মাত্র তিন চারজন অবজারভেটরীর দোলনায় চেপে এই অনিন্দ্যসুন্দর দিগন্ত আর উন্মত্ত ঢেউ-এর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এই অবজারভেটরীতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তের এই অস্থির ভয়াবহ আনন্দ বিস্ময়ের মুহূর্তগুলো জীবনের আর এক আশীর্বাদ। আমার কাছে আশীর্বাদ হলেও এই ড্রেক প্যাসেজে শত শত নাবিক তাদের প্রাণ হারিয়েছে। দেবতার উদ্দেশ্যে হয়তো সেটাই ছিল প্রাণ বলি, উৎসর্গ!

১৭ই জানুয়ারি : অবেশেষে আন্টার্ক্টিকা। সকাল বেলা ডেকে এসে অবাক হয়ে গেলাম। সমুদ্র শান্ত। সম্পূর্ণ নতুন এক দৃশ্যে মন ভরে উঠল। দূরে কয়েকটা দ্বীপ তুষারাবৃত। মনে হয় সমুদ্রের ওপর ভাসছে। আর জাহাজের একটু দূরেই কয়েকটি তিমি তাদের ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তিমি মাছগুলোর পিঠের মাত্র সামান্য অংশ জলের ওপর ভাসছে। জাহাজ থেকে এই দৃশ্যটায় মনে হচ্ছে আন্টার্ক্টিকা আমাদের জন্য ফোয়ারা সাজিয়ে স্বাগতম জানাচ্ছে। ডেকের ওপর রোদ্দুর থাকলেও ঠাণ্ডার মাত্রা কম নয় মনে হচ্ছে। শূন্যের থেকে পাঁচ ছয় ডিগ্রী কম। বাতাস বইছে তবে উপযুক্ত পোষাকের জন্য অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। জাহাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে বরফে ঢাকা দ্বীপপুঞ্জের দিকে। সেই প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে ছন্দপতন ঘটালো আমাদের গাইড। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল,

—আমরা আন্টার্ক্টিকা পেনিনসুলার সাউথ্ শেতল্যান্ড দ্বীপে এসে পৌঁছেছি।

আশ্চর্য বটে। শেতল্যান্ড বা শ্বেতল্যান্ড সাদাই বটে। ভাষাগত অনেকটা সংস্কৃতিঘেষা মিল।

—সামনের এই দ্বীপটায় আমরা নামবো। এই দ্বীপের নাম কিং জর্জ আইল্যান্ড। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে যারা আন্টার্ক্টিকা অভিযানে আসে তারা প্রথমে এখানে এসেই থামে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ড্রেক প্যাসেজের অশান্ত সামুদ্রিক ঢেউ কাটিয়ে অতি অল্প সংখ্যক লোকই এখানে এসে পৌঁছয়। এই ড্রেক প্যাসেজ পাড় হবার জন্য নাবিকদের প্রয়োজন শক্ত মনোবল, শক্ত শরীর, শক্ত বোট, আর বহু দিনের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা। ছোট খাটো বোট বা ইয়টে করে যারা আসে তারা সবাইই

পৃথিবীবিখ্যাত নাবিক। আমরা ভাগ্যবান এই আইস্‌ব্রেকার-এর জন্য আমাদের কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়নি।

শেতল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য। এর মধ্যে আছে চারটে প্রধান দ্বীপপুঞ্জ। এক ক্লারেন্স ও এলিফ্যান্ট (Clarence and Elephant Islands), দুই কিং জর্জ ও নেল্‌সন (King George and Nelson Islands) তিন রবার্ট, গ্রীণ উইচ্‌, লিভিংস্টোন, স্নো, ডিসেপ্‌সন (Robert, Greenwitch, Livingston, Snow and Deception Islands) চার স্মিথ্‌ ও লো (Smith and Low Islands)। এছাড়া রয়েছে আরও একশ পঞ্চাশটা ছোট বড় দ্বীপ সেগুলোও খুব আকর্ষণীয়।

সাউথ শেতল্যান্ড দ্বীপ কিন্তু সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা নয়। এর ৮০ ভাগ (80%) মাত্র গ্লেসিয়ারে ঢাকা। এখানকার গ্লেসিয়ারের পরিমাণ ৩৬৮৮ স্কোয়ার কিলোমিটার (3688 sq. km.)। সর্বোচ্চ ভূমি ২১০৫ মিটার (2105 M)।

সামান্য ইতিহাস : ১৮১৯ (1819) সালে ব্রিটিশ নাবিক উইলিয়াম স্মিথ্‌ (William Smith) এই দ্বীপপুঞ্জকে হঠাৎ আবিষ্কার করেন। হঠাৎই বটে। তিনি জাহাজ ভাসিয়েছিলেন কেপ্‌ হর্ন থেকে ভালপারাইজো (Cape Horn to Valparaiso) যাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ড্রেক প্যাসেজে তার জাহাজ হ্যারিকেনের মুখে পড়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে আসে এই শেত্‌ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে। তখন তিনি বুঝতেও পারেননি যে দৈবক্রমে তিনি এসে পৌঁছেছেন আন্টার্ক্‌টিকা পেনিনসুলায়। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ সাল ইতিহাসের পাতায় লেখা হল শেতল্যান্ডের আবিষ্কারক ইউলিয়াম স্মিথের নাম। সামুদ্রিক ঝড় থামার পর তিনি আবার পাল তুললেন ভালপারাইজোর দিকে। চিলি থেকে ফেরার পথে তিনি ভেবেছিলেন আবার পদার্পণ করবেন সেই দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে যাত্রায় ড্রেক প্যাসেজে পূর্ব দিকের ঝড় তাকে অন্যদিকে ঘুড়িয়ে দিল। সে যাত্রায় তার আর আসা হল না। সেই বছরের শেষের দিকে তিনি আবার জাহাজের পাল তুললেন শেতল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। তিনি ছিলেন দক্ষ নাবিক। অক্টোবর মাসের ষোল তারিখে তিনি আবার জাহাজ ভেড়ালেন শেতল্যান্ডের একটি দ্বীপে। কিং জর্জ থ্রি (King George III)র নামানুসারে এই দ্বীপের নাম দিলেন কিং জর্জ (King George)।

আন্টার্ক্‌টিকার শান্ত পরিবেশে শুরু হল এক রক্তাক্ত ইতিহাস। উইলিয়াম স্মিথের এই আবিষ্কার ব্রিটিশ অর্থনৈতিক জগতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করল। সাউথ শেতল্যান্ডের অগণিত সীল-এর বিবরণ পেয়ে ধনী শিল্পপতিরা লাফিয়ে উঠল। সীলের চামড়া ও পশমের জন্য পরের বছর উইলিয়াম স্মিথের তত্ত্বাবধানে একানব্বইটি জাহাজ পাঠানো হল সীল ধরার জন্য। নতুন শিকার ও নতুন শিকারভূমি পেয়ে ব্রিটিশ সীলারর্স (Sealers) আনন্দে আত্মহারা হয়ে সীল নিধন যজ্ঞ শুরু করল। এক গ্রীষ্মকালে স্মিথ ষাট হাজার (60,000) সীল মারল। এই সীল নিধন যজ্ঞে পরবর্তী চার বছরের মধ্যেই কয়েক শ্রেণীর সীল সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেল। সীল ধরার জন্য ও জাহাজগুলোকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য কিং জর্জ আইল্যান্ডকে করা হল মূল ঘাঁটি।

আজও আন্টার্ক্‌টিকায় কিং জর্জ আইল্যান্ড প্রায় প্রধান বন্দর ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্ষেত্রের জন্য পরিচিত। যাইহোক আন্টার্ক্‌টিকা ট্রীয়েটী সাক্ষরের জন্য আজ যদিও সেই সীল নিধন যজ্ঞ থেমেছে কিন্তু যে সব স্পেসিস উধাও হয়েছে তাদের আর এ জগতে কোনদিনই দেখা যাবে না।

জাহাজ দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে। দুপুরে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল। তিনি সবাইকে ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য কন্‌গ্রাচুলেশন জানালেন। তিনি এবার জোর দিয়ে বললেন যে, ইয়ট বা ছোট জাহাজ হলে এই সামুদ্রিক ঝড়ে আমাদের খুবই বেগ পেতে হত। এই জাহাজের ওজন ও ভল্যুম-এর জন্য এই সাংঘাতিক ঢেউ আমরা বুঝতে পারিনি। তবে যে দু'জন ওপ্‌ন্‌ ডেক ও অবজারভেটরী থেকে এই দৃশ্য দেখেছেন তাদের কথা আলাদা। যাইহোক সুখবর হচ্ছে যাত্রী ও অভিযাত্রীরা সবাইই সুস্থ। আন্টার্ক্‌টিকায় আমাদের প্রথম পদার্পণ হবে কিং জর্জ আইল্যান্ডে। মনে রাখবেন খাওয়া-দাওয়া জাহাজেই হবে। আপনাদের বার বার সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের অনুরোধ জাহাজ থেকে নেমে যেখানেই যান না কেন সিগারেটের টুকরো, ফিল্‌মের এন্‌ভেলপ্‌ ফেরত আনবেন। আন্টার্ক্‌টিকাকে পরিষ্কার রাখা ও দূষণমুক্ত রাখা মানুষ মাত্রেই কর্তব্য। মনে রাখবেন এখানকার জীবজন্তু পশু-পাখিকে কিছু খাবার দেবেন না। এখানকার জলভূমি অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। অযথা এদের কাছে যাবেন না। যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন। আমাদের নির্দেশ মেনে চললে যাত্রা সফল হবেই। আন্টার্ক্‌টিকায় ওয়েলকাম।

কিং জর্জ আইল্যান্ড। আন্টার্ক্‌টিকার অসমর্থিত রাজধানী। জাহাজ থেকে আমরা জোডিয়াকে (রাবার বোট) উঠে দ্বীপে এলাম। দুটো জোডিয়াক কাজেই কয়েকবার যাতায়াত করতে হল। প্রথমে মনিটর গাইড ও এক্সপার্টস্‌রা নামল। তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম দ্বীপে। জাহাজ একটু দূরে নোঙর করল। জোডিয়াক থেকে নেমেই ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম পৃথিবীর এই দক্ষিণ ভূমিখণ্ডকে। কৃতজ্ঞতা আর ভক্তিভরে প্রার্থনা করলাম ইষ্টদেবতাকে। পৃথিবীর এই আশ্চর্য দক্ষিণমেরু স্পর্শ করার সাথে সাথে আমার ভ্রমণপিপাসু মন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। আমার ভূপর্যটনের শেষ অধ্যায় পরিপূর্ণ হল। নিজেকে ধন্য মনে করলাম। আনন্দের পরিপূর্ণতায় মন ভরে উঠল।

আন্টার্ক্‌টিকাকে বলা হয় শ্বেত মহাদেশ (White Continent)। সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। অথচ এই কিং জর্জে নেমে দেখলাম এই অংশের বরফ গলে গেছে। গাইড বুঝিয়ে দিল যে এই দ্বীপপুঞ্জের আয়তন একহাজার দু'শ পঁচানব্বই স্কোয়ার কিলোমিটার (1295 km^2)। এই বরফমুক্ত স্থানেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। আমরা আইল্যান্ডের ভেতরে ঢুকলাম। চোখে পড়ল শক্ত পাথরের ওপর একটা এয়ার স্ট্রীপ। হালকা এয়ারট্রাফিক এখানে যাতায়াত করতে পারে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট প্লেন ও দুটো হেলিকপ্টার। পাশেই বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা বেলিংহাউজেন স্টেশন (Bellinghausen Station)। রাশিয়ান

কেন্দ্র। কিং জর্জ আইল্যান্ডের এই অঞ্চলটাই সম্পূর্ণ বরফমুক্ত পেনিনসুলা (Ice free Peninsula)। ব্যারাক্ টাইপের হালকা কাঠ ও সিমেন্টের বাড়ি। আমাদের স্বাগতম জানালেন সেখানকার ইন্‌চার্জ বৈজ্ঞানিক ভ্‌লাদিমির। শুধু গরমে খোলা হয়। চারজন বৈজ্ঞানিক থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র নামেই, আসলে এটা একটা হল্টিং স্টেশন (Halting Station)। বৈজ্ঞানিকরা আসে যায়, আবহাওয়া, বরফ, পাথর, জল আর বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের নমুনা নিয়ে যায় রাশিয়ার পোলার গবেষণাগারে নোভোসিবির্ক্‌সে (Novossibirsk), সাইবেরিয়ায় অবস্থিত সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় বরফ গবেষণা কেন্দ্র।

এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য খোলা হয়েছে আপ্যায়ন কেন্দ্র। এখানকার সুভ্যেনির স্টলটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ পোলের নামাঙ্কিত গেঞ্জি, ব্যাগ, পিন্ ব্যাজ্, আইস্‌ব্রেকারের ছবি, জ্যাকেট ইত্যাদি অতি সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। তবে স্যুভেনিরগুলো এখানে বিক্রি হলেও সেগুলো তৈরি হয়েছে অন্যত্র। টুরিস্টদের জন্য লেখা আছে : "এখানে পায়খানা প্রস্রাবের (Toilet) কোন বন্দোবস্ত নেই, কোন পানীয় বা খাবার পাওয়া যায় না দুঃখিত।"

রাশিয়ান কেন্দ্র হলেও সব কিছুই ইংরেজীতে লেখা। সামান্য কিছু কেনাকাটা করে আমরা আবার বেরোলাম। জাহাজে কয়েকদিন জলের দোলনা খাওয়ার পর মাটিতে চলার এক আনন্দ আছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে কিন্তু সূর্যের উত্তাপ বেশ প্রখর, কাজেই আমাদের চলায় অসুবিধা নেই। দলের অনেকেই ফিরে গেল জোডিয়াকে। মূল কারণ টয়লেটের অনুপস্থিতি। আমরা সাতজন ঠিক করলাম রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার। রাস্তা মানে দক্ষিণমেরু বা আন্টার্কটিকার একমাত্র রাস্তা। তেরো কিলোমিটার কাঁচা পাথরের রাস্তা। এই রাস্তারই দুপাশে পর পর ব্যারাক নজরে পড়তে লাগল। দর্শনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু চোখে পড়ল না। বাড়িঘরগুলোর নমুনা দেখেই মনে হল অস্থায়ী। তবে সাইনবোর্ডগুলো খুব পরিষ্কার। উরুগুয়ে, চিলি, চায়না, কোরিয়া। তবে এই তেরো কিলোমিটার রাস্তার ধারে সব প্রতিনিধি নেই। উত্তরের আড্‌মিরাল্‌টি বে (Admiralty Bay)তে রয়েছে ব্রাজিল, পোলান্ডের রিসার্চ স্টেশন। হাঁটা পথে অনেক দূর। চিলি কর্তৃপক্ষের ভিলা লাস এস্‌ত্রেলাস্ (Villa Las Estrellas) রিসার্চ স্টেশনের দুজন বৈজ্ঞানিক আমাদের আহ্বান জানালেন। তাদের মূল বিষয় হচ্ছে আবহাওয়া সংক্রান্ত (Meteriological Science)। তিনটে ঘর আর কয়েকটি মেসিন। তারা সব তথ্য সরাসরি কম্‌পিউটরে পাঠিয়ে দেয় মূল ভূখণ্ডে। আজকাল কম্‌পিউটর ও টেলিকমিউনিকেশনের যুগে এখানকার গবেষণাগার রাখার কোন মানে হয় না। আমরা বিশ্রামের জন্য ভিলাতে বসে বৈজ্ঞানিক মেলেনিও'র (Scientist Melogno, উচ্চারণে G উহ্য) কাছ থেকে সেখানকার আরও ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পারলাম।

নরওয়ে, ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা এখানে প্রথমে এসেছিল তিমি শিকারের জন্য। তিমি মাছের চর্বি থেকে নানা ধরনের কারখানা চালাবার তেল, সাবান আর কস্‌মেটিক্

দ্রব্য তৈরি হত। মাংসর কথা তো সবাই জানে। আর সীলের চামড়া থেকে তৈরি হত উন্নত ধরনের শীতের কোট। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ তিমি ও সীল সেই ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ভর্তি করেছে টাকায়। এই দক্ষিণ মেরুর গ্লেসিয়ার সৌন্দর্য এখানকার জীবজন্তু আর চিরস্থায়ী স্তব্ধতা তাদের আকর্ষণ করেনি। তারা এসেছিল ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে। মনে রাখতে হবে যে যারা কলোনিয়াল যুগে নতুন দেশ অভিযানে যেতো তারা কেউ প্রকৃতিপ্রেমিক ছিল না। তাদের পেছনে ছিল অধীনতা, ধনলুণ্ঠন অথবা সরাসরি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি।

নরওয়েজিয়ান ও ব্রিটিশরা এসেছিল তিমি ও সীল শিকারের জন্য। আমাদের ইতিহাস সেদিক থেকে অনেক আলাদা। চিলিয়ান সরকার আন্টার্ক্‌টিকাকে মনে করে চিলিরই এক অংশ। আন্টার্ক্‌টিকার থেকে রাশিয়া, চীন, পোল্যান্ড, কোরিয়া, ব্রিটিশ অনেক অনেক দূরে। আন্টার্ক্‌টিকায় তাদের দাবী যুক্তিসংগত নয়। ভাল করে ম্যাপটা দেখুন, চিলি, আর্জেন্টিনা, সাউথ্‌ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া বলতে গেলে আন্টার্ক্‌টিকার সত্যিকারের অধিকারী।

আমি মিঃ মেলোনিওর কথা শুনে তাকে প্রশ্ন করলাম :

—ইন্ডিয়ার দাবী প্রসঙ্গে আপনার কি অভিমত?

—ওঃ আপনি ইন্ডিয়ান। কন্‌গ্রাচুলেশন। আমি এই প্রথম আন্টার্ক্‌টিকায় একজন ইন্ডিয়ান দেখছি।

—আপনি হয়তো এই প্রথম দেখছেন কিন্তু আমি প্রথম নই। ভারতীয় নেভী টীম বহুবার আন্টার্ক্‌টিকায় এসেছে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ আমার মতে রাশিয়া ও চীন যদি আন্টার্ক্‌টিকার এক অংশ দাবী করতে পারে তাহলে ইন্ডিয়ানদের অধিকার তো তাদের থেকেও বেশি।

তার উত্তরে আমি খুশি হলাম। প্রফেসর মেলোনিওকে আর একজন প্রশ্ন করলেন,

—আপনাদের এই স্টেশনের ইতিহাস কিছু বলুন।

—এই দ্বীপে প্রথম বাড়ি তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ হার ম্যাজেস্টিস্‌ সার্ভিস ১৯৪৬-৪৭ (1946-47) সালে। তারপর ১৯৬১ সালে তাদের সেই পোলার স্টেশন অ্যাড্‌মিরাল্‌টী বে (Admiralty Bay) অঞ্চলে তাদের প্রথম স্থায়ী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে ১৯৬১ সালে। আন্টার্ক্‌টিকায় এই প্রথম সামার ও উইন্টার রিসার্চ স্টেশন।

আর্জেন্টিনার স্টেশনকে বলা হয় টেনিয়েন্তে জুবানী (Teniente Jubany)। স্থায়ী স্টেশন নামে মাত্র আসলে একটা কাঠের বাড়ি। সেদিক থেকে বিচার করলে এখানে চিলির প্রতিনিধিত্ব নতুন। মাত্র ১৯৮০ (1980) সাল থেকে চিলি এখানে আসা শুরু করেছে। প্রথমে চিলিই এখানে হারকিউল মডেলের প্লেনে যাত্রীদের নিয়ে আসতো।

চিলির দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। যাতে চিলিয়ানরা আন্টার্ক্টিকায় যাতায়াত করতে পারে তারজন্য সরকার নতুন পর্যটন পরিকল্পনা তৈরি করে। সবশুদ্ধ চিলি থেকে ছ'বার প্লেন যাতায়াত করেছে এবং যাত্রীদের থাকার জন্য সরকারি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে পোলার স্টার হোটেল (Hotel Estrelaa Polar)। দক্ষিণ মেরুতে এই প্রথম হোটেল অবশ্য এর পর আর কোন হোটেল হয়নি। ১৯৮২ সালে চিলি সরকারের আহ্বানে এখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় International Conference on Antarctica Resources Policy। চিলির মিলিটারি শাসনকর্তা Augusto Pinochet নিজে ১৯৯৪ সালে এই কিং জর্জ আইল্যান্ডে এসেছিলেন। এর আগে কোন দেশের প্রধান আন্টার্ক্টিকায় পদার্পণ করেনি। চিলি সরকার চায় আন্টার্ক্টিকার প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা। প্রফেসরের কথায় আমি লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলাম,

—এখানে পোলার স্টার হোটেল আছে সে কথা কেউ আমাকে বলেনি তো। আশ্চর্য!

প্রফেসর মেলোনিও আমার কথায় একটু মৃদু হেসে বললেন,

—হ্যাঁ হোটেল খুলেছিল বটে কিন্তু চলেনি। আসলে আন্টার্কটিকার ভূমিতে চিলির স্থায়ী অধিকার স্থাপন করার জন্যই সরকার অস্থায়ীভাবে একটা পরিকল্পনা নিয়েছিল মাত্র। পোলার স্টার হোটেল নাম হলেও সেটা মিলিটারি ঘাঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা চিলির রিসার্চ স্টেশন ছেড়ে পরের কাঠের বাড়িটা পার হতেই চোখে পড়ল, চেং চেং চায়না স্টেশন (Cheng Cheng China Station)। গাইড বলল যে আন্টার্ক্টিকায় চীন সরকারের দাবী বজায় রাখার জন্যই এই ঘরটা করা হয়েছে। এখানে চীন সরকারের কোন রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ হয় না। আমরা আবার ফেরার পথ ধরলাম।

দ্বীপটার এই অঞ্চলটা অর্দ্ধগোলাকার হয়ে জলের চারদিকে ঘিরে একটা সুন্দর বে (Bay)'র সৃষ্টি করেছে। জলের এই অংশটা প্রচণ্ড ঝড় জল থেকে রক্ষা পেয়েছে এর নাম হাফ্ মুন বে (Half Moon Bay)। আমরা আবার আমাদের জোডিয়াকে জাহাজের উদ্দেশ্য পাড়ি দিলাম। যাবার পথে পেংগুইন তাদের ভাষায় আমাদের বিদায় জানালো।

সেদিন রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করে যে যার কেবিনে ফিরে গেলাম। দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করলাম, এই মাটিতে ঘন্টাখানেক কাটালাম কিন্তু ঠিক মন ভরল না। ভাবলাম এই জন্যই কি এত দূর ছুটে আসা? জাহাজ চলা শুরু করছে সারারাত ধরে জাহাজ চলবে। আমাদের পরবর্তী ধাপ ডিসেপ্সন আইল্যান্ড।

১৮ই জানুয়ারি, রবিবার। সকাল ৮টায় কয়েকজন প্রটেস্টান্ট আমেরিকান, একজন ইউরোপিয়ান ক্যাথ্লিক আর আমি ভারতীয় হিন্দু সবাই মিলে জাহাজের হলে প্রার্থনায় বসলাম। উদ্যোক্তা আমি, কাজেই নিরপেক্ষ মন নিয়ে সবাই সেই এক বিশ্বপিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনা শুরু হল বাইবেল পাঠ করে আর শেষ হল সংস্কৃত সার্বজনীন মঙ্গল প্রার্থনা দিয়ে।

ওম্ সর্ব্বেষাম স্বস্তির্ভবতু সর্ব্বেষাম শান্তির্ভবতু
সর্ব্বেষাম পূর্ণম্ ভবতু সর্ব্বেষাম মঙ্গলম ভবতু
সর্ব্বে ভবন্তু সুখীন সর্ব্বে সন্তু নিরাময়
সর্ব্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভাবৎ
অসতো মা সদ্গময়ো তমসো মা জোতির্গময়
মৃত্যুর্মা অমৃতম্ গময় ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনায় ইংরেজী অনুবাদ শুনে সবাইই খুশি। ম্যাগ্নাম বলল, এর মধ্যে কোন দেব দেবীর নাম নেই। সত্যি এতো ইউনিভার্সাল। আমি তার কথায় উৎসাহিত হয়ে বললাম—একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ এক ঈশ্বর বহু নাম। পৃথিবীর এই প্রান্তে মনুষ্য সমাজ নেই। নেই ধর্মীয় বিবাদ, কোলাহল আর রাজনীতির কলুষতা। এখানে আছে চিরসুন্দরের স্থায়ীত্ব। এখানে এসে সকলের মন সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। এই সুন্দর মনগুলোর আন্তরিক প্রার্থনা নিশ্চয়ই সেই চিরসুন্দর সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছেছে। সকলে সকলকে আলিঙ্গন করে প্রার্থনা সভা শেষ হল।

ব্রেক-ফার্স্টের সময় ঘোষণা করা হল :

—আমরা আজ দুপুরবেলা ডিসেপ্সন আইল্যান্ডে পৌঁছাবো। আমাদের জাহাজ খুব সহজেই এই দ্বীপে নোঙর করবে। এই দ্বীপটি ভল্কানিক্ লাভায় তৈরি সমুদ্র গর্ভ থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই দ্বীপটির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বালির চড়া নেই, দ্বীপের পরই গভীর সমুদ্র। পৃথিবীর অন্যতম প্রকৃতি সৃষ্ট নিরাপদ জেটি (One of the Safest natural harbors anywhere in the world)। এখানকার ইরাপ্সন (Eraption) আজও অব্যাহত। তব ভয়ের কারণ নেই। সমুদ্রের তলায় ও দ্বীপের ওপর উষ্ণপ্রস্রবন রয়েছে আর তার ফলে এখানকার জল বেশ গরম। স্নান করার পক্ষে উপযোগী। জাহাজের সবাই আনন্দে নেচে উঠল। জাহাজে কয়েকদিনের একঘেয়েমী জীবনে চঞ্চলতা দেখা দিল। দ্বীপ সম্পর্কে খুব বেশি বলার নেই। এই দ্বীপের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সীল শিকারীদের বাণিজ্যভিত্তিক অর্থকেন্দ্রিক কার্যকলাপ। ১৯২০ সালে নাথানিয়েল পাল্মার নামে এক আমেরিকান সীল শিকারী (American Sealer Nathaniel Palmer) এই দ্বীপে। প্রথম পদার্পণ করে। কিন্তু সে কোন সীল শিকার করেনি। এই দ্বীপে তিমি মাছের কারখানা স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে। সীল নয়, তিমি মাছ ধরা কাটা ও তাকে চাহিদা অনুযায়ী মাংস চর্বি হাড় আলাদা করে কৌটায় ভরার কারখানা তৈরি হয় নরওয়ে ও চিলির যৌথ প্রচেষ্টায়। কোম্পানীর নাম নরওয়েজিয়ান চিলিয়ান হোয়েলিং কোম্পানী। পরে ১৯১১ সালে ব্রিটেন এই দ্বীপটির সম্পূর্ণ অধিকার দাবী করে। ফাল্ক্ল্যান্ডে (Falkland) তখন রীতিমত ব্রিটিশ প্রতিনিধি তার স্থায়ী আসন বসিয়েছে। এবং বলতে গেলে ব্রিটিশ প্রতিনিধি সম্পূর্ণ আন্টার্কটিকাই তাদের করায়ত্বে আনার চেষ্টা করে। ১৯১১ সালে হেক্টার নামে এক নরওয়েজিয়ান হোয়েলিং কোম্পানী দ্বীপটি ব্রটিশ সরকার থেকে

একুশ বছরের জন্য লীজ (Lease) নেবার চুক্তি করে। ১৯১৪ সালে এই হেক্টার কোম্পানী (Hektor Company) এখানে তেরোটা ফ্লোটিং ফ্যাক্টরী (Floating Factory) স্থাপন করে।

বলাই বাহুল্য যে তিমি মাছের চর্বি সেই যুগের এক নতুন আবিষ্কার। তিমি মাছের চর্বির তেল কলকারখানার কলকব্জায়, বন্দুক ও বিভিন্ন অস্ত্রে ব্যবহার করা হতো। সে যুগে এটাই ছিল মূল ভিত্তি। আর তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সাবান, গ্লিসারিন, ইন্সুলিন, জিলেটিন, বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য ফার্টিলাইজার, প্রসাধন দ্রব্য বিভিন্ন ধরনের রঙের কারখানা ও ছাপাখানার রঙ, ইত্যাদি। আর পরম উপাদেয় তিমি মাছের মাংস তখন আভিজাত্য টেবিলের মর্যাদা বৃদ্ধি করতো।

ডেক থেকে আমাদের বাঁ দিকে একের পর এক দ্বীপ চোখে ধরা দিতে লাগল। এখন মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা এসে পড়েছি দক্ষিণের সাদা মহাদেশে। আমাদের ডানদিকে আবার দেখা দিল তিমি মাছের খেলা। সময় কাটাবার এক সুন্দর উপায়।

জাহাজ থেকেই সুন্দরভাবে তিমি মাছের খেলা দেখা যায়। আমার পাশেই পেলাম সানোভিচ্‌কে। সানোভিচ্‌ জাহাজের ভাইস্‌ ক্যাপ্টেন। বহুদিনের অভিজ্ঞ রাশিয়ান নাবিক। আন্টার্ক্‌টিকায় বহুবার এসেছে। আমি তিমি মাছের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতেই সে আমাকে নিয়ে ওয়াচ্‌ টাওয়ারে এল, সঙ্গে নিল ওর দূরবীন, Carena De Luxe 12×50 Wide Angle। হাতে সময় আছে আর মনে রয়েছে প্রচুর প্রশ্ন। কাজেই সানোভিচ্‌কে (Sanovitch) পেয়ে খুবই ভাল হ'ল। ইয়টে করে এলে তিমি মাছের খেলা দেখা যায় না। কারণ কাছে গেলে ওদের এক ধাক্কাতেই নৌকো উল্টো হয়ে যায়। আর ছোটখাটো জাহাজ হলেও বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। আইস্‌ব্রেকারের আয়তন ও স্ট্যাবিলিটি তার তুলনায় অনেক বেশি, বিপদের সম্ভাবনা একদম নেই। ওয়াচ্‌ টাওয়ার থেকে সত্যি পরিষ্কার দেখতে পেলাম তিমি মাছের খেলা, দূরবীন ও গাইড আমাকে আরও কাছে নিয়ে এল।

তিমি মাছ শান্তিপ্রিয় জন্তু। তিমি মাছ না বলে তিমি জন্তু বলাই মানায়। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নাক দিয়ে ফোয়ারার মত জল ওপর দিকে ছিটোচ্ছে। আবার কেউ মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে ওপরে কিন্তু অতভারি দেহটাকে জলের ওপর সম্পূর্ণ তুলে রাখতে পারছে না। বিরাট ভারী পাথরের মত মাথা ও পিঠের কিয়দংশ ওপরে উঠেই ধপাস করে আছড়ে পড়ছে জলের ওপর। তারপর জলের ওপর ভেসে উঠছে তাদের বিরাট লেজ। মনে হচ্ছে দৈত্যাকৃতির আল্‌বাট্রোস (Albatros) ঢেউ-এর ওপর ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি তিমি মাছের অনেক দৃশ্য দেখেছি। গ্রীণল্যান্ড, আলাস্কা ও নিউজিল্যান্ডের দিকে। তিমি মাছের ভাসমান বিচরণ অনেক দেখেছি, কিন্তু একসাথে এত দল এর আগে আর দেখিনি। অবশ্য হবেই বা না কেন। আন্টার্ক্‌টিকাই তো তিমি মাছের আদিভূমি, এদের ক্রীড়াভূমি। তিমি মাছ জলের গভীরে চলে যায় খাবারের সন্ধানে। আধঘণ্টা এক ঘন্টা এবং কোন কোন বিশেষ ধরনের তিমি দু'ঘন্টা পর্যন্ত ডুব দিয়ে

থাকে। তিমি ঘন্টাখানেক জলের নীচে থাকার পর জলের ওপরে ভেসেই সে প্রশ্বাস ছাড়ার জোরে হাওয়ার সাথে সাথে পেটের সঞ্চিত জলও বেড়িয়ে আসে তারই ফলে সৃস্টি হয় তিমি মাছের ফোরায়ার। তিমি মাছের নাক মাথার ওপর দিকে কাজেই জল ছাড়ার সময় সুন্দর ফোয়ারা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। মনে হচ্ছে সমুদ্রের ওপর ছোট ছোট দ্বীপ থেকে ফোয়ারা ও জলের বাহার! মনোরম দৃশ্য।

তিমির খেলা আর দূরে বরফে ঢাকা দ্বীপ চারপাশে অনন্ত জলরাশির ঢেউ-এর নৃত্য দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি। পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে নতুন পরিবেশ মনে বার বার আনন্দের ধাক্কা দিতে লাগল। জাহাজ আরও এগিয়ে এল এবার দ্বীপের দৃশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বরফের পাহাড়গুলো যেন জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে সাদায় সাদা। দু'দিকে তিমির মেলা। তারই মধ্য দিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলেছে নতুন এক অজানা লোকে।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সানোভিচ্ প্রায় চেচিয়ে উঠল, ওই দেখ, ওই দেখ তিমি মাছটার পাশেই তার বেবী মায়ের সঙ্গে নিরাপদে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এই বেবী হোয়েল দিনে এক টন মায়ের দুধ খায়। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। জাহাজের এত কাছে প্রায় জাহাজ ছুঁয়ে তিমিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন তিমির ফোয়ারা প্রায় জাহাজের ওপর এসে পড়ছে। সানোভিচ্ আমার সাথে আধঘন্টা কাটিয়ে নীচে নেমে গেল। আমি একা অবজারভেটরী থেকে সেই ফোয়ারা ও তিমি মাছের লেজের আঁছার দেখতে লাগলাম।

জাহাজ আরও এগিয়ে এল, আন্টার্ক্টিকার আর একটি দ্বীপ। জাহাজ জেটিতে লাগল। আমরা প্রায় সবাইই নেমে পড়লাম। আমাদের দেখে রৌদ্র সেবনকারী কয়েকটি সীল বিরক্ত হয়ে ঘোৎ ঘোৎ করে মাথা ও লেজকে উঁচুতে তুলে নৌকোর মত দুলে পাশে সরে গেল। সীলগুলো বড় অদ্ভুত ধরনের জন্তু। তাদের বিরাট বিরাট দেহগুলো ভারী কয়েক টন মাসংপিণ্ড। স্থলভাগে চলার মতো ওদের কোন হাতিয়ার নেই। ঘন্টায় এক কিলোমিটারও এগুতে পারে না। স্থলভাগে আসে বিশ্রামের জন্য। পেংগুইনের মত এরাও দলবদ্ধভাবে থাকে তবে জলে এদের রূপ আলাদা—ভারী দেহগুলো জলে অনায়াসে ঘুড়ে বেড়ায়। একটু দূরেই চোখে পড়ল হাজার হাজার পেংগুইন। মনে হচ্ছে সুট প্যান্ট পরে জেন্টলম্যানরা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের স্বাগতম জানাবার জন্য। আমরা আধঘন্টা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার পর দ্বীপের ওপাশেই পেলাম পাথর। হাঠাৎ যেন আবহাওয়া পাল্টে গেল। হাওয়ায় পেলাম গরম ছোঁয়া। গাইডের পরামর্শে আমরা জুতো মোজা খুলে সমুদ্রের জল স্পর্শ করলাম। গরম জলের ছোঁয়া পেতেই সমস্ত শরীরটা হালকা হয়ে উঠল।

ডিসেপ্‌সন আইল্যান্ডের এই অংশটা বিরাট অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতির সামুদ্রিক চড়া। এর চারদিকে প্রায় গোলাকৃতির স্থলভাগ বাইরের ঝড় জল ও ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা করেছে। এই দ্বীপের চারদিকে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি রয়েছে, মাঝে মাঝে তাই অগ্নুৎপাত হয়। তারই ফলে এখানকার জলবায়ু গরম। জলের তলায়ও অনবরত উষ্ণ

প্রস্রবনের ফলে দ্বীপের চারপাশের জল প্রায় সব সময়ই গরম থাকে। তবে প্রচণ্ড শীতের সময় অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুর জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে বরফের চাদরে সব ঢাকা পড়ে যায়। এখানকার এই জলবায়ুর জন্যই সীল শিকারীরা এখানে ফ্লোটিং হোয়েলিং ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছিল।

আমাদের মধ্যে অনেকেই পোযাক ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পূর্ব নির্দেশানুযায়ী অনেকেই স্নান করার উপযোগী পোষাক নিয়ে এসেছিল। দক্ষিণ মেরুতে সমুদ্রে স্নান করা গল্প করার উপযুক্ত খোরাক। যেখানে চারদিকে সাদায় সাদা গ্লেসিয়ারের মহাদেশ। সেখানে উলঙ্গ হয়ে বা বেদিং স্যুটে জলে মাতামাতি করা, সাঁতার কাটা আর এক অভিজ্ঞতা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

প্রায় একঘন্টা পর আমরা পোষাক পড়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। সেখান থেকে মাত্র কুড়ি মিনিট চলার পর আমরা পেলাম পুরোনো তিমি মাছ ধরার ফ্যাক্টরী। আজ তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। এককালীন বহু প্রসংশিত অমানুষিক প্রচেষ্টায় সৃষ্ট সেই ফ্লোটিং ফ্যাক্টরী আজ আন্টার্ক্‌টিকার এক বিরাট লৌহ আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। আন্টার্ক্‌টিকার সৌন্দর্যে মানুষের সৃষ্টি এক কদর্য দৃশ্য। অ্যাডভেঞ্চারাস অহংকারী মানুষরা এইভাবেই সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভূমি এভারেস্টের আবর্জনা। তফাৎ হচ্ছে এই যে এভারেস্টের আবর্জনা এখন পরিষ্কার করা হচ্ছে। কিন্তু এখানকার এই স্থায়ী লোহার কারখানাগুলো আন্টার্ক্‌টিকার কলঙ্ক হয়েই থাকবে। জাহাজে ফিরলাম বেলা তিনটের সময়। আমাদের হেভি ব্রেকফার্স্ট দেওয়া হয়েছিল কাজেই অসুবিধা হয়নি। আমরা সবাই ডাইনিং রুমে বসতেই সকলের নাম ডাকা হল এবং সকলেই উপস্থিত। জাহাজ ছাড়ল এবং পেনিন্‌সুলার ধার ধরেই আমরা এগুতে লাগলাম। খাওয়া দাওয়ার পর আমি আবার এলাম মেইন ডেকে। একটু দূরে পেংগুইনদের ঝাঁক্ চোখে পড়ল আর আগের মতোই আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে চলল তিমি মাছের ঝাঁক।

সন্ধ্যের পর ভিডিও ফিল্‌মে দেখানো হল পুরোনো আমলের একটা ফিল্‌ম। মূল নায়ক ক্যাপ্টেন স্কট আর আমুন্ডসেন (Scot and Amundsen) বিখ্যাত ব্রিটিশ ও নরওয়েজিয়ান এক্সপ্লোরেটরস্।

১৯শে জানুয়ারি, সোমবার। মেইন ডেক, ভোর চারটে, দক্ষিণ মেরু আন্টার্ক্‌টিকা পেনিন্‌সুলা।

ভোরের আন্টার্কটিক, একটা অট্টালিকা ভেসে চলেছে। সীমাহীন অন্ত জলরাশির মধ্য দিয়ে। সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না। চারদিক সম্পূর্ণ নিঃশব্দ জাহাজের সামনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এই বাড়িটা মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ওপরে উঠছে আর নামছে। আজকে শীতের মাত্রাটা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে অর্থাৎ টেম্পারেচার হঠাৎ শূন্যের থেকে -১০°সেন্টিগ্রেডে (-10^0C) নেমে গিয়েছে। ভীষণ শীত বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। নাকের ওপর ভারী মাফলার চাপা দিয়েও মনে হচ্ছে শীত মানছে না। বাতাসের গতি

যেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। ভেবে ছিলাম ডেকেই "সূর্য্য প্রণাম" করে নীচে নামব। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলাম না।

আমি আমার কেবিনে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। জাহাজের যাত্রীরা সকাল আটটায় জলখাবারের জন্য আসতে থাকে। ব্রেকফার্স্টকে কেন্দ্র করে সকলকে গুড্ মর্নিং জানিয়ে জাহাজের দিন শুরু হয়।

ন'টার সময় ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল। গুড্ মর্নিং জানিয়ে তিনি মঞ্চে উঠে জানালেন : "আজ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কাজেই খোলা ডেকে যেতে হলে ভালভাবে মাথা, কান ঢাকা টুপি, হাত মোজা আর আনোরাক্ (Anorak) দিয়ে দেহটাকে ঢেকে বেরোবেন। বাইরের টেম্পারেচার এখন মাইনাস বারো। সূর্যের আলো প্রখর। আপনারা কভার ডেক্ থেকেই বাইরের দৃশ্য দেখবেন। সাবধানে থাকা ভাল। আজ এগারোটার সময় জাহাজের স্পেশালিস্ট তিমি ও পেংগুইন সম্পর্কে আপনাদের আরও তথ্য জানাবেন।" ক্যাপ্টেনের ঘোষণা অনুযায়ী সেনোভিচ্ আমাদের তিমি মাছগুলোকে দেখিয়ে শুরু করলেন তার বক্তৃতা।

—"তিমি শাবকরা দিনে পাঁচশ লিটার (500 litres) মায়ের দুধ পান করে। তিমি মাছের আরও কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে অন্যান্য জন্তুদের মত তিমি শাবকরা মায়ের দুধ টেনে খেতে পারে না। বাচ্চা তিমি মায়ের স্তনের কাছে এগিয়ে এলে মা তার স্তনকে শাবকের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ইনজেক্সনের মত দুধ ভর্তি করে দেয়। তিমি মাছ অন্যান্য জন্তুদের মত অটোমেটিক শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না। তাদের ইচ্ছামত যখন খুশি শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। আমি প্রথমেই লিখেছি যে তিমি মাছকে মাছ না বলে জন্তু বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ তিমি ডিম পাড়ে না সরাসরি সন্তান প্রসব করে। গর্ভকাল এগারো থেকে ষোল মাসের মধ্যে নির্ভর করছে শ্রেণীর ওপর। একটা তিমি সারা জীবনে পাঁচ বা ছ'টা তিমি শাবক প্রসব করে। প্রসবের পর তিমি শাবক দিনে একশ কিলোগ্রাম করে ওজনে বাড়ে। তিমি মাছের চিৎকার জলের মধ্যে প্রায় তিনশ কিলোমিটার (300 Km) দূর থেকে শোনা যায়। এই ডাক সাধারণতঃ অপজিট সেক্স-এর সন্ধানে। হ্যাঁ আর একটা আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে তিমি মাছের শাবক মাতৃগর্ভ থেকে যখন বেরোয় তখন লেজই প্রথম বহিঃষ্কৃত হয় অন্যান্য জন্তুদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাথা। মনে রাখতে হবে যে এই জাহাজ থেকে যে সব তিমির ঝাঁক দেখা যাচ্ছে তাদের ওজন কম করেও তিরিশ বা চল্লিশ টনের মত (30 or 40 Tonnes)। আমাদের এই জাহাজকে উল্টে ফেলতে পারবে না বটে কিন্তু ছোটখাটো জাহাজকে সহজেই উল্টে দিতে পারে। তিমি সত্যি শান্তিপ্রিয় জন্তু। মানুষের সঙ্গ সে ভালবাসে। জাহাজ থেকে পড়ে গেলেও সে মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু হাঙ্গরের চরিত্র ঠিক উল্টো। তিমি মাছ যখন হাঁ করে খাবার খায় তখন প্রায় দশ স্কোয়ার মিটার (10 Sq. M) সার্ডিন বা চিংড়ি মাছের ঝাঁক তার মুখের গহ্বরে ঢুকে যায়। অনেকটা হাঁসের মত মাছগুলোকে মুখে রেখে জলটাকে বের করে দেয়। আজ পর্যন্ত কোন মানুষকে আক্রমণ করেছে বলে শোনা যায়নি। জলের তলায় হঠাৎ

দেখলে মনে হবে যেন একটা মিনি সাব্‌মেরিন ভেসে চলেছে। যারা সমুদ্র বিশেষজ্ঞ বা সামুদ্রিক জন্তু নিয়ে গবেষণা করেন। তাদের মতে, তিমি মানুষের সঙ্গ খুব ভালবাসে। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজকাল তিমি শিকার আন্তর্জাতিক আইন বলে সীমিত করা হয়েছে। তবে ব্যবসায়ীরা সব সময়ই বেআইনি পথ বেছে নেয়। কারণ তাদের কাছে প্রাকৃতিক দুর্লভ ভূ-সম্পদ থেকে অর্থের মূল্য অনেক বেশি।

২০শে জানুয়ারি, মঙ্গলবার। আজকে বাতাস বইছে। আমরা একটা স্ট্রেটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আজকে জাহাজ কোথাও থামবে না। তিমি মাছের খেলা আজ বেশি চোখে পড়বে না। আমরা বিকেলের দিকে গেরলাস্ স্ট্রেটের ভেতরে পৌঁছবো। সেখানে তিমি মাছ বেশি চোখে পড়বে না কিন্তু চোখে পড়বে অসংখ্য পেংগুইন, পেংগুইন আর পেংগুইন। কাজেই তাদের সম্পর্কেও আরও কিছু তথ্য আপনাদের জানাই। আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই সারব। তবে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না। কারণ আমি আপনাদের জন্যই এসেছি। আজ জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না কিন্তু কাল সকাল থেকেই দেখতে পারবেন আন্টার্ক্‌টিকার স্থায়ী বাসিন্দা পেংগুইনদের। তাদের মূল রাজত্বে।

সকাল থেকে জাহাজ আন্টার্ক্‌টিকার মূল ভূ-খণ্ড বাঁদিকে রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে অসংখ্য জেন্টল্‌ম্যান আমাদের স্বাগতম জানাচ্ছে। পেট, বুক সাদা। পিঠ, ডানা ও মাথা কালো। পা কালো, গলা ও বুকের উপরের অংশে হলদে রং, দুই ঠোঁটের মধ্যে গাঢ় হলদে রেখা। মা ও বাবার প্রায় একই রূপ। তারই মাঝখানে শিশু। মাথা ও নাক একত্রে কালো, চোখ কালো, চারপাশে সাদা। মা ও বাবা দু'জনেই ঘন ঘন শাবকের দিকে তাকিয়ে তাকে প্রসংশার ভঙ্গিতে ঠোঁট দিয়ে মৃদু স্পর্শ করে আদর জানাচ্ছে। একমাত্র খাবারের সন্ধান ছাড়া কখনই অভিভাবকরা শাবক ছাড়া হয় না। অভিভাবকের স্নেহ-যত্ন আর সুরক্ষায় বেড়ে উঠেছে আন্টার্ক্‌টিকার মাঞ্চো সম্রাটের বংশধর।

King Penguin আন্টার্ক্‌টিকার এই পেংগুইনদের নাম। সাদা বরফের ওপর তাদের দেখে মনে হচ্ছে দ্বীপের খুদে মানুষগুলো তাদের উৎসবের পোষাক পড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দশ বারো জন নয়, শয়ে নয়, হাজার হাজার। এদের নাম মাঞ্চো পেংগুইন। পেংগুইন স্থায়ী বরফের স্থায়ী বাসিন্দা। উত্তর মেরুতেও পেংগুইন আছে তফাৎ সামান্য। উত্তর মেরুর পেংগুইনরা সামান্য উড়তে পারে আর দক্ষিণ মেরুর পেংগুইনরা উড়তে পারে না। ছোট ডানা, ডাঙ্গায় পিছলে পিছলে চলার সময় ডানা বৈঠার মত কাজ করে। আর জলে মাছের মতোই অবধা গতিবিধি। ডুব দিয়ে জলের গভীরে আনায়াসেই যাতায়াত করে। ইংরেজিতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর পেংগুইনদের পেংগুইনই বলে। কিন্তু ফরাসী ভাষায় দক্ষিণ মেরুর পেংগুইনদের বলা হয় মাঞ্চো (Manchot)। আমার পাশেই আর একজন বিশেষজ্ঞকে পেলাম, পিটার। আমেরিকান পেংগুইন স্পেশালিস্ট। সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "ওই দেখ দূরে ছাই রঙ ও কালো রঙের ছোট পেংগুইন গ্রুপ। ওগুলো সবই শিশু পেংগুইন।

মাঞ্চো ক্রেশ (Manchot Creche)। বড় পেংগুইনরা চলে গেছে খাবারের সন্ধানে শিশুদের রেখে গেছে একটা ক্রেশে। পেংগুইনরা দলবদ্ধভাবে বাস করে এরা সামাজিক জীব। মা বা বাবা ফিরে আসবে খাবার নিয়ে ডাকবে নিজ নিজ শিশুকে তারপর ঠিকমত যে যার নিজের শিশুকে খুঁজে তাকে খাবার দেবে ঠিক পাখির মতোই। মা বা বাবার গলার আওয়াজ শুনলেই শিশুও আওয়াজ করে। হাজার হাজার শিশুর মধ্যে ওরা এই গলার আওয়াজে ঠিক নিজের বাচ্চাকে খুঁজে নেয়। বাচ্চার পাশেই বাবা ও মা থাকে। আশ্চর্যের ব্যপার হচ্ছে যে এই হাজার হাজার শিশুর মধ্যে ঠিক নিজেরটাকে কিভাবে খুঁজে বের করে তা এখনও বিশেষজ্ঞরা ঠিক মত জানতে পারেনি। তবে গলার আওয়াজ স্বতন্ত্র সেটা ঠিক কিন্তু তা হলেও কাজটা সহজ নয়। বছরে একটাই ডিম পাড়ে—একটাই শাবক। বাপ মা দুজনে ওই একই শিশুর দেখাশুনা করে। খাবারের জন্য অন্যান্য পাখির মতোই বাবা ও মাকে ঘন ঘন যেতে হয় জলের গভীরে। প্রায় দু'মাস লাগে একটা মাঞ্চো শিশু বড় হতে। অন্যান্য পাখিদের মত এদের কিন্তু কোন বাসা নেই। মা ডিম পাড়ার পর তাকে পশমের তলায় পেটের গরমে তা দেওয়া হয় তারপর ডিম ফুটে ছানা বেরোবার পরও প্রায় দু'মাস হয় বাবা অথবা মার পেটের তলায় পশমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। একমাত্র খাবারের সন্ধান ছাড়া বাবা মা শিশুদের পরিত্যাগ করে না। বিকেলের দিকে সব মাঞ্চোরা তাদের নিজ নিজ শিশুদের দু'পায়ের মধ্যে পশমের মধ্যে ঢেকে রাখে। মাঝে মাঝে শিশুরা বেড়িয়ে আসে খেলার জন্য। মাঞ্চোদের এই ঝাঁকের দৃশ্য বড় চমৎকার। জলে এদের দ্রুত গতি কিন্তু স্থলে এদের চলাফেরা অতি ধীর। জাহাজ থেকে দেখতে সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে যখন এরা দলে দলে জলের তলা থেকে বরফের উঁচু দেওয়ালের ওপর লাফিয়ে ওঠে মনে হয় উড়ে আসছে। আর বরফের বাংকিস্‌ থেকে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে তখনও অতি সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এরা বরফের পাঁচিলের (বাংকিস্‌) ওপর দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক এক করে জলে ঝাঁপ দেয়।

মাঞ্চো পেংগুইনরা তাদের জন্মভূমি ছেড়ে আর কোথাও যায় না। দক্ষিণ মেরুতে যখন শীতের মাত্রা সত্তর ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে তখনও এরা স্থান পরিত্যাগ করে না। দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয় এদের বিশেষ ধরনের পশমের জন্য। প্রচণ্ড শীতে যখন খাবার পাওয়া অসম্ভব তখন এরা বরফের তলায় প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় সময় কাটায়। চলাফেরা না করার জন্য দেহের ক্যালরী ব্যয় হয় না। এটাই এদের মূল রহস্য।

দক্ষিণ মেরুর স্থায়ী পেংগুইনদের বলা হয় মাঞ্চো এম্পেরর (Manchot Emperor) ও মাঞ্চো রয়াল (Manchot Royal), মাঞ্চো পাপু (Manchot Papou), মাঞ্চো আডেলি (Manchot Adelie)। মাকারনি, জেন্তু ইত্যাদি। দক্ষিণ মেরুর চারদিকে আরও প্রায় দশ রকমের মাঞ্চো আছে। তাদের গায়ের রঙ, ঠোঁট ও আকৃতি অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে।

এখানে সমুদ্রের ঢেউ নেই। চারদিকের দৃশ্য শুধু জল আর বরফ। জলের ওপর বরফের পাঁচিল আর সেই পাঁচিলের ওপর মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে মাঞ্চো সম্রাটের

দল। ঠাণ্ডা বাতাস এখন প্রায় স্থির। আমাদের ডান দিকে ও বাঁদিকে বরফের দ্বীপ তারই মাঝে প্রণালী (Strait) ধরে ভেসে চলেছি এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে..।

২১শে জানুয়ারি বুধবার ১৯৯৮ সাল। জীবনের এক নতুন অধ্যায়। নতুন পাওয়া আমার ভূ-পর্যটন আজ সমাপ্ত হল। যত চেয়েছিলাম, পেলাম তার চেয়েও বেশি। সকালবেলা জাহাজের ডেকে এসে দেখি এক অবাক দৃশ্য। চিরসুন্দরের এক নৈবেদ্য চোখের সামনে দেখা দিল। একি সত্যি? পৃথিবীটা যে এত সুন্দর হতে পারে জানা ছিল না। এ সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করার ভাষা নেই। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে এই মহা সৌন্দর্য আমাকে পৌঁছে দিল আর এক জগতে। যে জগতে ভাষা নেই, শব্দ নেই, চিরনিস্তব্ধতার মধ্যে ভেসে উঠেছে এক সুন্দরতম দৃশ্য, এই দৃশ্য মন ও প্রাণে এনে দিল এক স্থায়ী শান্তি, মন হয়ে উঠল পরিপূর্ণ। একটা নয়নাভিরাম দৃশ্য এইভাবে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারকে পবিত্র করে পৌঁছে দিল জীবন সাধনার উচ্চ মার্গে। ডেক্ থেকে শুধু চেয়ে দেখা আর সেই দেখার পথ ধরে আমার অন্তর আর বাইরের জগৎ এক হয়ে গেল। যে দেখছে আর যা দেখছে দুই এর মধ্যে আর তফাৎ রইল না।

জলের ওপর ভেসে রয়েছে অসংখ্য আইসবার্গ। সূর্যের উত্তাপে সেই আইসবার্গের উপরিভাগ কিছুটা গলে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচু, মন্দির, পাহাড় আর অজস্র অজানা মূর্তি। জলের তৈরি শক্ত জমাট বরফ সূর্যের তাপে আস্তে গলছে, চোখের সামনে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন মূর্তি, নতুন দৃশ্য। গ্লেসিয়ারের রঙ কখনো উজ্বল নীল, কখনও নীল সবুজ, কখনো তুর্কোয়াজ। বরফগুলো যে ভাবেই গলুক না কেন দৃশ্যটা সব সময়ই নয়নাভিরাম। চারপাশে শুধুই জল আর তার ওপর ভাসমান এই আইসবার্গের সৌন্দর্য আমাদের সকলকে হতবাক্ করে দিল। বার বার মনে হতে লাগল, একমাত্র বিধাতাই এই ধরনের চিরসুন্দরের সৃষ্টি করতে পারেন। হে সুন্দর তোমাকে প্রণাম।

এই দ্বীপের নাম প্যারাডাইস আইল্যান্ড, জলপথের নাম প্যারাডাইস বে, প্যারাডাইস হারবার। স্বার্থক নাম। এই সুন্দরের স্পর্শে আমরা সকলেই সুন্দর হয়ে উঠলাম। জাহাজের যাত্রী ও নাবিক সকলকেই যেন এই সুন্দর দৃশ্য প্রেরণা দিয়েছে। সকলেই হাসিখুশি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে গ্রীটিং জানাচ্ছে, সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়। জাহাজে কোন রকম ঘোষণা করা হয়নি। ক্যাপ্টেন কোন রকম মন্তব্য করেনি। শুধু নিঃশব্দে রাত্রিতে জাহাজটাকে এই অংশে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের এই আন্টার্ক্টিকা ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, আমাদের সামনে উপহার স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক করা এই দৃশ্য দেখে ডেকের যাত্রীরা বিস্ময়ে মন্তব্য করতে লাগল : ওয়া! মারভেলাস! ওয়ান্ডারফুল! কেল্ মারভেই...

আমি বললাম সৃষ্টিকর্তার আর এক লীলা...। মনে পড়ল মোহরদির কণ্ঠে শোনা গানটা। "...সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর..."।

ব্রেকফার্স্টের জন্য ডাক পড়ল। এই সুন্দরকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু

গারসঁ (Garcon) আমাকে প্রায় জোর করে ভেতরে নিয়ে গেল। আমার টেবল্ মেট্ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার দেরীর জন্য ক্ষমা চাইলাম। কফি টোস্ট এর চেয়ে আমাদের বর্হিদৃশ্যের কথাই সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ক্যাপ্টেন খুব মোলায়েম সুরে ঘোষণা করলেন,

—আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌছেছি। প্যারাডাইস হারবার সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। বাইরের দৃশ্যই আপনাদের সাথে কথা বলবে। জাহাজ আজকে এখানেই থাকবে। লাঞ্চের পর জোডিয়াক নামানো হবে। আপনারা জোডিয়াকে চড়ে গ্লেসিয়ারের একদম কাছে গিয়ে ঘুড়তে পারবেন। জোডিয়াক গাইড্ আপনাদের সব ইন্স্ট্রাকশন দেবে। তাড়াতাড়ি ব্রেক্ ফার্স্ট সেরে এসে দাঁড়ালাম ডেকে। অবিশ্বাস্য এই অসীম সুন্দর শুধু দুচোখ ভরে দেখা। চারদিকের এই সুন্দর দৃশ্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এক নতুন পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিল। ছোটবেলায় প্রথম টাইগার হিল থেকে বরফে ঢাকা রঙিন সূর্যোদয় দেখে ভেবেছিলাম—পৃথিবীর এটাই শ্রেষ্ঠ দৃশ্য। কৈলাসনাথ ও মানসসবোবরে পৌছে ভেবেছিলাম, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্য ; ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স দেখে ভেবেছিলাম, এটাই তো নন্দন কানন ; সাহারায় সূর্য্যাস্ত, ভূ-মধ্যসাগরীয় কয়েকটা দ্বীপ থেকে সূর্যাস্তের অপরূপ রঙিন আকাশ দেখে ভেবেছিলাম এটাই তো শ্রেষ্ঠ দৃশ্য ; গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন থেকে ভগ্ন পৃথিবীর আর এক রূপ দেখে বার বার আশ্চর্য হয়েছি ; দেখেছি ভিকটোরিয়ার জলপ্রপাত, নায়াগ্রা আর ইগুয়াচ্ছুর ভয় ও আতংক মিশ্রিত সৌন্দর্য ; উত্তর মেরুতে দেখেছি বরফ ও গ্লেসিয়ারের অবিশ্বাস্য রূপ ; সৃষ্টিকর্তার লীলার যেন আর শেষ নেই। পৃথিবীতে চলাকালীন বারবার ভেবেছি, এটাই শ্রেষ্ঠ দৃশ্য। কিন্তু না আমার এই ছোট্ট মনের এই সীমিত চিন্তাধারা নেহাৎই ছেলেমানুষী মাত্র।

চোখের সামনের এই দৃশ্য অবর্ণনীয় যারা চোখে না দেখেছেন বা ছবিতে না দেখেছেন তাদের বলে বুঝানো অসম্ভব। জলের ওপর ভাসিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য নয়নাভিরাম মূর্তি। যাদের সৌন্দর্যের কোন তুলনা চলে না। ভয়ংকর নয়, এক ছন্দ ও ভাবের প্রকাশ মাত্র। আমি একা নয় আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুধু দেখতে লাগলাম, পৃথিবীতে হয়তো এরই জন্য আসা। এই চোখের দেখাই পৌঁছে দেয় "দর্শন এর উর্দ্ধস্তরে।

বেলা তিনটের সময় দুটো জোডিয়াক ভাসানো হল। এই মহানিস্তব্ধকে সম্মান দেবার জন্য জোডিয়াকে মোটর লাগালো না হাতে হাতে বৈঠা দেওয়া হল। সকলকেই সেফ্‌টি জ্যাকেট পড়তে হল। বারবার হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল জোডিয়াকের ওপর বেশি নড়াচড়া বা উত্তেজনায় যেন লাফালাফি না করা হয়। জোডিয়াক অতি মজবুত হলেও নড়াচড়া করলে উল্টে যাবার সম্ভাবনা। ডিস্ব্যালেন্স যাতে না হয় তার জন্য সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হল। তৃতীয় জোডিয়াকটি জাহাজেই রইল তাতে মোটর ফিট করে তৈরি রাখা হল এমার্জেন্সির জন্য। জোডিয়াকে চড়ে আমরা আরও কাছে এগিয়ে এলাম স্পর্শ করলাম সেই অবাক করা যাদু নগরী, শুরু হল আমাদের নিঃশব্দ ভ্রমণ।

প্যারাডাইস বে'র জল কাচের মত পরিষ্কার, বাতাস নেই। শুধু আমাদের বৈঠার শব্দ ছপ্ ছপ্ করে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। আর কানের কাছে যাত্রীদের মুভি ক্যামেরার গুঞ্জন আর ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ সেই পবিত্র ভূমির ছন্দপতন করছে।

আমরা ভাসমান ভাস্কর্যময় জলের যাদুনগরীর মধ্য দিয়ে গোলকধাঁধাঁর মত ঘুড়তে লাগলাম? গ্লেসিয়ারের রাজত্ব, সূর্য্যের তাপে গ্লেসিয়ারের ওপরের অংশ গলে যাচ্ছে। বাতাস আর সূর্য্য তাপের কারণে এখানে সৃষ্টি হয়েছে মাইক্রো ক্লাইমেট (Micro Climate)। ভাসমান আইস্‌বার্গগুলোর প্রায় আশি ভাগই জলের তলায়। মনে হচ্ছে গভীর জলের তলায় কোন এক মহান শিল্পী তার শিল্পকলাকে প্রদর্শনীর জন্য জলের ওপর তুলে ধরেছে। এই স্টাচুগুলোর ভিত্তি জলের তলায়। সবই অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। মসৃণ, কাচের মত পরিষ্কার, সাদা সবুজ আর নীল রঙের হালকা ছোঁয়া। কোনটা দু মানুষ উঁচু, কোনটা দোতলা সমান আবার কোনটা ছোটখাটো পাহাড়ের মত উঁচু। দেখতে অনেকটা জীবজন্তু, মানুষ, নগরী, পাহাড়, মেঘ অথবা অজানা কোন একটা কিছুর বাস্তব রূপ। এই সুন্দরকে কল্পনার মধ্যে ধরা যায় না, স্বপ্নাতীত তো বটেই। ক্যামেরার মধ্যে শুধু তার সামান্য সৌন্দর্য মাত্র ধরা পরে। শুধু দেখা দুচোখ ভরে দেখা। এই দৃশ্য দেখার জন্য মনের প্রসারতার প্রয়োজন হয় না। এই দৃশ্যই মনের প্রসারতা এনে দেয়। আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে এই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য একের পর এক দেখে চললাম। এই দেখায় ক্লান্তি নেই, শেষও নেই।

আমরা দুঘন্টা জোডিয়াক ট্যুর করে ফিরলাম আবার জাহাজে। আন্টার্ক্টিকা আমাদের দু'হাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ড্রেক প্যাসেজের সেই ভয়ংকর ঝড় আর ঢেউ—এখানে এই শান্ত-স্থির পবিত্র-সুন্দর দুই বিপরীত স্রোত—বিপরীত ধর্ম আমাদের জীবনের এক অমূল্য সম্পদ অব্যক্ত অভিজ্ঞতা।

সেদিন রাত্রিবেলা, মধ্যরাত্রির আলোয় আবার দেখলাম সৃষ্টিকর্তার আর এক লীলা। ভগ্ন গ্লেসিয়ারগুলোর ওপর রঙিন সূর্যালোক পড়ে এক মায়াবী রাজ্যের সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ আলাদা আর এক দৃশ্য, আর এক রূপ, আর এক উপলব্ধি।

মাটি, পাথর, ঝরনা, পাহাড়, সাগর, দ্বীপ, মরুভূমি তাদের রূপের ছোঁয়ায় মানুষ বার বার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এই প্রিয় ভূমণ্ডলের এই সর্বদক্ষিণ গোলার্দ্ধের এই শুভ্র মহাদেশের প্যারাডাইস হারবারের এই নয়নাভিরাম দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু জল বরফ আর বাতাস এত সুন্দর হয় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সেই সুন্দরকে আমি ডায়েরির পাতায় ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারলাম না।

২২শে জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৮ সাল। আন্টার্ক্টিকা প্যারাডাইস বে। গতকাল থেকে জলের ওপর ভাসমান বিভিন্ন আকৃতির আইসবার্গের রূপ দেখে আমাদের মন প্রাণ শান্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা সবাই মনের আনন্দে জাহাজের এদিক ওদিক ঘুড়ে হাজার বার দেখেও আরও দেখার প্রেরণা পাচ্ছি। জাহাজের গ্লেসিয়ার বিশেষজ্ঞ আমাদের সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন।

—প্যারাডাইস বে তে কোন রকম স্রোত নেই। মূল ভূখণ্ডের গ্লেসিয়ারের এক অংশ মহাসাগরের স্পর্শে ও সূর্যের উত্তাপে ধ্বসের আকারে সমুদ্রের জলে ভেঙে পরে। সেই পর্বতপ্রমাণ গ্লেসিয়ারগুলো আস্তে আস্তে বাতাস ও সূর্য্যের তাপে গলে গিয়ে সৃষ্টি করেছে প্যারাডাইস বে'র এই অবর্ণনীয় অপরূপ দৃশ্য। এখানে কোন কারেন্ট নেই, কাজেই টিটানিকের (বা টাইটানিক জাহাজ) মত গ্লেসিয়ারে ধাক্কা লাগার ভয় নেই। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন।

জলের ওপর ভাসমান আইস্বার্গ জোডিয়াক থেকেই দেখতে হবে। কিন্তু কোন মতেই তাতে আরোহন করা চলবে না। আইনবিরুদ্ধ এবং ভীষণ বিপজ্জনক। সুন্দর আকৃতির এই ভাসমান স্টাচুগুলো যত সুন্দরই হোক না কেন তাদের রূপের ছোঁয়ায় পদে পদে বিপদ। কারণ যে কোন সময় তা উল্টে পড়তে পারে। আর জলের নীচের অদৃশ্য অংশটার আকৃতি জানা নেই কাজেই জলে পড়লে তাতে আটকে যাবার সম্ভাবনা আর তার চেয়েও বিপদ এখানকার ঠাণ্ডা জল স্বচ্ছ পরিষ্কার কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডা। উপযুক্ত ডুবুড়ির পোষাক ছাড়া জলে পড়লে আর রক্ষে নেই। আজও আমরা জোডিয়াকে করে মনের আনন্দে আইসবার্গের মায়াপুরীতে ঘুড়ে বেড়ালাম। কোন অ্যাডভেঞ্চার নয়, কোন বাহাদুরী নয়, বাহবা নেবার কোন রকম প্রতিযোগিতা নেই। আমরা নিতান্তই টুরিস্ট। এই পৃথিবীটা যে কত সুন্দর সেটাই শুধু নয়ন ভরে দেখা।

রাত্রিবেলা জাহাজে সাউথ পোল পয়েন্টের ডকুমেন্ট দেখানো হ'ল। সাউথ পোল পয়েন্টে আছে একটা ডোম (Dome)। যার পুরো নাম আমুন্ডসেন-স্কট সাউথ পোল স্টেশন। পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ বিন্দু। এই ডোমটি তৈরি হয়েছে ১৯৭১ থেকে ৭৭ সালে মাত্র ৫০ মিটার ডায়মিটার (50 M in diameter) কিন্তু অত্যধিক ঠাণ্ডা। দূরত্ব ও পরিবহন সমস্যার জন্য এটি তৈরি করতে লেগেছে চার বছর। উচ্চতায় ১৫ মিটার (15 M high), সিলভার গ্রে এ্যালুমিনিয়ামে তৈরি। এই ডোমের মধ্যে আছে থাকার ব্যবস্থা, গবেষণাগার, খাওয়ার ঘর, রিক্রিয়েশন সেন্টার। আমুন্ডসেন-স্কট সাউথ পোল স্টেশন টুরিস্টদের জন্য নয় ওটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। ওখানে আটাশ জন লোকের সারাবছর বসবাস করার সব বন্দোবস্ত আছে। তবে শীতকাল সত্যিই কষ্টকর। ঘরের বাইরে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। চারদিক বরফে ঢাকা। আর এই স্টেশনটাও গ্লেসিয়ার মাউন্টেইন-এর ওপর, বরফের গভীরতা ২৮৫০ মিটার (2850 M)। অর্থাৎ বরফের ওপর অস্থায়ী অ্যালুমিনিয়ামের গোলঘর। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে কোন রকম প্লেন বা হেলিকপ্টার আসে না কাজেই এই ন'মাস বৈজ্ঞানিকদের থাকতে হয় সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে। নরওয়ে ও ব্রিটিশ এক্সপ্লোরারদের নামে যদিও এই স্টেশনটা, আসলে এটা সম্পূর্ণ পরিচালনা করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। স্টেশন হেড্ কে বলা হয় স্প্যাম্ (Spam, South Pole Area Manager) তিনি National Science Foundation-এর representative। ডোমের কাছে বারোটা দেশের বারোট পতাকা। স্পেশাল পারমিশন নিয়ে যে সব টুরিস্ট হেলিকপ্টার আসে তারা এখানে থাকে মাত্র আধঘন্টা অথবা একঘন্টা।

নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া থেকে টুরিস্ট এয়ার ট্যাক্সি বা প্রাইভেট প্লেন যাতায়াত করে। তবে খুবই কম। টুরিস্টরা যায় ফ্ল্যাগের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলার জন্য আর সাউথ পোল পয়েন্টে আসার উত্তেজনা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য।

ফিল্মের শেষে পর্যটকদের জানানো হল যে, ব্যয়বহুল এই স্কি প্লেনের ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং ক্যাপ্টেন স্পেশাল পারমিশনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন যদি কেউ ইচ্ছুক হন তাহলে উশুয়াইয়া থেকে সব বন্দোবস্ত করতে পারেন।

আন্টার্ক্‌টিকা ভ্রমণের আনন্দে আমরা সবাই আনন্দিত। আর দু'দিন যাবৎ যে মনভরা ভাসমান আইস্‌বার্গের দৃশ্য দেখছি এর পর কারুরই ইচ্ছা নয় বিরাট অর্থ ব্যয় করে আমুন্ডসেন-স্কট স্টেশন পরিদর্শন করা। আসলে জাহাজে আমরা সবাই পর্যটক, ভ্রমণবিলাসী। অভিযানের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত নই।

রাত ন'টার সময় আবার জাহাজ ছাড়ল।

২৪শে জানুয়ারি, আন্টার্ক্‌টিকার প্যারাডাইস বে। ভোরবেলা ডেকে এসে দেখি সামনের দৃশ্য আলাদা রূপ নিয়েছে। আমরা মেইনল্যান্ড ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছি। সাগরের ধারে মেইনল্যান্ডের বরফের পাঁচিল। পাঁচিলের বরফগুলো গলে যাবার সময় বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেওয়ালের গায়ে ফ্রেসকোর সৃষ্টি করেছে। আবার কোন কোন সময় অদ্ভুত ধরনের হ্যাংগিং (Hanging Cliff)-এর সৃষ্টি করেছে নয়নাভিরাম দৃশ্য। দূরে দেখা যাচ্ছে উঁচু পাহাড়। জাহাজ দাঁড়াল বরফের পাঁচিল ঘেঁসে।

ব্রেকফার্স্ট টেবিলে বসে সামনের দৃশ্য দেখা জীবনের এক পরম মুহূর্ত। ভাগ্যদেবতাকে বার বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমি ধন্য, আমার জীবন ধন্য। চিন্তা করতেও বিস্ময় লাগে যে আমি এখন পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তের এক অবিশ্বাস্য দেশে এসে হাজির হয়েছি। ভাবতে আরও আশ্চর্য লাগে যে, এই জল গ্লেসিয়ারের রাজ্যে সকালবেলায় টেবিল চেয়ারে বসে আরাম ও নিশ্চয়তার মধ্যে আনন্দে জলখাবার খাচ্ছি। কয়েক বছর আগেও ভাবতে পারিনি যে এখানকার এই আনন্দময় পরিবেশে বিনা পরিশ্রমে এসে পৌঁছতে পারব।

বেলা এগারোটায় ল্যান্ডিং-এর জন্য ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম। ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে আমরা চারজন জোডিয়াক নামালাম। দুদিন আগে এরকমই কথা হয়েছিল। একজন গাইড আর বাকি তিনজনের মধ্যে আমি যাত্রীদের টেক্‌নিকেল অ্যাডভাইসার। একজন আমেরিকান গ্লেসিয়ার এক্সপার্ট একজন জার্মানের এক্সপ্লোরার আর ফ্রান্সের অ্যাল্‌পাইন মাউন্টেনার। জাহাজে যাত্রী পরিচিতির পাতায় আমাদের নামের পাশে এরকমই বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ আমরা এই চারজনই উপযুক্ত পোষাক ও সরঞ্জাম নিয়ে জাহাজে উঠেছি। কাজেই যাত্রীদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা থাকলেও অনুমতি দেওয়া হল না। গাইডের ডাক নাম মিকা (Mika)। মিখাইলভ্‌ আসল নাম। সেই ধরল জোডিয়াকের মোটর। উঁচু জাহাজ থেকে মেইন ল্যান্ডের যে দৃশ্য দেখেছিলাম জোডিয়াকে চড়া মাত্র সে দৃশ্য অন্তর্ধান হল। আমাদের চারপাশে জল আর সামনের সুউচ্চ বরফের পাঁচিল। এই অঞ্চলের বরফ জমাট

কাজেই ইঞ্জিনের শব্দে বা ভাইব্রেশনে ফাটল ধরা গ্লেসিয়ার ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

জাহাজের যাত্রীরা ঝুঁকে পড়েছে আমাদের গুড লাক জানাবার জন্য। জোডিয়াক থেকে তাদের মাথাগুলো ছোট ছোট গুলির মত দেখতে লাগল। কিছুদূর এগিয়ে আমরা প্যারাডাইস আইল্যান্ডের পেছনে মেইনল্যান্ডের পাঁচিল ধরে এগুতে লাগলাম। জলের ওপরেই বিরাট জমাট বরফের পাঁচিল। মিকা অভিজ্ঞ গাইড। প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পর আমরা একটা ভাঙা পাঁচিল ধরে এগুতেই পেলাম উঁচুতে ওঠার পথ। জোডিয়াককে টেনে ওপরে তোলা হল। একটা জায়গায় রেখে আমরা ক্যাপ্টেনকে মোবাইল টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম আমাদের অবস্থিতি।

আমরা আইস্ সেল্‌ফের (Ice Shelf) পাঁচিল ডিঙিয়ে মূল ভূ-খণ্ডে দাঁড়িয়ে বুটে স্পাইক্ (Boot-spike) পরিয়ে নিলাম। তারপর পরস্পর পরস্পরকে রোপ্ চেনে আটকালাম। শুরু করলাম আমাদের আভ্যন্তরীন যাত্রা। পথ সমতল নয়। বরফের ওপর বরফের পাহাড়। বিপদের ঝুঁকি একদম নেই কিন্তু মনের মধ্যে উত্তেজনার এক আনন্দ স্রোত বইছে। একমাত্র মিকা বাদে আন্টার্ক্‌টিকার মূল ভূ-খণ্ডে এই আমাদের প্রথম বিচরণ। শক্ত বরফ কিন্তু পিছলে যাবার সম্ভাবনা নেই। প্রায় আধঘন্টা চলার পর আমরা থামলাম। আন্টার্ক্‌টিকা পেনিনসুলার অন্য দ্বীপে আমরা থেমেছিলাম। কিং জর্জ আইল্যান্ড ও ডিসেপ্‌সন আইল্যান্ডে আমরা বরফের সাথে পেয়েছি পাথরের ছোঁয়া। এখানে পাথর বা মাটিকে ছুতে হলে প্রায় দেড় হাজার মিটার বরফ খুঁড়তে হবে। এখান থেকে একদিকে বরফের আরও উঁচু পাহাড়ের দৃশ্য, আর অন্য দিকে অর্থাৎ সাগরের দিকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আইস্‌বার্গ। সাগরের মধ্যে একটা উল্টে যাওয়া আইস্‌বার্গ (বা আইস্‌বের্গ) (Overturned iceberg) দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম অতি সুন্দর ঝরঝরে আইস্‌বের্গ (Storm Cloud Iceberg)। আরও উঁচুতে উঠে দেখতে পেলাম বিভিন্ন ধরনের আইস্‌বার্গ, আমেরিকান আইস্‌বের্গ স্পেশালিস্ট মুরদক (Murdoch) আনন্দে হতবাক হয়ে শুধু বলতে লাগল "ওয়া!" (Oah!) 'ওয়া! লুক অ্যাট দ্যাট! লুক অ্যাট দ্যাট!' ওই দেখ ওটা হচ্ছে পুরোনো বরফ, ওটা হচ্ছে টেবুলার আইস্ (Tabular ice), ওটা ফ্রাক্‌চার আইসবের্গ (Fracture Iceberg), ওদিকে দেখ বিউটিফুল আইস্ ক্রীস্টাল (ice crystals)। আমার মনে হল মুরদকের আইস্‌বার্গের প্রাক্তন অভিজ্ঞতা এখানেই পরিপূর্ণ হল। এই বিচিত্র আইস্‌বার্গের দৃশ্য না দেখলে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের ক্যামেরায় যতদূর সম্ভব এই দৃশ্যগুলোর কিয়দংশ ধরে রাখার চেষ্টা করলাম। তারপর আবার আমরা শুরু করলাম উঠতে। গাইড্ বলল—এইভাবে আমরা যদি সরাসরি দক্ষিণে চলি তাহলে কুড়ি দিনের মধ্যেই সাউথ্ পোল পয়েন্টে পৌছবো। আমাদের অবশ্য সেই লক্ষ্য নেই। আমাদের উদ্দেশ্য দক্ষিণ মেরুর এই থিক্ গ্লেসিয়ার মাউন্টেনে বিচরণের অভিজ্ঞতা ও মানসিক আনন্দ উপলব্ধি করা। এই সামান্য অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের পুঁজিও সামান্য। তিন ঘন্টার এই পরিক্রমার জন্য আমরা সঙ্গে এনেছি পুরো একদিনের খাদ্যভাণ্ডার আর উপযুক্ত সরঞ্জাম টেন্ট ও রাত্রির পোষাক। বলা যায় না সব রকম

প্রস্তুতি সত্ত্বেও যদি আমাদের তিনঘন্টার পরিবর্তে তিরিশ ঘন্টা থাকতে হয়। জনমানবহীন পৃথিবীর দক্ষিণ কোণে যদি কোনক্রমে আঁটকে যেতে হয়—তাই এই পূর্ব্বব্যবস্থা। সাবধানের মার নেই। বরফের ওপর এই চলা আমাদের কারও কাছেই নতুন নয়, কিন্তু গ্লেসিয়ারের এই বিচিত্র রূপ আমাদের কাছে নতুন। তবে এই দৃশ্য একমাত্র গ্রীষ্মকালেই সাগর ঘেঁসা মূল ভূখণ্ডে (main Land) পাওয়া যাবে। এরপর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যাবে ততই একঘেয়েমী বাড়বে, অনেকটা উঁচু নীচু বরফে ঢাকা ঢিবি পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাওয়ার মত। অর্থাৎ যেমন পেয়েছিলাম সাইবেরিয়া সফরের সময়। আমরা নাম-অজানা পাহাড়ের ওপর উঠে চারিদিকে তাকিয়ে নয়নভরে দেখে ও ফটো তুলে আবার নীচের পথ ধরলাম। দড়ি আর স্পাইক ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে হয়নি। আইস্ এক্স স্যাকেই থেকে গেছে।

আমাদের জোডিয়াকে ফিরতে লাগল দু'ঘন্টা পয়তাল্লিশ মিনিট (2 Hrs 45 Mins)। সবশুদ্ধ বোট থেকে বোট পর্যন্ত লাগল চার ঘন্টার মত। কথা ছিল তিন ঘন্টার কিন্তু উপযুক্ত আবহাওয়া পেয়ে আমরা আরও এক ঘন্টা বেশি থেকেছি।

জাহাজে ফিরতেই সকলে অভিনন্দন জানালো। আবার অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কারণ আমাদের কোন বিপদ হলে জাহাজেরও চলা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের রেখে জাহাজ কিছুতেই ফিরে যেতে পারবে না।

ক্যাপ্টেন আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "জাহাজ কোম্পানির তরফ থেকে তোমাদের এই এক্সপেডিশনটা উপহার স্বরূপ দেওয়া হল।" ইউরোপ ও আমেরিকায় এই ধরেন গিফ্ট দেওয়ার পরিচয় এর আগেও পেয়েছি। উত্তর মেরু ক্রুজ, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ডাংকি ট্রেল, ভূ-মধ্যসাগরের মধ্যে আধঘন্টায় সাঁতার, ফুজি মাউন্টেনে ওঠার স্যুভনির, এই ধরনের বহু এক্সপেডিশন গিফটের সাথে আমি পরিচিত।

আমার কাছে আন্টার্ক্টিকার মূল ভূ-খণ্ডে কয়েক ঘন্টার থিক্ গ্লেসিয়ারে আরোহন উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে লিখে রাখলাম আর মনে ধরে রাখলাম সেখানকার অভাবনীয় বিচিত্র গ্লেসিয়ারের রূপ।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৯৮ লেম্যার চ্যানেল, আন্টার্ক্টিকা। ইংরেজী উচ্চারণ লেম্যার। আসলে ফরাসী শব্দ ঠিক উচ্চারণ ল্যোম্যার। দুপুরে জাহাজ আস্তে আস্তে ঢুকল ল্যোম্যার চ্যানেলে, ড্রেক প্যাসেজে সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া আজ পর্যন্ত আমাদের কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়নি অথবা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। গায়ে কাঁটা দেবার মতো কোন মুহূর্ত আসেনি। আজ হঠাৎ সেই মুহূর্তের সম্মুখীন হলাম। জাহাজ এসে পড়ল খুব সরু চ্যানেলের ভিতর। একদিকে গ্লেসিয়ার আইল্যান্ড আর একদিকে জলের ওর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে বিরাট উঁচু একটা পাহাড়। জাহাজ একটু বাঁদিকে অসতর্ক হলেই ধাক্কা লাগবে গ্লেসিয়ার আইল্যান্ডের বরফের পাঁচিলে, আর বাঁ দিকে ধাক্কা খেলে হয়তো বিরাট পাহাড়টা ভেঙে পড়বে জাহাজের ওপর। বিপদ দুদিক থেকেই। জাহাজ অতি সন্তপর্ণে এগিয়ে চলেছে। সকলেই নিঃশব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। জাহাজ চলেছে দুই পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সরু চ্যানেলের মধ্য

দিয়ে। সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে, কি জানি টাইটানিকের মত আমাদের অবস্থা হবে না তো?

সকলকে আশ্বস্ত করে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল—"আমরা এখন ল্যোম্যার চ্যানেলের ন্যারো প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমাদের বাঁদিকে বুথ আইল্যান্ড ও তার তিন হাজার ফুট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। আর ডানদিকে ক্রিস্টাল গ্লেসিয়ার আইল্যান্ড। ভয়ের কোন কারণ নেই। হাজার হাজার বছর ধরে এখানকার এই স্থায়ী বরফ যেমন ছিল তেমনি আছে। আমাদের জাহাজ সেখানে ধাক্কা খেলেও কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে এখানকার ক্রিস্টাল গ্লেসিয়ারের বাহার দেখুন। এই ধরনের দৃশ্য পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।"

কথাটা ঠিকই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ন্যারো প্যাসেজটা আরও প্রশস্ত হল। আমাদের সামনে ভেসে উঠল এক স্বর্গীয় দৃশ্য। পাঁচিলের ওপর থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। গ্লেসিয়ার গলে গিয়ে পড়ার সময় আবার জমে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য। আমাদের জন্য যেন অতি সুন্দরতম করে সাজানো হয়েছে এই জলভূমি। জাহাজ এগিয়ে চলেছে আর দুপাশে প্রদর্শনীর মত ক্রিস্টাল গ্লেসিয়ারের বাহার আমাদের মনকে আনন্দে ও উত্তেজনায় পাগল করে দিতে লাগল। ভেনিসে দেখা ঝাড়লণ্ঠনের প্রদর্শণী, ফ্রান্সের গ্রট্ দ্য দোময়াজেলে (Grotte De Demoiselle) এর স্ট্যালাক্টিড্ এ তুলনায় কিছুই নয়। সৃষ্টি কর্তার আর এক লীলা। আমার এই ছোট্ট জীবনকে দিনের পর দিন পরিপূর্ণতর থেকে পূর্ণতমর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর তুমি যে এত সুন্দর না দেখলে বুঝতাম না। আর এক উপলব্ধি।

প্রায় তিনঘন্টা ধরে সেই দৃশ্য দেখলাম। তারপর আস্তে আস্তে সে দৃশ্য অন্তর্ধান হল। বিকেলের দিকে আমাদের জাহাজ এসে পৌঁছল আর এক জগতে যেখানে জল বরফে পরিণত হয়েছে। আবজারভেটরী থেকে দেখে মনে হল জাহাজ আর এগবে না। এখন থেকে শুরু হয়েছে বরফ ক্রোভাস্‌ড্ আইস্ (Crevassed Ice), জলের ওপর ফাটল ধরানো বরফের স্তর।

সেদিন সারাদিন ধরে আস্তে আস্তে জাহাজ চলতে থাকল। সন্ধ্যের পর ঘোষিত হল যে আমরা সারারাত ধরে এই বরফের ওপর দিয়েই চলব তারপর সম্ভবতঃ ভোর বেলার দিকে আমরা আবার মুক্ত জলপথ (Free Waterway) পাব।

ঘোষণা শোনা মাত্রই আমি উঠে এলাম অবজারভেটরী ডেকে। সূর্যের রঙিন আলোয় ফাটল ধরা বরফগুলোকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। জাহাজ বরফ ঠেলে কখনও বরফ কেটে আবার কখনও তার ওপর চড়ে বরফ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। দৃশ্য দেখে মনেই হচ্ছে না যে আমরা সাগরের ওপর ভেসে চলেছি। মনে হচ্ছে বরফের ওপর দিয়ে আমরা রাস্তা কেটে এগিয়ে চলেছি। জাহাজ থেকে জল একদম দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে জাহাজটা বরফের মধ্যে আটকে পড়েছে।

সেদিন আমাদের সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় রাতের খাবার পরিবেষন করা হল। কারণ

মাঝরাতে শুরু হবে ড্যান্সিং ক্যাপটেনস্ পার্টি। কাজেই সবাই যে যার কেবিনে চলে গেল বিশ্রামের জন্য। মনে হয় সারারাত ধরে ড্যান্স চলবে।

আমি আবার উঠে এলাম অবজারভেটরীতে। আমার পরনে উইন্ডপ্রুফ আনোরাক (Windproof Anorak)। কাজেই মাঝে মাঝে জাহাজের ডেকে আসার অসুবিধা নেই। আন্টার্ক্‌টিকার গরমের রাত সূর্য ডুবেও ডুবছে না, ডেকের ওপর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে জাহাজের চাপে বরফ ভাঙার প্রচন্ড শব্দ। একটা দানবাকৃতি বুলডোজার এগিয়ে চলেছে তাকে বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। বিজ্ঞানের এখানেই জয়। যে ডেক্ থেকে সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ-এর তাণ্ডব নৃত্য দেখেছি সেইখানে দাঁড়িয়ে আজ দেখছি সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। জল এখানে জমাট স্তব্ধ তাকে কাটিয়ে সেই স্তরকে ভেঙে পিষে তার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এ এক মজাদার ভয়াবহ দৃশ্য...। ঘন্টাখানেক কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝলাম না। এ দৃশ্যে একঘেয়েমি নেই আছে অজানাকে জানার এক শিহরণ।

২৬শে জানুয়ারি, সোমবার আন্টার্ক্‌টিকা। রাত সাড়ে বারোটায় জাহাজের রেডিওতে বেজে উঠল সুন্দর এক ছন্দ। তারপরই আহ্বান এল, "আপনারা আসুন ক্যাপ্টেন আপনাদের ডেক্ লাউঞ্জে (Deck Lounge) আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন"।

একে একে যাত্রীরা সবাই ডেক্ লাউঞ্জে এসে জমায়েত হল। একটা মৃদু আলো জ্বলছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এটা সারপ্রাইজ পার্টি।

রাত বারোটা একচল্লিশ মিনিট, তারিখ ২৬শে জানুয়ারি, সোমবার। যাত্রীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝখানে গোলাকার একটা টেবিল। চারপাশের কভারে আন্টার্ক্‌টিকার মানচিত্র। হঠাৎ সম্পূর্ণ আলো নিভে গেল, মাঝখানে দেখা দিল একটা গোল সোনালী পাত্রে সত্তরটা জ্বলন্ত মোমবাতি। সবাই হাততালি দিয়ে সত্তরটা মোমবাতির আলোকে শুভেচ্ছা জানাল। ব্যাক্‌গ্রাউন্ডে সুন্দর একটা গানের সুর ভেসে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে সব আলো জ্বলে উঠল। ক্যাপ্টেন একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে বললেন যে, সত্তরটা মোমবাতি সত্তর ডিগ্রী সাউথ্ ল্যাটিচুড-এর প্রতীক, আন্টার্ক্‌টিক সার্কেল, ৬৬°৩২ সাউথে পড়ে আমরা আরও অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছি। সাউথ পোলের অভ্যন্তরে আমরা এসেছি। আপনারা দেখছেন যে বরফের স্তর আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছে। জাহাজের পথ এখানেই শেষ। এরপর শুধুই বরফের পাহাড় গ্লেসিয়ার। জলপথে এখন গোল হয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুড়তে হলেও আমাদের ব্যাক্ করতে হবে। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছেছি। আসুন আমাদের এই শুভ মুহূর্তকে স্বাগত জানিয়ে একসঙ্গে পান করি। ক্যাপ্টেন আপেখ্‌টিন (Captain Apekhtin) সশব্দে শ্যাম্পেইনের বোতল খুললেন। সবাই চিৎকার করে উঠল হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা। সকলের হাতে হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস বিলি করা হল। তারপর একসঙ্গে সকলে ক্যাপ্টেনের কথার রিপিট করলাম—সাক্‌সেস অফ্ আওয়ার বোট, সাক্‌সেস অফ আওয়ার ক্রু (Crew), সাকসেস অফ্ অল্ ভয়াজর (Voyageur)।

শ্যাম্পেনের সঙ্গে যুক্ত হল বিভিন্ন ধরনের লাইট ও হেভী স্ন্যাক্, বিভিন্ন ধরনের হোয়াইট্ ও রেড ওয়াইন, বিয়ার আর বিভিন্ন ধরনের ফলের রস।

ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের সাথে শুরু হল নাচ। আমি কিছুক্ষণ তাদেরসাথে থেকে তারপর উঠে এলাম অবজারভেটরিতে। রাত, কিন্তু পুরো অন্ধকার নয়। রাতের সেই রহস্যভরা আলোয় দেখলাম বরফের মাঠ, বরফের বিস্তৃর্ণ এলাকা তারই মাঝে অসংখ্য ফাটল। জাহাজ কখন মোড় ফিরেছে জানিনা। প্রতি মুহূর্তে জাহাজের অগ্রসর মাত্রেই ভেঙে পড়ছে বরফের স্তর আর তারই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। দেখে মনেই হয় না যে জলপথে এগিয়ে চলেছি। অদ্ভুত পরিবেশ অদ্ভুত শিহরণ! পৃথিবীর এই অজানা ভূ-খণ্ডে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে অনেক অনেক দূরে এক অন্য জগতে অন্য প্ল্যানেটে এসে পড়েছি। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক পর্যটকই এই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আমার ভাগ্যদেবতাকে বারবার প্রণাম করলাম। ধন্য হলাম সৃষ্টিকর্তার আর এক রহস্য সৃষ্টি দেখে। আমার এ জীবন ধন্য হল...। জাহাজের ওপর থেকে ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে সেই বরফ ভাঙার দৃশ্য দেখলাম। শেষে বাধ্য হলাম নামতে। ভীষণ ঠাণ্ডায় হঠাৎ দেখি আমার হাত প্রায় অবশ হবার যোগার। কেবিনে ফিরে এলাম। ওপরে নাচ জমে উঠেছে। কিন্তু আমি আর সেদিকে পা বারালাম না। মনে হচ্ছে বিছানা আমাকে ডাকছে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেলা এগারোটায়। এত দেরিতে ঘুম ভাঙা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। মনে হয় রাতের বরফ ভাঙার দৃশ্য দেখতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগেছিল তাতেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। বারে গিয়ে বসলাম। এক কাপ কফি নিয়ে আশে পাশে তাকিয়ে দেখি ঘর ফাঁকা। গারছঁকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, আনন্দোৎসব ভোর সাতটা পর্যন্ত চলেছিল। তারপর ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে সবাই শুতে গেছে। মনে হচ্ছে সবাই দেরিতে উঠবে।

আমি আবার এলাম অবজারভেটরিতে। ভারী প্যান্ট আর উইন্ডপ্রুফ জ্যাকেট, পরেছি। বাইরে এসে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দৃশ্য পাল্টাচ্ছে। জলের ওপর সেই ভারী বরফের চাদর উধাও হয়েছে। চারদিকে মাঝে মাঝে গ্লেসিয়ারের টুকরো জলের ওপর ভাসছে। সামনে জল কেটে জাহাজ আবার তার নিজস্ব গতি নিয়েছে। আমরা এখন বেলিঙ্গস্ হাউজেন সাগর (Bellings Hausen Sea) ধরে ফেরার পথ ধরেছি। আজ রাত্রিতে অথবা কালকেই পাবো আবার ড্রেক প্যাসাজ।

সন্ধ্যের সময় আমাদের সামনে আবার দেখা দিল কয়েকটা তিমি। জলের একঘেয়েমী থেকে তারাই আমাদের বাঁচাল। সেদিন রাত্রিবেলা আমার ডাক পড়ল ভারতীয় ভূ-পর্যটক হিসেবে। আমি যেন কিছু বলি। রিক্রিয়েশন রুমে উপযুক্ত আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে আমি শোনালাম আমার কয়েকটা পুরোনো গল্প, আর শেষে প্রশ্নোত্তর।

২৭শে থেকে ২৯শে জানুয়ারী, ড্রেক প্যাসেজ থেকে। আজ জাহাজের গতিতে বাধা দিচ্ছে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ। ডেকে বাতাসের মাত্রা আরও বেড়েছে। যাত্রীরা অধিকাংশই যে যার নিজের কেবিনে উপভোগ করছে। ক্যাপ্টেন সকলকে ছোট ছোট

দলে ভাগ করে বিভিন্ন আলোচনা চক্র বসিয়েছেন তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

জাহাজে আমাদের পরিশ্রমের কিছু করতে হয়নি তা সত্ত্বেও যাত্রীরা এত কাহিল হয়ে পড়েছে কেন? জিজ্ঞাসা করতেই গাইড উত্তর দিল যে, ক্লাইমেটিক কন্‌ডিশন। কিছু না করলেও শুধু আবহাওয়া ও জলপথে অতিক্রমের জন্য দেহের মেটাবলিজ্‌ম এর অনেক পরিবর্তন হয় তাই ক্লান্ত লাগে। ভগবানের দয়ায় আমার দেহ মন আগের মতই আছে কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি অধিকাংশ সময়ই বাইরে কাটিয়েছি।

আমাদের ছাব্বিশ তারিখে ফেরার কথা ছিল কিন্তু ড্রেক প্যাসেজে তিনদিন লাগল উশুয়াইয়া পৌঁছতে। জাহাজ থেকেই টেলিফোন করে দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে খবর দেওয়া হয়েছে।

ফেরার পথে জাহাজে বিভিন্ন ধরণের খেলা ও রিক্রিয়েশনের বন্দোবস্ত থাকাতে সেখানকার ভয়াবহ ঢেউ ও জাহাজের দোলন যাত্রীদের অনুভূত হয়নি তবে অনেকেই সীক্‌নেসে ভুগেছে।

উশুয়াইয়া পৌঁছবার ছ'ঘন্টা আগে জাহাজের ক্রুদের সঙ্গে যাত্রীদের মিলিত কক্‌টেল পার্টিতে ক্যাপ্টেন আশ্চর্য সংবাদ দিলেন—"যাবারপথে ড্রেক প্যাসেজের হাই উইন্ড এর জন্য জাহাজ প্রায় সাড়ে চারশ মাইল দূরে চলে গিয়েছিল তাই আমাদের প্রায় তিন দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল প্যারাডাইস বে'তে পৌঁছতে।" যাত্রীদের মধ্যে যাতে প্যানিকের সৃষ্টি না হয় তাই তিনি বলেননি, দুঃখিত। ড্রেক প্যাসেজে এই ধরনের বিপদাপদের জন্য নাবিকেরা সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। গাইড আমাকে অতি আপনভাবে বলেছিল, "একমাত্র তুমি ছাড়া যাত্রীদের মধ্যে আর কেউ সেই সামুদ্রিক ঝড় প্রতক্ষ্যভাবে উপভোগ করতে পারেনি। আমরা সেটা গোপন করে রেখেছিলাম।"

উশুয়াইয়া পৌঁছলাম ২৯শে জানুয়ারি বেলা ১১টার সময়। বিদায়ের মুহূর্তটি ভাবাবেগে পূর্ণ হল। এই চোদ্দদিনে যাত্রীদের সঙ্গে যাত্রীদের ও নাবিকদের সঙ্গে যাত্রীদের একটা অদৃশ্য মায়াজালের সৃষ্টি হয়েছিল। আকর্ষণ-এর মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল শুভেচ্ছা আর ভালবাসার বন্ধন। বিদায় জানাতে গিয়ে অনেকেই পকেটের রুমাল বের করে চোখ ও নাক মুছতে লাগল। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ঠিকানা বিনিময় করলাম।

আমার ভ্রমণ জীবনের এক বিরাট স্বপ্ন এত সহজে পূর্ণ হল দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। বিনা পরিশ্রমে পেলাম এক বিরাট পুরস্কার।

উশুয়াইয়ায় একদিন থেকে পরের দিন আবার ধরলাম ফেরার পথ। ঠিক যে পথে এসেছিলাম সে পথেই ফেরা, উদ্দেশ্য সুইজারল্যান্ড।

ক্ষমাপ্রার্থী : আমি ভারত ছেড়েছি ১৯৬৭ সালে। তারপর দেশের সাথে আমার যাতায়াত ও যোগাযোগ যতটা সম্ভব বজায় রেখেছি আর ধরে রেখেছি আমার মাতৃভাষাকে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে ভাষাটাকে পুরোপুরি ধরে রাখতে পারিনি। তাই আমার এই ভুলে ভরা ডায়েরি লেখাকে ক্ষমা করবেন। প্রায় বত্রিশ বছর যাবৎ আমি দেশ ছাড়া।

দক্ষিণ মেরু
ANTARCTICA

(দ্বিতীয় অভিযান)

[পথ : সান্তিয়াগো - উশুয়াইয়া - ড্রেক প্যাসেজ - আন্টার্ক্‌টিকা সাউথ জর্জিয়া আইল্যাণ্ড - পোর্ট স্ট্যানলে]

নভেম্বর ৩০, ১৯৯৮ — ডিসেম্বর ১৭, ১৯৯৮

"ওয়ার্ল্ড ডিস্‌কভারার (WORLD DISCOVERER)" জাহাজে

পূর্বাভাস : ভাগ্য

ভাগ্য! ভাগ্যই বলবো নয়তো আমার মতো এক সাধারণ পর্যটকের পক্ষে জীবনে একবার আন্টার্কটিকা যাবার সুযোগ ঈশ্বরের এক বিরাট আশীর্বাদ সেখানে দ্বিতীয়বার যাবার কথা ভাবাও যায় না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ প্রস্তাব এল গাইড হিসেবে আমি আন্টার্কটিকা যেতে ইচ্ছুক কি না? প্রশ্নটাই বেখাপ্পা আমার মতো ভবঘুরেকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আমি ঘুরতে ভালবাসি কি না?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, চান্স পেলে এক্ষুনি যেতে রাজি।

কথা হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে একটা ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আমার সাইবেরিয়ার ইনুইট্ রিপোর্ট প্রসঙ্গে আলোচনা চক্রে। ম্যাডাম্ আনেত্-লিন্ এখানকার বন ও পশু সংরক্ষণ সমিতির নাগরিক প্রতিনিধি। তিনিই সভার শেষে আমাকে প্রস্তাব করলেন। তিনি জানালেন যে, সুইজারল্যান্ডের কয়েজন গ্লেসিয়ার স্পেশালিস্ট, স্কি মনিটার, অর্নিথলজিস্ট ও ফটোগ্রাফার মোট সাত জন আমেরিকা ও জার্মানদের সাথে এক যৌথ অভিযানে (Joint Venture) যাচ্ছে তাদের দলে একজন গাইডের দরকার। লক্ষ্য আন্টার্কটিকা।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। ম্যাডাম আনেত্-লিনকে বললাম, "আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই তবে খরচের ব্যাপারে একটু ভাবতে হবে।" তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন "সে বিষয়ে পরে কথা হবে তার জন্য ভেবো না, সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই কনসেসন করা হবে।"

এক সপ্তাহ পর জুরিখের মিঃ ওয়াল্টের নামে এক ভদ্রলোক টেলিফোন করে জানালেন যে তিনি ম্যাডাম লিনের প্রস্তাব অনুযায়ী সোসাইটি এক্সপেডিশনে কথা বলেছেন এবং তারা রাজি আছে। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোন। আপনাকে ডকুমেন্টেশন এবং যাবার শর্তাবলি ২/৩ দিনের মধ্যেই পাঠানো হচ্ছে।

—খরচার ব্যপারটা।

—আপনি সোসাইটি এক্সপেডিশনের চিঠিতেই সব জানতে পারবেন, মনে হয় আপনি প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হবেন।

সত্যি শুভ সংবাদ! তবুও আনন্দটাকে দমিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ডাকঘরের দিকে তাকিয়ে। ২৬শে সেপ্টেম্বর পর পর দুটো এক্সপ্রেস খাম এল। একটা এল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীয়াতেল শহর থেকে, তাতে আমাকে ওয়েলকাম জানানো

হয়েছে এক্সপেডিশন টিম এর পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় খামটি এসেছে জার্মানের ব্রেমেন শহর থেকে তাতে বিভিন্ন শর্তাবলী ও ফর্ম ফিল্‌আপ্ করে দুদিনের মধ্যেই পাঠাতে হবে। প্রত্যেকটা কাগজ খুঁটিয়ে দেখে আমার আনন্দের স্রোত হঠাৎ থেমে গেল। অংকের পরিমাণ দেখে। আমার খরচ পড়বে প্রায় দশ হাজার ডলার। আর এয়ার টিকেট খরচ তার সাথে যুক্ত হবে। হিসেব করে দেখলাম কম করেও পনেরো হাজার ইউ. এস. ডলার। প্রথমেই ভাবলাম—নাঃ আমার দ্বারা অসম্ভব। একটা বিরাট হাতাশা! আমি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাদাম লিনকে টেলিফোন করলাম। তিনি সব শুনে বললেন, "তুমি ফর্মটা ফিল্ আপ করে পাঠিয়ে দাও, টাকা পয়সার দায়িত্ব আমাদের।"

বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পরদিন থেকেই শুরু হল টেলিফোন, ফ্যাক্স আর ই-মেইল-এর আনাগোনা। শেষে ঠিক হল আমি যাচ্ছি সুইস্ গ্রুপের গ্রুপ লীডার হয়ে। আমার খরচ তারাই দেবে। আমার কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে যে আমি মাত্র দশ মাস আগে আন্টার্কটিকায় গিয়েছিলাম। আর ইনুইট্ (এস্কিমোদের বর্তমান নাম) কন্‌ফারেন্সের জন্য আমার পরিচয়ে বেড়িয়েছে যে আমি উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে অভিজ্ঞ।এদের ভাষায় অভিজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট বললেও আমি নিজে কিন্তু এ কথাটাকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারিনি। আমি এই দুই মেরুর খবরাখবর রাখবার চেষ্টা করি এই মাত্র। অবশ্য এক সাধারণ পর্যটক হিসেবে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়। মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। বিদেশে এটাই মজার সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো। গাফিলতির কোন স্থান এখানে নেই।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বছরের পর বছর প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা করে মাত্র এই বছরের গোরার দিকে ঘুড়ে এলাম আমার স্বপ্ন রাজ্যে। আর এখন মাত্র দু মাসের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে বেড়িয়ে পড়ার আহ্বান। আবার বলব একেই বলে ভাগ্য। আমার জীবনে এই ধরনের ঘটনা বার বার ঘটেছে। অনেক চেষ্টা করেও যে দেশে যেতে পারিনি বহু বছর পর হঠাৎ সুযোগ এসেছে বার বার সে দেশে যাবার।

যাত্রাপথ :

জেনেভাস্থ কুয়োনি (Kuoni) ট্রাভেল এজেন্সির ডিরেক্টর মিঃ ডিয়েনের এর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার ট্রাভেল ডকুমেন্ট তৈরি করার। তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। বলাই বাহুল্য যে Kuoni ইউরোপের সবচেয়ে বড় ট্রাভেল এজেন্সি।

অক্টোবর মাসের কুড়ি তারিখে মিঃ ডিয়েনের আমাকে তার অফিসে ডেকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিলেন। ভিসা, টিকিট, হোটেল ভাউচার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস। এক কাপ রিস্ট্রেটো পান করিয়ে জানালেন বঁ ভয়াজ্ (Bon Voyage)।

যাত্রা শুরু হবে ২৮শে নভেম্বর। জেনেভায় ফিরে আসা হবে ১৯শে ডিসেম্বর। পথ জেনেভা-জুরিখ-মাদ্রিদ-সাও পোলো হয়ে সান্তিয়াগো ডো চিলি। সেখানে একরাত্রি হোটেলে। তার পরদিন উশুয়াইয়া। উশুয়াইয়া থেকে জাহাজে

আন্টার্কটিকা। আবার ওই একই পথে ফেরা। ২৮ তারিখে রওনা হয়ে ৩০ তারিখেই পৌঁছতে হবে উশুয়াইয়া। জাহাজ আন্টার্কটিকার উদ্দেশ্যে উশুয়াইয়া বন্দর ছাড়বে ৩০ তারিখেই (৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮)।

ভৌগোলিক অবস্থান :

পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে হারিয়ে যাওয়া এক মহাদেশ। তিনটি মহাসাগরের জল যেখানে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তাদের নাম হারিয়েছে। প্রশান্ত, আটালান্টিক আর ভারত মহাসাগর পৃথিবীর সর্বদক্ষিণে তার রূপ পাল্টে ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হয়েছে তারই নাম আন্টার্কটিকা।

দক্ষিণ মেরু বা আন্টার্কটিকা কোন মহাদেশের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। বিরাট মহাসাগরের বেড়া দিয়ে মানুষের হাত থেকে আন্টার্কটিকের শুভ্র পবিত্রতা রক্ষা করা হয়েছে। দক্ষিণে ৫৭° দ্রাঘিমাংশ পেড়িয়ে পাওয়া যাবে দক্ষিণ মেরু।

যাতায়াত :

আন্টার্কটিকের চারপাশে তিন মহাসমুদ্র মিলে গিয়ে নাম নিয়েছে সাউদার্ন ওসেন (Southern Ocean)। শহর বা মনুষ্যবসতি নেই। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষদের জন্য খোলা নেই। তাদের ছোট এয়ারস্ট্রিপে টুরিস্ট প্লেন নামতে পারে না, আর নামলেও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। কাজেই বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া যাতায়াত প্রায় দুঃসাধ্য। আজকাল নিউজীল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি ও আর্জেন্টিনা থেকে জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবাইকেই আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হয়।

প্রথমবার আমি গিয়েছিলাম আর্জেন্টিনা হয়ে উশুয়াইয়া। এবার চিলির সান্তিয়াগো হয়ে উশুয়াইয়া।

যাত্রাশুরু

২৮শে নভেম্বর। জুরিখ এয়ারপোর্ট থেকে আমরা রওনা দিলাম। সুইজারল্যান্ড থেকে আমাদের গ্রুপে মাত্র ৮ জন। রাত ৭টা ২৫ মিনিটে সুইস্ এয়ার ফ্লাইট নং ৬৫৮ ঠিক সময় মতোই ছাড়ল। সুইস্ এয়ারের এয়ার বাস এ-৩২০ (A-320) একেবারে নতুন। সীটের প্লাস্টিকের গন্ধ এখনও পুরোপুরি রয়েছে, চমৎকার গদী, তিন রকম পজিসন, প্রত্যেকটি সীটের সামনে টেলিফোন। হ্যাংগিং টেলিভিশন। আর মাথার ওপর আলো-বাতাস আর কলিং বেল। ইকনমিক ক্লাসে ফার্স্ট ক্লাসের ব্যবস্থা। খাবার ও পানীয় নিয়ে এয়ার হোস্টেস্দের হাসিমুখে আনাগোনা সবই যেন নতুনভাবে যাত্রীদের আরামের জন্য সাজানো হয়েছে। আগে কিন্তু এত খাতির ছিল না পরে বুঝলাম যে, কয়েকমাস আগে কানাডায় সুইস্ এয়ারের মারাত্মক দুর্ঘটনাকে যাত্রীদের মন থেকে মুছে দেবার প্রাণপন চেষ্টা করা হচ্ছে। যাইহোক নতুন প্লেন নতুন কায়দায় আপ্যায়ন সব কিছু মিলিয়ে আমাদের সোয়া দুঘন্টা খুব আরামে কেটে গেল. আমরা মাদ্রিদে পৌঁছলাম ৯টা ৪০ মিনিটে।

আমাদের প্লেন পাল্টাতে হল। ইউরোপ মহাদেশ ছেড়ে এবার যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায়। পাড়ি দিতে হবে আটলান্টিক মহাসাগর। লাগেজ সরাসরি চলে যাবে কিন্তু আমাদের বাইরে বেড়িয়ে আবার নতুন করে চেক্ ইন্ করতে হল। আমরা স্থান পেলাম চিলিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ্ এর চিলি ৭০১ নং ফ্লাইটে (linea Aerea Nacional Chile 701)। রাত ১১টা ৫ মিনিটে লান্ চিল্ (Lan Chile) মাদ্রিদ ছাড়ল। বোয়িং ৭৬৭-৩০০ ই-আর (Boeing 767-300 ER) বিরাট প্লেন দুশ পনেরো জন প্যাসেঞ্জার। ইকনমিক্ ক্লাস সুইস্ এয়ারের তুলনায় কম আরামের হলেও অল্প বয়সী এয়ার হোস্টেস্দের হাসিমুখ ও আপ্যায়নে আমরা খুশিই হলাম। টেলিভিশনে কয়েকটা ফিল্ম, হেড ফোনে ক্লাসিকেল ও জাজ্ আর খাওয়া দাওয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের শুরু হল আটলান্টিক অতিক্রম।

সকালবেলা ব্রেকফার্স্ট করার পরই প্লেন দক্ষিণ আমেরিকার আকাশে পৌঁছল। প্লেন থামল সাওপোলো। এ্যানাউন্স করা হল এখানে থামবে চল্লিশ মিনিটের জন্য। যাত্রীরা ইচ্ছা করলে ট্র্যান্জিট লাউঞ্জে পায়চারী করতে যেতে পারেন মাত্র আধঘন্টার জন্য। আমি প্লেনেই থেকে গেলাম। শুধু একটু বাইরে এসে এখানকার বাতাস উপভোগ করতে লাগলাম।

অনেকে নামল। নতুন যাত্রী উঠল। প্লেন পরিষ্কার হল, স্টাফ বদলি হল। তারপর আবার যাত্রা। এক ঘন্টা পর দেখা দিল আন্দেস পাহাড়। জানলা দিয়ে পাহাড়ের মাথা ডিঙোবার সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

২৯শে নভেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটায় লান্ চিল্ আমাদের নিয়ে সান্তিয়াগো এয়ারপোর্টে পৌঁছল। এয়ারপোর্টে কাস্টমস্ চেক্ পয়েন্ট পেড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই লা-টুর (Latour) ট্রাভেলিং এজেন্সির প্রতিনিধিরা আমাদের স্বাগত জানাল। লাগেজ আইডেনটিফিকেশন করার পর আমাদের সরাসরি হোটেলের বাসে তোলা হল। মালপত্রের পুরো দায়িত্ব ওরাই নিল।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছতে লাগল প্রায় চল্লিশ মিনিট। হায়াৎ রিজেন্সি হোটেল (Hyati Regency Hotel) ফাইভ স্টার এবং সান্তিয়াগোর অন্যতম প্রধান ভি-আই-পি হোটেল। কাজেই হোটেলের পুরো বিবরণ লিখে ডায়েরির পাতা ভরালাম না। হোটেলে স্বাদর অভ্যর্থনা পেলাম। দুপুরের খাওয়াটা সংক্ষেপেই সারতে হল। আড়াইটার সময় আমাদের সাইট্ সীং এর জন্য ডাক পড়ল। বেলা তিনটের সময় বাস ছাড়াল সিটি ট্যুরের জন্য। বলাই বাহুল্য বাসে উঠতেই শুরু হল গাইডের বক্তৃতা।

—"সান্তিয়াগো দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সেরা শহর। নাম সান্তিয়াগো দে চিলি (Santiago De Chile) অর্থাৎ সান্তিয়াগোই চিলি। সান্তিয়াগো চিলির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক রাজধানী। সান্তিয়াগোকে বলা হয় তিন মহাদেশের মিলনকেন্দ্র। এখানে দেখতে পাওয়া যাবে ইউরোপ ও নর্থ আমেরিকার অর্থনৈতিক ও আধুনিকতা আর দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেসের প্রাচীন ঐতিহ্য।

আমরা এখন চলেছি ও হিগিন্স্ ধরে (O'Higgins Avenue)। এটাই রাজধানীর প্রধান সড়ক। এককালে মাপোচো (Mapocho) নদীর একটা শাখা ছিল সেটা শুকিয়ে যাওয়ায় তারই ওপর তৈরি হয়েছে এই রাস্তাটা। সান্তিয়াগোতে পুরনো কলোনিয়াল যুগের অনেক ঘরবাড়ি দেখতে পাবেন। আমাদের সামনেই দেখুন সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো চার্চ। মূল গীর্জাটি তৈরি হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি (Half of the 16th Century)। ইউনির্ভাসিটির গঠনও চৎমকার ফ্রেঞ্চ আর্কিটেক্ট আম্‌ব্রোয়াজ হেনো (Ambroise Henault)। এই দেখুন "লা মনেদা" (La Moneda) প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস, তৈরি করতে লেগেছিল ১৫ বছর। শেষ হয়েছিল ১৭৯৯ সালে।

আমরা এবার শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছলাম। ছোট্ট একটা পাহাড়, সান্তা লুসিয়া হিল্ (Santa Lucia Hill)। এখান থেকে সান্তিয়াগো শহরের উৎপত্তি। এখানেই প্রথম ডন পেড্রো দে ভালডিভিয়া (Don Pedro De Valdivia) সান্তিয়াগোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সুন্দর বাগান, ঝরনা, আর চওড়া সুন্দর সুন্দর রাস্তাগুলো আজও অতীতের স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার দুর্গের চিহ্ন আজও সংরক্ষিত রয়েছে। এই দুর্গে শেষ স্প্যানিস্ গভর্নর মার্কো ডেল পন্থ (Marco Del Pont)। শহরের কেন্দ্র দিয়ে চলতে চলতে চোখে পড়ল সুন্দর সুন্দর পুরোনো বাড়ি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নেওক্লাসিকেল ম্যানসন প্যালেসিও কুজিনো (Neoclassical Mansion of Palacio Cousino), প্লাসা দে আর্মাস, কাসা কলোরাডো।..."

গাইডের কণ্ঠস্বর অগ্রাহ্য করে আমি জানলা দিয়ে শহরটাকে দেখতে লাগলাম। এক নজরে বলা যায় একটি আধুনিক সাজানো শহর। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল এখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। গাড়িগুলোর অবস্থাও খুব ভাল। সবই নতুন মডেলের। মনে হচ্ছে শহরবাসীরা হঠাৎ টাকা পেয়ে গাড়ি ও বাড়ি করেছে। প্রায় দেড়ঘন্টা শহর ঘুড়ে আমরা আস্তে আস্তে একটা নদীর ধারের রাস্ত দিয়ে শহর থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। প্রায় আধঘণ্টা পর একটা পাহাড়ি পথ ধরে উঠতে লাগলাম ওপরে। গাইডের কণ্ঠস্বরে আবার মন দিলাম :

—"আমরা এখন সান ক্রিস্টোবাল হিলে (San Cristobal Hill) উঠছি। এখান থেকে সান্তিয়াগো শহরের পুরো ভিউ পাবেন। এখন নভেম্বরের শেষ। এখানে স্প্রিং আরম্ভ হয়েছে। আর মাসখানেক পর এই ক্রিস্টবাল হিল পিক্‌নিক্ স্পটে পরিণত হবে। এই সবুজ পাহাড় ও পাহাড়ি ঝরনা গরমের সময় স্বর্গে পরিণত হয়।" পাহাড়ের সর্বোচ্চাংশে বাস থামল। আমরা নামলাম। অনেকটা দার্জিলিং-এর ম্যালের মত দৃশ্য এখান থেকে শহরের পুরো দৃশ্যটা চোখে পড়ে। প্রচুর ছোটখাটো চায়ের দোকান, স্যুভনির স্টল আর ছোট ছোট ভেন্ডাররা মেলার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেখানে আধঘন্টা পায়চারী করে এবার ফেরার পথ ধরলাম। সেখানে ভার্জিন মেরী সকলকে অভয় দিচ্ছেন। স্টাচুটি ফরাসী সরকারের উপহার। হোটেলে পৌছবার আগে সান্তিয়াগো সিটি হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট সেন্টারে এসে বাস থামল। চিলির হস্তশিল্প প্রদর্শণীর কক্ষ। হাতের কাজের মধ্যে অধিকাংশই ছোট ছোট পাথরের খোদাই মূর্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বেশি ভীড় হয়েছে চিলির স্বদেশী মদের স্টলে। এখানকার সুমিষ্ট হালকা রেড ওয়াইন আর স্ট্রং হোয়াইট ওয়াইন সকলকে টেস্ট করার জন্য বিলি করা হচ্ছে। সহাস্যে পরিবেশিকা সকলকে অনুরোধ করছে "চেখে দেখুন কেনার কোন প্রশ্ন নেই। আপনারা আমাদের অতিথি। সান্তিয়াগো ছাড়ার আগে এখানকার মদ না চেখে যাওয়া ঠিক হবে না।"

হোটেলে ফিরলাম সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা। সান্তিয়াগোয় এখন গরমের শুরু। অনেকেই কাপড় বদলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুইমিং পুলে। এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া চলবে না।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমাদের প্রথম ব্রিফিং শুরু হল। সোসাইটি এক্সপেডিশ্‌ন থেকে প্রতিনিধি এসে আমাদের স্বাগতম জানালেন। তারপর শুরু হল পরিচয়।

সবচেয়ে বড় দল এসেছে জার্মানী থেকে। তারপর গ্রেট্ ব্রিটেন, বেলজিয়ম , আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড ও ফ্রান্স। শ্লোভাকিয়ান দু'জন, সিঙ্গাপুর থেকে একজন আর আমি ভারতীয় একজন। মোট একশ আটত্রিশ জন প্যাসেঞ্জার। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক, ফটোগ্রাফার, জার্নালিস্ট, পর্বতারোহী ও একোলজিস্ট।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে কাল ভোর চারটের সময় উঠতে হবে। নীচে ব্রেকফার্স্ট তৈরি থাকবে। বাস ছাড়বে ঠিক পাঁচটায়। এয়াপোর্ট থেকেই পাওয়া যাবে পরবর্তী নির্দেশ। আবহাওয়া পাল্টাবার জন্য আমরা অনেকেই

বেড়িয়ে পড়লাম চিলির কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেস্ট্রোরেন্টের সন্ধানে। আমাদের হোটেলটা সান্তিয়াগোর সম্ভ্রান্ত কেনেডি এভেন্যুতে হওয়ায় এখানকার টিপিক্যাল রেস্ট্রোরেন্ট পাওয়া গেল না। তার বদলে পেলাম বিরাট সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স। প্যারিসের নাম করা সুপার মার্কেট লা-ফাইয়েতের অনুকরণে এবং ওই নামেই পেলাম একটা সুপার মার্কেট। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম চিলির মত একটা দেশে এই ধরনের লাক্সারী সুপার মার্কেট। ভেতরে শুধুই যে সাজানো ও চোখে চমক ধরা আসবাবপত্র তা নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ইউরোপকেও হার মানায়। সেখানেই পেলাম রেস্ট্রোরেনট ভিলেজ। দোতলায় শুধুই রেস্ট্রোরেন্ট। সব রকমেরই রেস্ট্রোরেন্ট, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান, স্প্যানিস, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, পিট্‌সা হাট আরও ছোটখাটো প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশটি স্ন্যাক্‌ ও কফি শপ্‌। এখানেও হতাশ হতে হল— চিলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন রেস্ট্রোরেন্টই নেই। আমরা ফ্রান্স ও ইটালীর রেস্ট্রোরেন্টে ঢুকে ইউরোপীয়ান মেনু নিয়েই নিজেদের সন্তুষ্ট করলাম। বিরাট এই সুপার মার্কেটের ভেতরেও আশেপাশে এবং সারাদিনে সান্তিয়াগোর চারদিকে ঘোরার সময় কোন রকম দৈন্যতা চোখে পড়ল না। সাজানো-গোছানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহরের কোন দেওয়ালে কোন রকম গ্রাফিতি শ্লোগান, ভিখিরী গরীব লোক যেন শহর থেকে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। আমরা হোটেলে ফিরলাম প্রায় সাড়ে এগারোটায়।

৩০শে নভেম্বর, সোমবার, সান্তিয়াগো, চিলি। ওয়েক আপ রিং হল ভোর চারটে পাঁচ মিনিটে। আমরা প্রায় প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। রাত্রে শোবার আগেই মালপত্র ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছিলাম। মুখ ধুয়ে হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে ঘর ছাড়লাম। ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি ব্রেকফার্স্টের বিরাট আয়োজন। তবে ডিমের দাম দেখে অবাক হয়ে গেলাম। হাফ্‌ বয়েল পোচ বা বয়েল একটা ডিমের দাম চার ইউ. এস. ডলার। সান্তিয়াগোর কারেন্সিকে বলা হয় পেসেতো। চারশ তিরিশ পেসেতো সমান এক ইউ. এস. ডলার।

হোটেল থেকে ঠিক সময়েই বাস ছাড়ল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। বিরাট এভেন্যু বাঁ দিকে আন্দেজের ন্যাড়া পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চল্লিশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে। ব্যাগেজ চেক্‌ ও পাশপোর্ট কন্ট্রোল খুব সহজেই হয়ে গেল। এয়ারপোর্টটায় কোন তাড়াহুড়ো ভিড় বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক এয়াপোর্টের মত টেনসন নেই। সবই ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। সকলেরই হাতে যেন প্রচুর সময়। আটটার সময় আমাদের গেট খুলল। চার্টার্ড ফ্লাইট কাজেই তাড়াহুড়ো একদম নেই। লান্‌চিল্‌ বোয়িং (Lan Chile) আটটায় সান্তিয়াগোর মাটি ছেড়ে উড়ল। সরাসরি দক্ষিণমুখী যাত্রা। প্রথম প্রথম বাঁদিকে সবুজ পাহাড়, ডানদিকে প্রশান্ত মহাসাগর তারপর প্লেনটা আন্দেসের ঠিক ওপর এসে পাহাড়ের মাথা ডিঙোতে লাগল। আমি প্লেনের বাঁদিকে সীটে বসেছি। জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম। নীচে মেঘলা আকাশের জন্য পাহাড়ি সৌন্দর্য সব সময় দেখতে পেলাম না। প্লেনে দেওয়া হল আবার হেভি কন্টিন্টোরল ব্রেকফার্স্ট। জানলা দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখি মেঘের

ফাঁকে ফাঁকে বরফে ঢাকা পাহাড়ি সৌন্দর্য আর অসংখ্য হ্রদ ও নদীর খেলা। নীচে পাহাড়ের ছাদ মাঝে আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া ও মেঘের আনাগোনা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। কোথা দিয়ে কেটে গেল প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা। হঠাৎ ডিং ডং আওয়াজ করে সংকেত হল সীট বেল্ট বাঁধার জন্য। তারপর নারী কণ্ঠে ঘোষিত হল—"আমরা উশুয়াইয়া এয়ারপোর্টের কাছে এসে পড়েছি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ভূমি স্পর্শ করবো।"

...হঠাৎ ধাক্কা খেলাম সকলকে চমকে দিয়ে প্লেন ট্রাক্টারের মত হোচট খেয়ে উঠল। মনে হল হঠাৎ যেন হাইওয়ে ছেড়ে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলেছি। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাইরে ঘন কুয়াশা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্লেনটা কাঁপছে হঠাৎ যেন আমাদের সামনে বেড়া দিয়ে আমাদের পথে বাধা দিচ্ছে প্রকৃতিদেবী হঠাৎ যেন বলে উঠলেন "যেতে নাহি দিব..."। ল্যান্ডিংয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে গোঙাতে গোঙোতে সরাসরি ওপরে উঠতে লাগল। হঠাৎ বাঁদিকে দেখতে পেলাম পাহাড়ের একটা পাঁচিল। সেই পাঁচিল ধরে আমরা ওপর উঠতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ আবার ঘন কুয়াশার মধ্যে আমরা হারিয়ে গেলাম। তারপর উন্মুক্ত আকাশে উঠে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বুঝলাম ল্যান্ডিং ফেল করেছে। কয়েক মিনিট দম নিয়ে তারপর আবার শুরু হল দ্বিতীয়বার অবতরণের চেষ্টা...। প্লেন কেঁপে উঠল। যাত্রীরা পাশের সহযাত্রীকে আঁকড়ে ধরল ভয়ে। সকলের গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে...। অ্যাডভেঞ্চার যারা ভালবাসে তাদের কাছে এটাই হল আন্টার্কটিকা অভিযানের শুরু।

এবার জানলা দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম সমুদ্রের ঢেউ ছোঁয়া দৃশ্য। ঘন কুয়াশাকে এড়াবার জন্য প্লেন প্রায় সমুদ্রের লেভেলে নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে যেন যে কোন মুহূর্তে সমুদ্রের ওপর আছড়ে পড়বে। নীচে এয়ারস্ট্রীপের বদলে সমুদ্র। যাত্রী মাত্রেই আতঙ্কের কারণ। অভ্যস্ত যাত্রীরা জানে যে বিপদের সময় একমাত্র জলভাগই ল্যান্ডিং-এর উপযুক্ত। সমুদ্রের ঢেউগলোও যেন কেঁপে উঠেছে। পৃথিবীর শেষ সীমান্তে এসে আমাদের এই দুরবস্থা হবে কয়েক মিনিট আগেও বুঝতে পারিনি। অবতরণের আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করে প্লেন আগের মতোই স্থলভাগের পাহাড়ের পাঁচিল ধরে সরাসরি ওপরে মুক্তির পথ ধরল। পরিষ্কার আকাশে লান্‌চিনের দক্ষ পাইলট নিজেকে একটু সামনে নিল। প্রস্তুত হল আর একবার অবতরণের চেষ্টায়। আবার কাঁপুনি, ঝাঁকুনি। প্লেনের বাঁদিক ডানদিক হেলা। প্লেন নেমে এল প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর। এখানে ঘন কুয়াশার আবরণ নেই। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি শুধু জল। ঢেউ-এর কয়েক ফোটা জলও হুবলোতে আছাড় খেল। হঠাৎ একটা বিরাট ঝাঁকুনি। প্লেনের চাকা স্পর্শ করল উশুয়াইয়ার স্থলভাগ। তারপরই সরাসরি ব্রেক। রানওয়েতে রান করার সুযোগ পেল না। প্লেন থামল। উশুয়াইয়া এয়াপোর্টে আমরা পৌঁছলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে একটু দেরী হল। সকলেই স্তব্ধ। প্লেন থামল, কিন্তু যাত্রীদের ওঠার কোন চেষ্টা নেই। সবাই যেন সীটের সঙ্গে আটকে গেছে। নারীকণ্ঠে ঘোষিত হল : "আমরা উশুয়াইয়া এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছি। অত্যধিক বাতাস আর

কুয়াশার জন্য ল্যান্ডিং-এর অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিল না। দুঃখিত। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। লান্‌চিলের ওপর আপনাদের আস্থার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। আন্টার্কটিকা থেকে ফিরে আসার পর আবার আমরা আপনাদের নিয়ে পৌঁছে দেবো সান্তিয়াগো দে চিলি। বঁ ভয়াজ! (Bon Voyage)"

প্লেন থেকে বেরোতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে আমাদের স্পর্শ করল। এই ধরনের আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যাইহোক কোন রকমে নিজেদের সামলে নিয়ে এয়ারপোর্টের হলঘরে এসে বাঁচলাম। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী এয়ারপোর্টে চারটে বাস ও গাইড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অত্যধিক ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য এয়ারপোর্টের বাইরে পায়চারি করা সম্ভব হল না। তবে এক নজরে মনে হল সমুদ্রতীরেই এই এয়ারপোর্ট আর অন্যদিকে পাহাড়। সমুদ্রের হাওয়া পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। আমাদের মালপত্র নিতে হল না। লোকাল গাইড ও ট্রাভেল এজেন্সিরাই সে দায়িত্ব নিল। বাসে আর্জেন্টিনা টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের গাইড আমাদের স্বাগতম জানিয়ে বলল যে আবহাওয়া খুবই খারাপ। ঝড় জল ও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই সরাসরি আমাদের রেস্ট্রোরেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে।

বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় বাসের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা গেল না। আমরা সরাসরি পাহাড়ের ওপর উঠে এলাম। একটা নরওয়ে টাইপের রেস্ট্রোরেন্টে আমরা এসে ঢুকলাম। হলঘরের মাঝখানে একটা বিরাট কাঠের উনোনে পরপর তিনটে আস্ত ভেড়ার মাংস ঝলসানো হচ্ছে। এটাই আর্জেন্টিনার এই অংশে ট্রাডিশনাল বারবেক্যু (Barbecue)। সান্তিয়াগোতে আমরা পেয়েছিলাম ৩০° সেন্টিগ্রেড আর এখানে মাত্র ১° সেন্টিগ্রেড। আবহাওয়ার বিরাট পরিবর্তন। সালাড-রোস্টেড মীট-ডেসার্ট (Salad, Roasted Meet) আর কফি (Dessert Cofee) খেয়ে আমরা আবার বেড়িয়ে পড়লাম।

আধঘন্টা পর আমরা এলাম টিয়েরা ডেল্ ফুয়েগো ন্যাশন্যাল পার্কে (Tierra Del Fuego National park) বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে আগুনের জাতীয় পার্ক। আতপর এলাম পাহাড়ের স্টীম রেলরোড স্টেশনে। অনেকটা দার্জিলিং-এর মতো। সেখানে ফটো তুলে ও স্যুভনির কিনে আমরা আবার রওনা দিলাম। বলাই বাহুল্য যে এই স্টেশনটাই পৃথিবীর সর্বদক্ষিণের রেলওয়ে স্টেশন। চলতে চলতে গাইড বনের বুনো হরিণ, ম্যাজেলানিক উড্‌পেকার (Magelanic Wood pecker), বন বিড়াল, বিভিন্ন ধরনের কবুতর, আর বুনো রাজহাঁস দেখার জন্য বার বার আমাদের থামিয়ে সবিশদ জানাতে লাগল—"এখানকার কাঠ জ্বালিয়ে আদিবাসীরা তার চারদিকে জমায়েত হত। দূর থেকে নাবিকেরা সেই আগুন দেখে এ অঞ্চলের নাম দিয়েছিল আগুনের দেশ অগ্নিস্থান। বনের এক রকম চেরী জাতীয় বুনো ফলের রস ব্যবহার করতো বিভিন্ন ধরনের ওষধির জন্য। নীরোগ থাকার ও একশ বছর বেঁচে থাকার অব্যর্থ ওষুধ..."। নদী ও সুন্দর লেকের ধার দিয়ে চলতে চলতে গাইড বলে যেতে

লাগলো এখানকার বৈশিষ্ট। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থামায় আমাদের চারদিকে দেখার সুবিধা হল। তবে হাওয়ার জন্য বাইরে থাকা সম্ভব হল না। অবশেষে আমরা আবার এলাম উশুয়াইয়া শহরে। নরওয়ের মডেলে সাজানো ছোট ছোট বাড়ী। আর্জেন্টিনা সরকার স্বদেশ ও বিদেশের টুরিস্টদের উৎসাহিত করার জন্য অল্প ট্যাক্সে জমি কেনা ও বাড়ি করার পরামর্শ ও অনুমতি দিচ্ছে। আগে এটা ছিল মাছ ধরার একটা বন্দর। আর যাতায়াতের পথে বণিকদের বিশ্রাম কেন্দ্র। আজকাল টুরিস্ট সিটি। আন্টার্কটিকা যাবার সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা এখানেই আছে।

বিকেল ৫টার সময় আমাদের বাস এসে থামল। সরাসরি বন্দরে আমাদের জাহাজ ওর্য়াল্ড ডিসকভারারকে পেলাম ঠিক আমাদের সামনেই। বিরাট করে লেখা ওয়েলকাম টু ওর্য়াল্ড ডিসকভারার। বাতাস একটু কমেছে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে তাই সরাসরি বাস থেকে নেমেই সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম জাহাজের ডেকে।

বিরাট জাহাজ, সেমি আইস্ ব্রেকার। তৈরি হয়েছে ১৯৭৪ সালে। জার্মানের ব্রেমেরহাভেন (Bremerhven)-এ। নতুনত্ব আনা হয়েছে ১৯৭৪ সালে। লম্বায় ৮৭ মিটার, চওড়ায় ১৫.২০ মিটার (15.20 M)। জলের নীচে গভীরতা ৪.৪৫ মিঃ (4.45 Draught), ওজন ৩.৭২৪ টন (3724 rt.), ম্যাক্সিমাম স্পীড ১২.৮ নটিক্যাল কি.মি. (12.8 kt.)। দুটো শক্তিশালী ইঞ্জিন। Two Non-reversable Mak-8M Diesel Engines, Driving A Kamewa, Variable Pitch Propeller, Total Output : 2 × 2.400 BHP at 500 rpm.। আমি ইঞ্জিনের এর বেশী বিবরণ দিতে পারব না কারণ সেটা আমার বিদ্যার বাইরে।

ক্যাপাসিটি : ১৩৮ জন প্যাসেঞ্জার। নাবিক ৭৫ জন, রেস্ট্রোরেন্ট সমেত সবশুদ্ধ ৭৩টি এয়ার কন্ডিশন্ড কেবিন আর প্রত্যেকটি কেবিনেই টয়লেট ও শাওয়ার, তিনটে স্যুট।

জাহাজের যাত্রীদের জন্য : ডিস্কভারার লাউঞ্জ ১৪০ জনের সীট, লিডো লাউঞ্জ ৭৮ জনের সীট, সিনেমা ও লেকচার হল ১২০ জনের সীট, অবজারভেসন লাউঞ্জ ২০ জনের সীট। মার্কোপোলো রেস্ট্রেরেন্টে রয়েছে ১৫৪ জনের সুন্দর বসার ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি হলঘরই চারদিকে ভিজিব্‌ল প্লেকি-গ্লাস দিয়ে বাঁধানো। তাছাড়া রয়েছে দুটো বার, ড্যান্স ফ্লোর, লাইব্রেরী, বিউটি পার্লার, বুটিক, সানডেক রিসেপ্‌সন ডেস্ক।

সেফটির জন্য রয়েছে ২টি লঞ্চ, ল্যান্ডিং-এর জন্য রয়েছে ১২টা জোডিয়াক্, এমারজেন্সি প্লেন, হেলিসার্ভিস ও রিসার্চ স্টেশন কন্টাক্ট। একটা আধুনিক জাহাজে যা যা দরকার তার কিছুরই অভাব নেই। আমাকে দেওয়া হয়েছে এয়ার কন্ডিশন কেবিন নং ২২৩। ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম আমার লাগেজ এসে গেছে। পাশে নজরে পড়ল আর একটি বেড মানে ডবল বেডেড রুম। একটা বিছানার ওপর লেখা ম্যাদাম আনেত-লিন্ আর একটা বেড়ের ওপরও রয়েছে আমার নাম। আশ্চর্য হলাম, বুঝলাম ম্যাদাম লিন-এর কারসাজি। যাইহোক আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। কেবিনে দুটো বেড, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, শাওয়ার, টয়লেট, টেলিফোন, রেডিও আর ফুলসেট

এমারজেন্সি ইকুইপ্‌মেন্ট। এর আগের বার এসেছিলাম তারাসোভা জাহাজে। বর্ত্তমান জাহাজটি সে তুলনায় আরও বিরাট আর আধুনিক এলাহি ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাদাম লিন প্রবেশ করল। একগাল হেসে বলল আমি নিরুপায়। এ যাত্রায় আমার বদ স্বভাবকে তোমায় টলারেট করতেই হবে। আনেত্ নামেই এখন থেকে সম্বোধন করার জন্য সে অনুরোধ করল। বয়সে ও আমার থেকে বড়। পূর্ব পরিচয় থাকাতে জটিলতার সৃষ্টি হল না।

রাত ৮টায় জাহাজ ছাড়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য ঝড় ও সামুদ্রিক বিপদের জন্য পোর্ট অথরিটির পারমিশন পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেন সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"আমরা প্রস্তুত কিন্তু পোর্ট অথরিটির বিনা অনুমতিতে আমরা পোর্টের বাইরে যাবার পাইলট পাব না কাজেই ডিপার্চার ডিলেড়্...।"

রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়া করে আমরা শুতে চলে গেলাম। রাত সাড়ে দশটায় রেডিও এ্যানাউন্স হল : বোফোর স্কেল অনুযায়ী বাতাসের গতি দশ। এ অবস্থায় উশুয়াইয়া হারবার মাস্টার বন্দর বন্ধ করে দিয়েছে। রাত দুটোর আগে বন্দর ত্যাগ করা অসম্ভব।

মঙ্গলবার ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৮। আজ ৯৮ সালের শেষ মাস। জাহাজের দোলায় ঘুমটা ভালই হয়েছে আর জাহাজের দোলাতেই ঘুম ভাঙল। বিছানা থেকেই আলতো ভাবে জানলার ভারী পর্দা তুলতেই বাইরের আলোয় চোখ ধাঁধাঁ খেল। একটু সামলে নিয়েই ভাল করে বাইরে উঁকি মারলাম। ঢেউ আর কারেন্ট নয়। জাহাজটা এগিয়ে চলেছে দূরে উশুয়াইয়ার দৃশ্য উধাও হয়ে ধু ধু করছে পাহাড়ের দিগন্ত। আনন্দে মন নেচে উঠল। আমাদের আন্টার্কটিকা যাত্রা হল শুরু। আমি তাড়াতাড়ি এবং নিঃশব্দে গরম জামাটা গায়ে চাপিয়ে উঠে এলাম ডেকে। চারদিকে দিনের আলো। বীগল চ্যানেল ধরে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। ঢেউ এখন যদিও অশান্ত কিন্তু জাহাজের অগ্রগতিতে বাঁধা সৃষ্টি করেনি। লিডো লাউঞ্জে (Lido Lounge) সাড়ে ছটায় চা, কফি, টোস্ট, বিস্কুট তৈরি আছে। সেখানে সেলফ্ সার্ভি। হাতে গমর কফি নিয়ে আমরা ভোরের যাত্রীরা উপভোগ করতে লাগলাম প্রাতঃকালীন আবহাওয়া।

সকাল ৮টায় ওয়েক্ আপ কল্ করা হল। মার্কোপোলো ডাইনিং রুমে দেখা হল আনেতের সঙ্গে। কি সুন্দর প্রভাত! সত্যিই বটে! শুরু হল আমাদের দিনের সূচী।

৯টা সময় পুল ডেকে সবাইকে ডাকা হল। ল্যান্ডিং-এর জন্য স্পেশাল বুট, পার্কা (Parka), পিঠের ব্যাগ ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা করার জন্য এবং সকলের উপযুক্ত পোষাক আছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হল।

তারপর লেকচার হলে এল পরিচয়ের পালা। জাহাজে যারা লেকচারার হিসেবে এসেছেন তাদের পরিচয় দেওয়া হল। একোলজিস্ট ডন প্যাটী (Ecologist Don Pattie), বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর এসেছেন নর্দার্ন অ্যালবার্টা ইনস্টিট্যুট অফ্ টেক্নলজি (Northern Alberta Institute of Technology) থেকে। আন্টার্কটিকা এক্সপেডিশনে আটবার এসেছেন। প্রফেসর গ্রেগ্ হোমেল (Greg

Homel) অর্নিথলজিস্ট (Ornithologist) এবং ফটোজার্নালিস্ট এসেছেন ইউনিভাসিটি অফ্ হাওয়াই (Howaii), প্রফেসর জন হেইন্‌বোকেল (John Hein Bokel), এ্যাকোয়াটিক একোলজিস্ট (Aquatic Ecologist) এসেছেন বার্লিংটন ট্রিনিটী কলেজ (Trinity College in Burlington Vermont) থেকে, এই নিয়ে চতুর্থবার আন্টার্কটিকায়।

চলার পথে এরাই অভিযাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবে বিশেষ করে যেখানে শিক্ষাগত প্রশ্ন।

জেনারেল কোঅর্ডিনেটর ইয়ান। জোডিয়াক্ ইনচার্জ এমে (Ame)। আর আমরা চারজন গ্রুপ লীডার বা গ্রুপ কোঅর্ডিনেটর। আমরা সকলের সাথে সকলে পরিচিত হলাম। খুব সংক্ষেপে এবং কোন রকম বিশেষণ যোগ না করে। তারপর আমাদের নতুন করে প্রতীজ্ঞা করতে হল : আমরা ইয়াটোর (IAATO*) লিখিত আইন মেনে চলব। এনভায়রনমেন্টাল কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলব, আন্টার্কটিকার জীবজন্তু উদ্ভিদ ও যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করব, ১৯৯১ সালের আন্টার্কটিক আইন মেনে চলব ...ইত্যাদি।

দুপুরের দিকে জাহাজের পেছনে দেখা দিল দুটো বিরাট কালো ভ্রূ আলব্রাতোস (Black-Browed Albatross), বিরাট পায়ড়া জাতীয় এক রকম পাখি (Sourthern Giant Petrels), চিল জাতীয় পাখি (King Shags) আর বিভিন্ন ধরনের গাল্‌স (Kelp Gulls)। তিনটের সময় জাহাজের ডানদিকে দেখা দিল সেই কুখ্যাত কেপ্ হর্ন। হাজার হাজার নাবিকের প্রাণহানি হয়েছে এই কেপ্ হর্ন পাড় হতে গিয়ে। জলের মধ্য থেকে হঠাৎ যেন দৈত্যাকৃতি গণ্ডারের সিং ভেসে উঠেছে। নাবিক ও বণিকদের ইতিহাসের পাতায় লাল কালি দিয়ে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেন কুক্, ম্যাজেলান ফ্রান্সিস (Francis Drake) ও অন্যান্য পৃথিবী বিখ্যাত নাবিকদের ডায়েরির পাতায় পাওয়া যায় এই কেপ্ হর্নের ঝড়, স্রোত আর ঢেউ-এর তাণ্ডব নৃত্যের কথা। ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে আমি কয়েকটি ছবি তুললাম আর আমার ভিডিওতে ধরে রাখলাম কেপ্ হর্নের রূপ। কেপ্ হর্নের পরই আমাদের জাহাজ সরাসরি মোড় ঘোড়াল দক্ষিণের দিকে। ক্যাপ্টেন উলরিস লাম্পে (Capt. Ulrich Lampe) ঘোষণা করলেন : "আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যে ড্রেক প্যাসেজে প্রবেশ করবো। সমুদ্র অশান্ত ড্রেক প্যাসেজে এটাই স্বাভাবিক তবে ঢেউ-এর উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম।"

মার্কোপোলো লাউঞ্জে আমাদের আমেরিকান মেনু সার্ভ করা হল। তার মানে নামেই খাদ্য স্বাদে নয়।

বুধবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৮, ড্রেক প্যাসাজ। ফ্রান্সিস্ ড্রেক (Francis Drake) নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ নাবিক ১৫৭৭ (1577) সালে ম্যাজেলান স্ট্রেট্

*International Association of Antarctic Tour Operators

(Magelan of Strait) পাড় হতে গিয়ে ভীষণ ঝড়ে কেপ্ হর্ন এলাকা থেকে তার জাহাজকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই ভয়াবহ প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গমে। তিনিই বলতে গেলে প্রথম ইউরোপীয় বণিক যিনি এই পথে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে আসেন। তার আগে নাবিকেরা দক্ষিণ আমেরিকার সর্বদক্ষিণের ম্যাজেলান স্ট্রেট দিয়ে যাতায়াত করতো। ফ্রান্সিস ড্রেক ১৫৭৭ থেকে ১৫৮০ সালে তার জাহাজ গোল্ডেন হিন্দ (Golden Hind) নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

সকালবেলা থেকে ড্রেক প্যাসেজের ঢেউগুলো যেন তাদের ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। যখন তখন জাহাজে ধাক্কা মেরে জাহাজটাকে নাড়া দিচ্ছে। ফলে ব্রেকফার্স্টের সময় টেবিলে কমলা লেবুর রস আর কফির কাপ নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি আরম্ভ করেছে। টেবিল ক্লথগুলোকে রক্ষা করা গেল না। একটু অসাবধান হলেই কাপগুলো কাৎ হয়ে পড়ছে। প্রথম প্রথম যাত্রীদের হাসি ঠাট্টা আর বেয়ারাদের হাত থেকে উপচে পরা তরল পদার্থ দেখে তাদের প্রতি তির্যক বাক্য ছুড়ে দেওয়া যাত্রীদের সময় কাটাবার একটা চমৎকার উপাদান হয়ে দাঁড়ালেও শেষের দিকে যাত্রীরা নিজেরাই এই সামুদ্রিক আবহাওয়ার বলি হয়ে পড়ল। দুপুরবেলা খাবার ঘরে আসতে গিয়ে অনেকেই মাথা ঘুড়ে পড়ল। বিকেলের দিকে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। ঢেউ আরও ওলোট-পালটভাবে জাহাজকে ধাক্কা দিতে লাগল। রাত্রিবেলা টেবিলে খাবারের প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও যাত্রীদের সংখ্যা সত্যিই কম।

ইচ্ছা সত্ত্বেও অবজাভেটরি ডেকে সবাইকে পাওয়া গেল না। ড্রেক প্যাসেজ ভয়াবহ নৌ-পথ। উত্তরে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশ, একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর আর দক্ষিণে দক্ষিণমেরুর শুরু। চারদিকের চার রকম স্রোত, তাপমাত্রা আর জলবায়ু এই ড্রেক প্যাসেজে মিশে সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক নৌ-পথ। আমাদের জাহাজ যত বড় আর আধুনিক হোক না কেন এই প্রাকৃতিক তাণ্ডব নৃত্যের হাতে তারও রেহাই নেই। অভিযাত্রীদের অধিকাংশই সী-সিক্নেসে কাতর হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে যুদ্ধ ফেরৎ আহত সৈনিকদের নিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলেছে কোন এক অজানা লক্ষ্যে। লাইব্রেরীতে পড়ার লোক নেই, স্যুভনির স্টলে বিক্রি হচ্ছে না, খাবারের টেবিলে খাবারগুলো সব পরেই থাকছে। বার বন্ধ।

আমার মত কয়েজন যাদের কোন সী-সিক্নেস নেই তারা এই সুযোগে নিজেদের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নিয়ে এলাম। জাহাজী পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত নেশা ও পেশার পরিচয় পেলাম। একটা জিনিস কমন পেলাম সেটা হচ্ছে, আমরা সবাই ভ্রমণ বিলাসী এবং ভ্রমণ পাগল।

যাত্রীদের সী-সিক্নেসের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে না দিয়ে সময় কাটাবার জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক আন্টার্কটিক অভিযানের ফিল্ম, সমুদ্র স্রোত, জলের আকার-আয়তন, দক্ষিণ মেরুর জীবজন্তু সম্পর্কে ফিল্ম দেখিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে লাগলাম। কিন্তু অসুস্থতার জন্য অভিযাত্রীদের কোন উৎসাহ নেই।

হোটেল ম্যানেজার রোমান হার্টম্যান অভিজ্ঞ লোক। তিনি মুখরোচক স্যুপ আর স্পেশাল ব্রেডটোস্ট সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। সী-সিক্‌নেস হলেও সম্পূর্ণ খালি পেটে থাকলে দুর্বল হবার সম্ভাবনা। রিসেপ্‌সন ডেস্কে অ্যান্টি সিক্‌নেস ট্যাবলেট বড় একটা বাটিতে সাজানো। লজেন্সের মতো যার যখন খুশি নিচ্ছে। ডাক্তারবাবু যদিও সুস্থ কিন্তু তার সহকারিণী নার্স নাস্তানাবুদ।

জাহাজের ওপর বারান্দায় যাত্রীদের যাতায়াতের অবস্থা দেখলে হাসি পায়। সবাই যেন মদের ঘোরে বেহুঁস হয়ে ঘুড়ছে। এক পা এগুতে গিয়ে দু'পা পেছচ্ছে। যাত্রীদের এই দুরবস্থার দিকে না তাকিয়ে জাহাজটা ঢেউ ডিঙিয়ে, লাফিয়ে, হোচট খেয়ে ডানদিক-বাঁদিক অথবা সামনে ঝুঁকে ওপরে উঠে দুঃসাহসিক ভঙ্গিতে এগিয়ে চলতে লাগল। ড্রেক প্যাসেজের এই অশান্ত ঢেউ আমাদের আন্টার্কটিক অভিজ্ঞতার এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

জাহাজের সবচেয়ে উঁচু হচ্ছে ক্রো নেস্ট (Crow Nest)। একসঙ্গে চারজন দাঁড়িয়ে তিনশ ষাট ডিগ্রীতে চারদিকে দেখা যায়। আমরা প্রায়ই সেখানে উঠে চারদিকের ঢেউয়ের তাণ্ডব নৃত্য আর জাহাজের দূরবস্থা দেখি। মাঝে মাঝে মনে হয় জাহাজটা ঢেউ-এর তলায় চাপা পড়ে যাবে আবার কখনও মনে হয় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়বে। শরীরে শিহরণ জাগাবার এবং নার্ভাস সিস্টেমকে পরীক্ষা করার এক চমৎকার জায়গা। ড্রেক প্যাসেজ পাড় হতে গিয়ে মনে হচ্ছে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

জার্মানীর দুজন অভিযাত্রী বলল—কি সাংঘাতিক, প্রথমবার প্লেনে ভাবলাম প্লেন ক্র্যাশ হবে এখন দেখছি জাহাজ ডুবির অবস্থা। তোমার কি মনে হয়? আমরা শেষ পর্যন্ত আন্টার্কটিকায় পৌঁছতে পারবো তো?

—ভয় কি, যদি জাহাজডুবি হয় তাহলে স্বর্গে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটানো যাবে, লোকসান কিছু হচ্ছে না কিন্তু...

আমার কথা শুনে তারা হাসিতে ফেটে পড়ল কিন্তু জাহাজের আর এক ধাক্কায় তাদের সেই হাসি বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নিজেদের সংযত করে রেলিং আঁকড়ে ধরল।

দেহ অসুস্থ হলেও মন কিন্তু সকলেরই শক্ত আছে। দুপুরে মার্কোপোলো লাউঞ্জে (Marco Polo Lounge) বসে বাইরের দিগন্ত বিস্তৃত অসীম জলরাশি আর ঢেউ-এর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। টেবিলের ওপর একর পর এক প্লেটে গরম খাবার আসতে লাগল।

বিকেলের দিকে ঢেউ-এর উচ্চতা কমে এল বাতাসের বেগও কম। লেকচার হলে আমাদের ডাক পড়ল। সমুদ্র বিশেষজ্ঞ জন্ হেইনবোকেল (Oceanography, John Heinboke) আমাদের আনন্দ সংবাদ দিল। আমরা এখন কনভারজেন্স লাইন (Antarctic Convergence) পাড় হচ্ছি। আন্টার্কটিক কনভার্জেন্স লাইন আন্টার্কটিক সারকেলের মত কল্পিত জলসীমা নয়। এটা বাস্তব ঘটনা। উত্তরে গরম
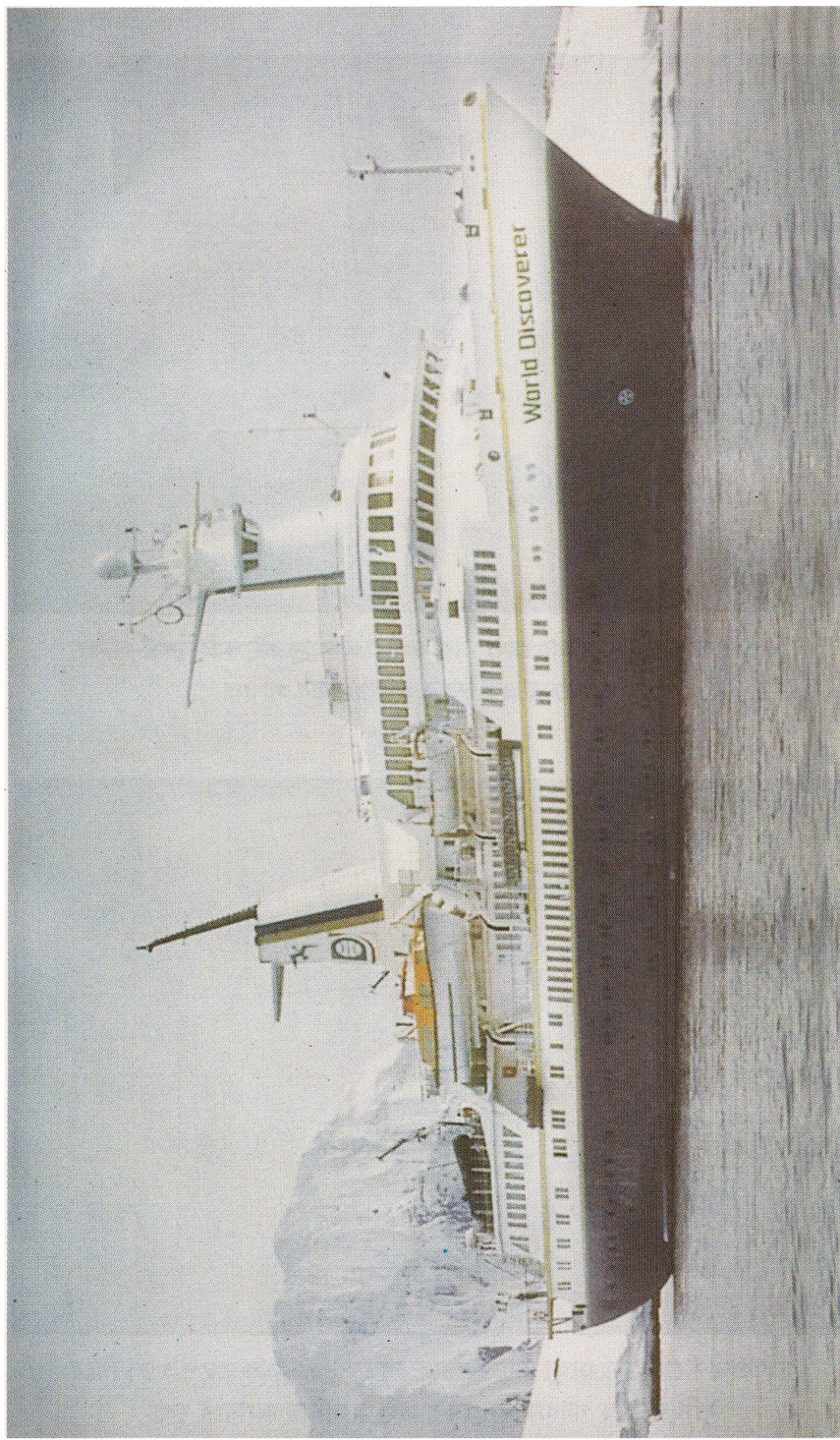
“Discoverer” দ্বিতীয়বার আন্টার্কটিক ভ্রমণের জাহাজ

চারপাশে জল আর জল তার ওপর ভাসমান এই আইস্‌বার্গ—
জীবনের এক নতুন অধ্যায় নতুন পাওয়া

পর্বতপ্রমাণ গ্লেসিয়ারগুলো আস্তে আস্তে বাতাস ও সূর্যের তাপে গলে গিয়ে
সৃষ্টি করেছে প্যারাডাইস বে'র এই অবর্ণনীয় অপরূপ দৃশ্য
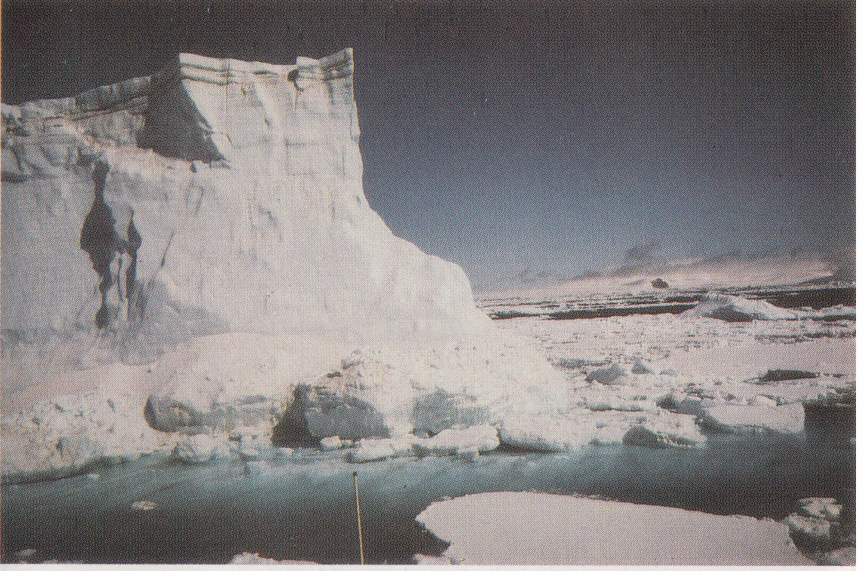
অবাক দৃশ্য! এক নজরে মনে হবে একটি শ্বেতপাথরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ।
চিরসুন্দরের এক নৈবেদ্য

জলের ওপর ভেসে রয়েছে অসংখ্য আইস্‌বার্গ

আমাদের আন্টার্কটিকা ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ আইস্‌বার্গ ও পেংগুইন

স্থলের উপর নয় জলের ওপর ভাসমান আইস্‌বার্গের মাত্র দশভাগের একভাগ দেখা যাচ্ছে। গঠন ও আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন আইস্‌বার্গের বিভিন্ন নাম। এই ধরনের আইস্‌বার্গকে বলা হয় টেবুলার আইস্‌বার্গ

মধ্যরাত্রে গ্লেসিয়ারের রঙিন ছবি—অভিযাত্রীদের এক বিস্ময়কর মুহূর্ত

আন্টার্কটিকার আকর্ষণ : গ্লেসিয়ার ও পেংগুইন

জল দক্ষিণের দক্ষিণ মেরুর জমাট বরফের যে অংশ উত্তরে তিন সমুদ্রের জলের স্পর্শে আস্তে আস্তে গলছে চারদিকে সেই বৃত্তাকার অংশটাকেই বলে ঠাণ্ডা ও গরম জলের মিশ্রণ বৃত্ত বা কনভার্জেন্স সার্কেল বা লাইন অথবা কনভার্জেন্ট বেল্ট। এখানকার উত্তরাংশের জলের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (6^0C) আর দক্ষিণের আন্টার্কটিক সারকেলের জলের তাপমাত্রা মাইনাস ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-1^0C)। এখন ডিসেম্বর মাস, ইউরোপে শীত কিন্তু এই অঞ্চলে সবে গরমের শুরু কাজেই দক্ষিণ মেরুর সমুদ্র ছোঁয়া বরফ আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছে। এ বছরে এ পথে আমরাই দক্ষিণমেরুর প্রথম অভিযাত্রী দল। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পোলার সার্কেলের মত এই কনভার্জেন্স সারকেল সরল বা সমান্তরেখা নয়। বরফের পরিমাণ অনুযায়ী কোথায়ও দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে বা উত্তরে একেবেঁকে দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে রেখেছে। জন কনভার্জেন্স বেল্টের কথা বলতে গিয়ে জলের স্রোত, গতি ও সমুদ্রগর্ভস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর কথা বলতে লাগল। কিছুটা একঘেয়েমী হলেও খুবই শিক্ষার বিষয়। সমুদ্রের অশান্ত ভাবটার পরিবর্তনে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বৃহস্পতিবার ৩রা ডিসেম্বর, ড্রেক প্যাসেজ, আন্টার্কটিকা পেনিনসুলা।

ইচ্ছা ছিল আন্টার্কটিকায় প্রথম সূর্যোদয় দেখে তাকে প্রণাম জানাবো "সূর্য প্রণাম" মন্ত্র ও ব্যায়ামের মাধ্যমে। ক্যাপ্টেন লাম্পে (Capt. Lampe) আমাকে তার হিসেব মত জানিয়েছিলেন যে সূর্যোদয় সাড়ে তিনটে নাগাদ হবে তবে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জাহাজের গতি ও অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ওপর। আমি সোয়া তিনটের সময় আবজারভেটরি ডেকে উঠে এলাম। ইতিমধ্যেই ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সূর্যোদয় হল ঠিক তিনটে বাহান্ন মিনিটে। গত রাতে সূর্যাস্ত হয়েছিল রাত এগারোটা বারো মিনটে। আকাশ মেঘলা থাকায় সূর্যাস্ত দেখতে পারিনি।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সূর্যদেব আবির্ভূত হলেন বহু দূরে সমুদ্রের ওপর। হঠাৎ নজরে পড়ল জলের ওপর ভাসমান বরফখণ্ড। এক অপূর্ব সৌন্দর্য! সূর্যোদয় দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। তার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম সূর্যপ্রণাম দিয়ে। ওম্ সূর্যম্ সুন্দরলোকনাথম্ অমৃতম্...।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে সমুদ্রের দৃশ্য পাল্টাতে শুরু করল। পাশ দিয়ে ভেসে চলতে লাগল সারি সারি বরফ খণ্ড। জাহাজের গতি দ্রুতই কিন্তু ঢেউ না থাকার জন্য মনে হচ্ছে কার্পেটের ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে ভেসে চলেছি। জাহাজের পাশে এসে আমাদের স্বাগতম জানালো দুটো আল্বাত্রোস (Albatross)। আর একটু পরেই আর এক ঝাঁক আন্টার্কটিক পেট্রেল (Antarctic Petrel) নামে এখানকার সামুদ্রিক পাখি এসে আমাদের জাহাজের পেছনে পেছনে উড়তে লাগল। বুঝলাম আমরা আন্টার্কটিকের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। মার্কোপোলো লাউঞ্জে দুপুরে লাঞ্চের শুরুতে উত্তেজনা দেখা দিল। সকলেই ঝুঁকে পড়ল বাইরের আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখার

জন্য। একটা ছোট্ট দ্বীপের মত বিরাট আইসবার্গ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে নীল ও সবুজ রঙ ছিট্‌কে পড়ছে। জাহাজের গতি এখন অনেক কম। নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার জন্য জাহাজটা এখন চার পাঁচ নটিকেল কিলো মিটারে চলছে। আমাদের জানলা দিয়ে ধীরে আইস্‌বার্গটা পেড়িয়ে গেল। এরপর আর আইস্‌বার্গ চোখে পড়ল না তবে সমুদ্রের ওপর বরফের স্তর ঘন হতে শুরু করল। জাহাজের ধাক্কায় বরফের স্তর কখনও কখনও উল্টে যাচ্ছে। বরফের নীচের দিকটায় ব্রাউন রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলায় আচ্ছন্ন (Algae)। এই ধরনের শ্যাওলার নাম ডিয়াটমস (Diatoms)। বরফগুলো ওলোটপালট হয়ে জাহাজের পেছনে ছেড়ে আসা জলকে সম্পূর্ণ ব্রাউন রঙে রাঙিয়ে তুলছে।

সারাদিন বিভিন্ন ধরনের বরফের স্তর ভাঙার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের সময় কেটে গেল। জাহাজ যদিও আন্টার্কটিকা পেনিনসুলায় ঢুকেছে কিন্তু মেইন ল্যান্ডের দিকে এগতে গেলে চাই জলপথ নয়তো জাহাজ এগতো পারবে না। জলের ওপর ভাসমান বরফের দৃশ্য ডেক থেকে যেমন দেখায় অবজারভেটরি থেকে অন্য রকম। আর ডেকের সামনের দিকে বরফ ভাঙার দৃশ্য ও শব্দ আর জাহাজের পেছনে ছেড়ে আসা জলপথ সেও অন্য রকম। সময় কাটানোর এক চমৎকার উপায়।

শুক্রবার, ডিসেম্বর ৪, ১৯৯৮, লেম্যার চ্যানেল, আন্টার্কটিকা।

ভোর ২টো থেকে আমি অবজারভেটরিতে বসে আছি। আমি আগেই বলেছি যে এই জাহাজটি "World Discoverer"। ভাসমান ফাইভ স্টার হোটেল। সব ঘরগুলোই এয়ার কন্‌ডিশন। অবজারভেটরির সোফাতে বসে ভাবতেই পারছিনা যে আমি এখন আন্টার্কটিকা ভ্রমণ করছি। দক্ষিণমেরুতে গতকাল সূর্যাস্ত হয়েছে এগারোটা চার মিনিটে (১১টা ৪ মিঃ) আর আজ সূর্যোদয় হবে তিনটে সাতাশে। সূর্যোদয় দেখবার জন্য আগে থেকেই গদি দখল করে রেখেছি কারণ এখানে মাত্র কুড়িটা সীট (20 Sofa)। এখন যদিও রাত কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না। একটু চেষ্টা করলেই বই পড়া যায়। সূর্যোদয় হল তিনটে সাতাশ মিনিটে (Sunrise 0327)। তবে আকাশ পরিষ্কার না থাকাতে সূর্যোদয়ের চিরাচরিত রঙের বাহার থেকে বঞ্চিত হলাম। সূর্যোদয়ের পর আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লাম বিরাট টেবিলে রাখা ম্যাপের ওপর। আমাদের জাহাজ নেমে চলেছে দক্ষিণের দিকে উদ্দেশ্য লেম্যার চ্যানেল। বেলজিয়ান এক্সপ্লোরার চার্লস লেম্যার, ফরাসী উচ্চারণ শার্ল লোম্যার (Charles Lemaire)।

চ্যানেলে ঢোকার মুখেই জাহাজ পেল বাঁধা। জলের ওপর ভাসমান বরফের স্তর এখন আরও পুরু। জল আর দেখা যাচ্ছে না। বরফ ভাঙতে ভাঙতে জাহাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। মনে দেখা দিল নতুন উত্তেজনা। ব্রেকফার্স্টের পর লিডো লান্‌জ্‌ থেকে জাহাজের বাঁ দিকে দেখা দিল দুটো পর্বতশৃঙ্গ। আমরা আন্টার্কটিকার প্রথম ভূখণ্ডের দৃশ্য দেখলাম। কেপ রেনার্ড (Cape Renard)। আমার জীবনে এই দ্বিতীয়বার আন্টার্কটিকা দর্শন। দক্ষিণ মেরুকে জানালাম ভক্তি অর্ঘ্য। করলাম প্রণাম।

দুপুরের দিকে আমাদের সামনে দেখা দিল এক অনবদ্য দৃশ্য। যে দৃশ্য দেখার জন্য আমার এই মানব জন্ম ধারণ। জাহাজ লেম্যার চ্যানেলের মধ্যে প্রবেশ করতেই দুপাশের পাঁচিলের মত বিভিন্ন আকারের গ্লেসিয়ার আমাদের হতবাক করে দিল। এই দৃশ্য বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। ক্যামেরায় যার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য ধরা পড়ে না। সৃষ্টিকর্তার এটাই হয়তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে আমার জীবনে এটাই শ্রেষ্ঠ উপহার। দ্বিতীয়বার দেখছি এই সৌন্দর্য ভাণ্ডার।

এখন গরমের শুরু। চ্যানেলের দুধারের শক্ত বরফের চাই দিনের সূর্যালোকে গলতে শুরু করেছে আর বরফ গলার কারণে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মূর্তি কোনটা অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট আর কোনটা জীব-জন্তু, মানুষ, শহর, বাড়ি পাহাড়ের অনুরূপ। সবই ভাসমান জলের ওপর সাজিয়ে রাখা এক বিরাট দৈব প্রদর্শনী। আমাদের সেই অবস্থাটা কাটতে একটু সময় লাগল। তারপর আমাদের সম্বিত ফিরে আসতেই শুরু হল ক্যামেরার ক্লিক্ আর রোলিং এর শব্দ। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শুধু বলতে লাগলাম অবিশ্বাস্য সত্য... অপূর্ব! গ্লেসিয়ার যে এত সুন্দর হতে পারে তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বিভিন্ন আকৃতির প্রাসাদোপম গ্লেসিয়ারের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দিতে লাগল সাদা কালো রঙের পাখি, বরফের স্থায়ী বাসিন্দা পেংগুইন। পেংগুইনের দেশ। পেংগুইনদের দেশে আমরা টুরিস্ট। বরফের মধ্যে স্থির ও অস্থির পেংগুইনরা এই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যকে আরও সুন্দরতর করে দিয়েছে। আমাদের চোখ স্বার্থক হল।

জাহাজ যত অগ্রসর হতে লাগল ততই মনে হতে লাগল দুধারের গ্লেসিয়ারের পাঁচিল আমাদের পথের ওপর এসে পড়ছে। রুদ্ধ গ্লেসিয়ারের রঙ সবুজ আর নীল, মসৃণ। আর মনে হচ্ছে নিঃশব্দের এক সুর যেন আমাদের ঘিরে ধরেছে। দুপাশের সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা হঠাৎ যেন বন্দী হয়ে পড়লাম। জাহাজ আর এগতে পারল না। যে কোন মুহূর্তে জাহাজ আটকে পড়তে পারে। তাই অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন বাধ্য হল জাহাজকে পেছনে সরিয়ে আনতে। আমরা আস্তে আস্তে লেম্যার চ্যানেল থেকে বেড়িয়ে এলাম। একটু দূর থেকে লেম্যার চ্যানেলের বরফ গলা রূপ দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গ্লেসিয়ারের রূপ যে এত সুন্দর হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। অতি কাছে গিয়েও আন্টার্কটিকায় অবতরণ করা গেল না। উঁচু ও ভঙ্গুর বরফের পাঁচিল আমাদের পক্ষে ডিঙোনো অসম্ভব আর বিপজ্জনক তো বটেই। জাহাজ ফিরে এসে আবার পেল জলের ওপর হালকা বরফের স্তর, একটু ঘুড়ে আমরা আবার ধরলাম দক্ষিণের পথ। জাহাজ এবার উত্তরে পথ ধরল কারণ দক্ষিণের বরফের স্তর ও বিরাট উচু বাংকিজ্ (Banquise) আমাদের বাঁধা দিল। রাডার হল থেকে ঘোষণা করা হল—গ্লেসিয়ার-এর জন্য জলপথ বন্ধ তাই অন্য পথ ধরা হল। অতি কাছে গিয়েও অবতরণ করা হল না তাই অনেকেরই আফশোষ। বিশেষ করে যারা প্রথমবার আন্টার্কটিকায় এসেছেন। তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিতে লাগল আদৌ ল্যান্ডিং করা যাবে কি না ভগবান জানেন।

জাহাজ আবার ঘুড়ল একবার পূর্বদিকে গিয়ে আবার ধরল দক্ষিণের পথ। কিছুক্ষণ হালকা বরফের স্তরগুলোকে ভেঙে, একটার ওপর আরেকটাকে তুলে দিতে দিতে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে হঠাৎ জাহাজটা প্রায় থেমে গেল। সামনের কঠিন স্তর শক্তিশালী জাহাজকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রায় দশ মিনিট জাহাজ সম্পূর্ণ থেমে থাকা অবস্থায় ছিল। তারপর হঠাৎ পেছনে চলতে শুরু করল। তারপর আবার নতুন উদ্যমে এগিয়ে এল অনেকটা রেলগাড়ির শান্টিং-এর মতো, জাহাজটা এবারে সত্যিকারের আইস্‌ব্রেকারে (Ice Breaker) পরিণত হল। আমাদের জাহাজ অতি শক্তিলালী। জাহাজের সামনের ডেকে সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলাম আইসব্রেকারের অভাবনীয় শক্তি। এখানেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের দান। জাহাজ বার বার অগ্রসর হয়ে বুল ডোজারের মত বিরাট বিরাট বরফের চাই ভেঙে তুলে দিচ্ছে ওপরে। আবার পিছিয়ে গিয়ে একটু স্পীড নিয়ে এগিয়ে এসে ধাক্কা মারছে বরফে। সেই ধাক্কায় বরফের চাই ভেঙে পড়ছে। ভাঙার শব্দে আমাদের বুক কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে পেংগুইনরা আমাদের এই বরফ কাটার দৃশ্য দেখবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল।

আইসব্রেকারের এই অগ্রসর যতই বীরত্বপূর্ণ হোক না কেন শেষ পর্যন্ত এক সময় জাহাজ থামতে বাধ্য হল। জাহাজ স্পীড নিয়ে উঠে এসেছে একটা বিরাট বরফের ওপর। জাহাজের পেছন দিকটা বরফ কাটা পথ হয়ে আছে। কাজেই ব্যাক করতে অসুবিধা হবে না।

এখন সকাল নটা, প্রথম অবতরণ। জাহাজের ইঞ্জিন রুমের পাশের দরজা খোলা হল। জাহাজ থেকে প্রথমে এক্সপার্ট গ্রুপ বরফের ওপর পদার্পণ করে পরীক্ষা করে জানাল ঠিক আছে। তারপর আমরা একে একে সবাই জাহাজের বাইরে এলাম। জলের ওপর বরফের দ্বীপ। নাম প্লেনো আইল্যান্ড। আসল দ্বীপটা আরও দু-কিলোমিটার দূরে।

প্লেনো দ্বীপের অধিবাসী পেংগুইনরা আমাদের স্বাগত জানাল। এই প্রথম আমাদের অনেকে পেংগুইন দেখল। এই অঞ্চলের পেংগুইনদের বলে জেন্তু। দ্বীপের ওপর অস্থায়ী ক্যান্টিন খোলা হল, গরম পানীয়ের গ্লাস হাতে নিয়ে অভিযাত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দন জানাল । আমার এই দ্বিতীয়বার দক্ষিণ মেরুতে আসা। প্রণাম জানালাম ভাগ্যবিধাতাকে। জাহাজ থেকেই অ্যানাউন্স করা হল "অন বোর্ড প্লীজ"। এক ঘন্টার মত আন্টার্কটিকায় অবতরণ পর্ব সমাপ্ত করে আমরা আবার উঠে এলাম জাহাজে। জাহাজে উঠে সবাই সামনের ও পেছনের ডেকে যে যার সীট দখল করে বসলাম। অনেকেই খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে রইল। দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ, এখানকার আবহাওয়া, বরফ ফাটানো, পেংগুইন আর অবর্ণনীয় দৃশ্য সবাইকে ভীষণভাবে রোমাঞ্চিত করেছে। খাওয়ার সময় নেই, কথা বলার অবকাশ নেই। ভোর থেকে একের পর এক দৃশ্য সবাইকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। সবাই ব্রেকফার্স্টের স্যান্ডউইচ হাতে হাতে নিয়ে ঘুড়ছে, বসার সময় নেই। সকলের মনই এক পাওয়ার আনন্দে ভরা।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে একের পর এক সবাই আসতে শুরু করলাম। ক্যাপ্টেন লাম্পে রাডার বিশ্লেষণ করে আমাদের বোঝাতে লাগলেন কোথায় কোন গ্লেসিয়ার কিভাবে আমাদেরপথ আটকে রেখেছে ইত্যাদি...। পবরর্তী আকর্ষণের জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

বিকেল সাড়ে তিনটেয় (1530 hrs.) আমরা এসে পৌঁছলাম প্যারাডাইস বে (Paradise Bay)। কি সুন্দর নাম স্বর্গ উপসাগর। আর এক মনোরম দৃশ্য। প্যারাডাইস বে'র ভাসমান গ্লেসিয়ারগুলো ছোট ছোট দ্বীপের মত সুন্দর সুন্দর রূপ নিয়ে ভেসে আছে একে অন্যের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে। আমাদের জাহাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। জাহাজ এখন আর বরফের আস্তরণে থেমে পড়েনি। চারদিকের জলরাশি নিস্তব্ধ পরিষ্কার ভাসমান আইসবার্গের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার। এক একটা স্টাচু জল থেকে পনেরো কুড়ি মিটার উঁচু। প্রকৃতিক এক অভাবনীয় শান্ত ও পবিত্র রূপ। আমরা স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম প্রকৃতি দেবীর আর এক রূপ, লীলা। জলের তৈরি জলের ওপর ভাসমান জলের বাহার। প্রকৃতির এই লীলা মানুষের তৈরি ক্যামেরায় ধরা পড়ে না। শুধু প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে দেখা। বাইরের এই সৌন্দর্য আমাদের মনকে সুন্দর করে দিল।

এখানেও ল্যান্ডিং সম্ভব হল না। তবে অনতিদূরে আমরা দাঁড়ালাম। তারপর ঘুড়ে প্যারাডাইস বে'র পেছন দিকে আধঘন্টা পর আমরা এসে পৌঁছলাম চিলির মিলিটারি সাইনটিফিক রিসার্চ স্টেশনে। জাহাজ দাঁড়াল। এই প্রথম রাবার বোট জোডিয়াকগুলোকে (Zodiac) নামানো হল। জোডিয়াকে করেই আমরা এসে পৌঁছলাম গনজালেস ভিদেলা কেন্দ্রে (Gonzalez Videla, Chiliean Base)।

আমাদের পারমিশন নেওয়াই ছিল। কাজেই তারা আমাদের স্বাগত জানাল। শক্ত বরফ পাথর আর অগনিত জেন্তু পেংগুইনের ডাক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করল। চিলিয়ান বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র শক্ত বরফ, পেংগুইন জীবন ও সমুদ্রের গভীরতা নিয়ে গবেষণা করছে। কাজেই গোলাকার স্টীলের ঘরগুলোতে দেখার মত কিছুই নেই। ওখানকার মিলিটারি কর্তৃপক্ষ আমাদের লগ বইয়ে সই করলেন এবং আন্টার্কটিকায় স্বাগত জানালেন। একঘন্টা থেকে তারপর আবার জাহাজে ফিরে এলাম। বলতে গেলে এটাই আমাদের মূল আন্টার্কটিকার বরফ ও পাথর স্পর্শ করা হল। গতবার মিঃ মেলেনিও আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি অনুপস্থিত।

সেইদিন রাতেই ক্যাপ্টেন আমাদের আন্টার্কটিকা পদার্পণের জন্য ওয়েলকাম ডিনার দিলেন।

শনিবার, ৫ই ডিসেম্বর, ডিসেপ্সন আইল্যান্ড।

আমাদের জাহাজে যাত্রী হিসেবে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ তারা দলগত ভাবে যে যার গ্রুপ নিয়ে লেকচার, খবরাখবর আদান-প্রদান ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। দূরবিন, ক্যামেরা ও কলম তাদের শরীরের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(১) সমুদ্র বিশেষজ্ঞ, (২) পক্ষী সংরক্ষণ সংস্থা (৩) শুদ্ধ পরিবেশ ও আবহাওয়া সংরক্ষণ, (৪) ভলকানো বিশেষজ্ঞ আর (৫) প্রকৃতি-পর্যটক সবাই এই পাঁচটি দলে বিভক্ত। পাঁচটি দল নেতাকে বলা হয় গ্রুপ লীডার বা গ্রুপ কোঅর্ডিনেটর। জাহাজ ছাড়ার আগে কোঅর্ডিনেটর ইয়ান আমাদের বলে দেয় কে কোন দলের দায়িত্ব নেবে এবং সে অনুযায়ী আগের দিন আমাদের মিটিং-এ বিশদ জানিয়ে দেওয়া হয়।

আজ আমরা পৌঁছবো ডিসেপ্সন আইল্যান্ডে (Deception Island)। সূর্যোদয় হল তিনটে বারো মিনিটে। সাউথ শেতল্যান্ড আইল্যান্ড (South Shetland Island)-এর অন্যতম দ্বীপ এই ডিসেপ্সন আইল্যান্ড। এই দ্বীপে একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ১৯৬০ সালে এবং ১৯৬৯ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্নি ও ভস্ম উৎপাত হয়েছিল। আমরা এই আগ্নেয়গিরি দেখতে যাব। আমাকে দেওয়া হল ভল্‌কানো বিশেষজ্ঞ দলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব। আমার দায়িত্ব দলের সকলের নিরাপত্তা ও অসুবিধা হলে জাহাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা।

সকাল ৭টায় আমরা জোডিয়াক নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। দুটো জোডিয়াকে মোট পনেরো জন। বাকি সবাই এই দ্বীপে আসবে দশটা নাগাদ। আকাশ আজ মোটেই পরিষ্কার নয়। জোডিয়াকে বসতেই ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের সতর্ক করে দিল। ডিসেপ্সন আইল্যান্ডের বেইলি হেড (Baily Head)-এ জাহাজ দাঁড়িয়ে রইল। ডেক্ থেকে সবাই গুড লাক জানালো। এখানে জলের ওপর কোন গ্লেসিয়ার নেই। দূরে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো একটা কালো ন্যাড়া পাহাড়। জোডিয়াক তীরে ঠেকতেই আমরা লাফিয়ে পড়লাম। রবার্ট পার্থ (Robert Parthe) ও কেইলি (Kaily) আমাদের গুড লাক জানিয়ে জোডিয়াক নিয়ে ফিরে গেল জাহাজে। আমি রেডিওতে জানিয়ে দিলাম আমাদের সেফ ল্যান্ডিং। জাহাজের রেডিও অফিসার আমার রেডিওর সঙ্গে কানেক্সন করিয়ে দিল (INSAT) সানফ্রান্সিস্‌কোর স্যাটেলাইটের। ওয়েট ল্যান্ডিং-এর জন্য আমার উপযুক্ত পোষাক পড়েছি। কাজেই ঢেউ ও জলের ওপর নামা সত্ত্বেও আমাদের অসুবিধা হয়নি। দ্বীপে নেমে প্রথমেই মনে হল এখানকার চোরা বালিতে আমরা সবাই নেমে যাচ্ছি। তাই তাড়াতাড়ি উঠে এলাম উঁচুতে। আশ্চর্য হলাম এখানকার বালির রূপ দেখে। বালি নয় কালো রঙের ছাই। এই দ্বীপটা শক্ত কালো পাথর ও কালো ছাইয়ে গড়া।

পাহাড়ের ওপর ওঠা মানে বালির পাহাড়ে ওঠা। অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে ওপরে উঠলাম। ক্র্যাটারের (Crater)-এর মুখে আসতেই একদল চীনস্ট্র্যাপ (Chinstrap) পেংগুইন আমাদের ওয়েলকাম জানালো। ক্র্যাটারের একদিকে শক্ত পাথরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শক্ত গ্লেসিয়ার। বিশেষজ্ঞ ফ্রেডরিক (Frederick) জানালো যে উত্তরের এই পাথরটা ঠাণ্ডা বাতাস ধরে এই গ্লেসিয়ার সৃষ্টি করেছে নয়তো এই কালো রঙের আগ্নেয়গিরির ভস্মের ওপর বরফ জমে থাকতে পারে না কারণ আগ্নেয়গিরির ভস্ম স্বভাবতঃ গরম। ক্র্যাটারের পরিধি, ছাই, মুখের বড় পাথরের সাইজ, গভীরতা ইত্যাদি মাপ করে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছবি তুলে আমরা

এলাম দ্বিতীয় ক্র্যাটারের কাছে। এখানে ক্র্যাটারের মুখে পেলাম স্কুয়া ধরনের পাখির (Scua) বাসা। সেখানে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে আমরা নেমে এলাম। নীচে নেমে দেখি অবাক কাণ্ড। এই দারুণ শীতে তাপমাত্রা এখানে মাইনাস ৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (-6⁰C)। একটা ছোট গর্তের মধ্যে জল জমিয়ে সবাই হট্‌ ওয়াটার বাথ (Hot Water bath) নিলাম। বুঝলাম যে আগ্নেয়গিরি থেকে কয়েকটা উষ্ণপ্রস্রবনের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই জলটাকে সদ্য কাটা একটা গর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে তাতে সমুদ্রের জল এনে স্নানের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। আন্টার্কটিকায় এই উষ্ণপ্রস্রবনের স্নান একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। গর্তটাকে সংরক্ষণ করার জন্য একদল ঘন ঘন বেল্‌চা করে ছাই তুলে ফেলছে আর এক দল সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা জল আনার নালাটাকে ছাই মুক্ত করছে। এই স্নানের জন্য চাই দলগত সহোযোগিতা। একটা নতুন ধরনের খেলা।

জাহাজে ফিরে এলাম বেলা ২টায়। চারদিকে এই সাদা বরফ আর জলের মধ্যে কালো আগ্নেয়গিরির পাহাড়, ছাই-এ ভরা বালির তট। আগ্নেয়গিরি প্রদক্ষিণ আর সবশেষে উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান সব মিলিয়ে আমাদের আজ খুব পরিশ্রম হয়েছে। সন্ধ্যের পর লেকচার হলে আগ্নেয়গিরির স্বভাব, উৎস আর সমুদ্র স্রোতে তার প্রভাব নিয়ে খুব সুন্দর তথ্যমূলক বক্তৃতা হল। সবাই ক্লান্ত। আন্টার্কটিকে এই প্রথম আমাদের স্থলভাগের ওপর অভিযান হল। প্রত্যেকই আনন্দিত। রাত্রিতে ক্যাপ্টেন সবাইকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে গুড নাইট জানালেন।

৬ই ডিসেম্বর, রবিবার

সূর্যোদয় হল তিনটে আট মিনিটে (0308 Mints.)। সুন্দর প্রভাত। লিডো লাউঞ্জে বাফেট (Buffet) ব্রেকফাস্ট সকাল ছ'টা থেকেই পাওয়া যায়। কয়েকদিন যাবৎ আমার সূর্যপ্রণাম ব্যায়ামে জাহাজের অনেক যাত্রীরাই যোগদান করে। ঠিক ব্রেকফাস্ট-এর আগেই ক্লাশ শেষ হয়। ভোর সাড়ে তিনটের সময় আমার ব্যক্তিগত সূর্যপ্রণাম ও প্রার্থনা শেষ হয়ে যায়। তারপর আমি চারদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখি। তারও অনেক পর আস্তে আস্তে সবাই ওঠে। আজকে সূর্যোদয় থেকে এখন ছ'টা পর্যন্ত ফুটফুটে সূর্যালোক ভাগ্য ভালই বলতে হবে।

আজকের ল্যাটিচ্যুড ৬২° সাউথ (Latitude 62⁰ 10' S.) আর লংগিচ্যুড ৫৮° ২২ সেকেন্ড ওয়েস্ট (Longitude 58⁰ 22' W)। অত্যধিক বরফের জন্য আমরা উত্তরে উঠে এসেছি। আমাদের জাহাজ এগিয়ে চলেছে মাত্র ২ নটিক্যাল (2KN) স্পীডে। জলের তাপমাত্রা মাইনাস ১° সেন্টিগ্রেড (-1⁰C) আর আবহাওয়া তিন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, বাতাস সামান্য।

আমরা উত্তরে উঠে এসেছি তাই আজ সুর্যোদয় দেখেছি তেইশ মিনিট দেরীতে। আমরা এখন ওয়েডেল সী (Weded Sea)-তে। এই অঞ্চলটাকে চিলি, জার্মানী ও গ্রেটব্রিটেন দাবী করে রেখেছে। রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামও বলছে ওদের এলাকা।

আমরা লাঞ্চ খাবার পর হাজির হলাম পলেত্ দ্বীপে (Paulet Island)। জাহাজ ছেড়ে জোডিয়াকে রওনা হলাম সামনের কয়েকটি সুন্দর আইসবার্গ দেখার জন্য। আজকের লক্ষ্য পেংগুইন কলোনী পর্যবেক্ষণ। দেখলাম হাজার হাজার পেংগুইন আর আইসবার্গের সাথে তাদের লুকোচুরি খেলা। তাদের চলন ধরন আর টুরিস্টদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব সবই মনে হল অদ্ভুত। আর দেখলাম অজস্র করমোরান (Cormorans)।

সোমবার ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮, সাউথ শেতল্যান্ড আইল্যান্ড (South Shetland Island)

শেতল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিং জর্জ আইল্যান্ড এবং পেংগুইন আইল্যান্ড এই দুটো দ্বীপ পেংগুইনদের স্বর্গরাজ্য। আমরা কিং জর্জ দ্বীপের কাছে জাহাজ নোঙর করে জোডিয়াক নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। পেংগুইন এবং গ্লেসিয়ারের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে আমরা সরাসরি তীরে এসে উঠলাম। আমাদের ওয়েলকাম জানাল এখানকার পোল্যান্ডের বৈজ্ঞানিকরা।

এই দ্বীপটার রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। এই দ্বীপে সবশুদ্ধ বারোট বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। তাদের মধ্যে আটটা সারাবছরই খোলা থাকে। আর চারটে মাত্র গরমের সময় খোলা হয়। সারা বছর যে সেব কেন্দ্র খোলা আছে তাদের মধ্যে আছে : আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, চায়না, পোল্যান্ড, রাশিয়া, উরুগুয়ে ও সাউথ কোরিয়া। শুধু গরমকালে খোলা থাকে : একোয়াডর, জার্মানী, পেরু ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। পোলিশ প্রতিনিধি আমাদের আর্কটোস্কি রিসার্চ স্টেশন (Arctowski Polish Research Station) দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, তবে হুঁশিয়ার করে দিলেন ল্যাবরেটরীতে কোন জিনিসে আমরা যেন হাত না দিই।

এখানে মেটিওরলজিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং ইনস্ট্রুমেন্ট দেখলাম তাদের স্যাটেলাইট কানেকসন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হলাম। তারা আমাদের পাশপোর্ট ও লগ্‌বুকে স্ট্যাম্প মেরে দিলেন এবং আবার আসতে বলে বিদায় জানালেন। বিরটা স্টেশন, ছোট প্লেন নামার স্ট্রীপ রয়েছে। এদের লোকসংখ্যা চল্লিশ জন।

আমরা আর্কটোস্কি (Arctowski) রিসার্চ স্টেশন থেকে বেড়িয়ে ওখান থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপর গুড়ো বরফ ও শক্ত বরফের স্তর পেড়িয়ে উঠে এলাম। এখানে পেলাম আমেরিকান পেংগুইন রিসার্চ স্টেশন। লোহার খাঁচায় রেডিমেড্ পেংগুইন স্টেশন। চারপাশের বিভিন্ন ধরনের ইলেক্‌ট্রড (Electrod) তার ডিঙ্গিয়ে হাজির হলাম একটা অবজারভেটরি হলে। সেখানে পক্ষীবিশেষজ্ঞ সুসান (Susan) ও ওয়েন (Wayne)-এর সাথে পরিচিত হলাম। গরমের শুরুতে পেংগুইনরা সাধারণ বছরে একবার ডিম পাড়ে। পুং ও স্ত্রী পেংগুইন শেয়ার করে ডিমের তা দেয়। একজন যখন দূরে খাবারের সন্ধানে যায় তখন অন্যজন ডিমের ওপর বসে। তাতে ঠাণ্ডা লেগে ডিম নষ্ট হবার ভয় নেই। স্ত্রী পুরুষ পেংগুইনরা সাধারণতঃ

তাদের সঙ্গী বা সঙ্গীনি বদলায় না। সারাজীবনের সাথী হিসেবে স্বামী স্ত্রী হিসেবে কাছে কাছেই থাকে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পেংগুইনদের সম্পর্কে সুসান প্রায় এক ঘন্টায় আমাদের বুঝিয়ে দিল তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু। বলাই বাহুল্য যে অবজারভেটরির চারপাশে হাজার হাজার পেংগুইনের সমবেত চীৎকার আমাদের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। আমাদের অতি কাছে দেখেও তারা ভয় পেল না। শুধু তাই নয় মনে হয় ভয় বা লজ্জা তাদের নেই। চারদিকের পাহাড়ি সৌন্দর্য, জলের ওপর অপরূপ ভাসমান গ্লেসিয়ার, সুন্দর ও ছন্দেভরা পেংগুইনের দল সবই এক নতুন মহাদেশের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তবে স্বীকার করতেই হবে যে পেংগুইন কলোনীর তীব্র গন্ধ অনেকের নাকে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। নাকে রুমাল চাপা না দিয়ে সেখানে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। আমরা জোডিয়াকে চেপে আবার ফিরে এলাম জাহাজে। বিদায় জানালাম অ্যাডমিরালটী বে'র (Admiralty Bay) বৈজ্ঞানিক ও মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে। আমাদের জাহাজ ছাড়ল কিং জর্জ বের (King George Bay) উদ্দেশ্যে। আবার জোডিয়াক ট্যুর। কিং জর্জ বে'তে কিছুক্ষণ ল্যান্ডিং-এর চেষ্টা করেও জাহাজ এগুতে পারল না। দ্বীপের চারদিকে বিরাট পাঁচিল মানে বরফর পাঁচিল। জলের ওপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ কাছে যাবে না কারণ ধ্বস পড়ার সম্ভাবনা আর জোডিয়াকের শব্দে ও প্রতিধ্বনির কারণে কাছে গেলে বরফের চাপে পিষে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রায় একঘন্টা পর অনেক ঘুড়ে আমরা এলাম টারেট পয়েন্টে (Turret Point)। ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে জোডিয়াক নামবার অনুমতি দিলেন।

টারেট পয়েন্টের কালো বালির চড়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। প্রথমে মনে হল চড়ার ওপর বড় পাথর তারপর একটু কাছে যেতেই মনে হল চড়ার ওপর নৌকোগুলোকে উল্টো করে রাখা হয়েছে। আরও কাছে যেতেই হঠাৎ সেই নৌকোগুলো উল্টে গিয়ে চলতে শুরু করল। আমাদের বিস্ময়ভরা চোখগুলো সেদিকে আটকে গেল। পেছন থেকে ডন (Don) চেঁচিয়ে উঠল, "কাছে যেওনা সাবধান।"।

কালো বালির ওপর পাথর নয় নৌকোও নয় ওগুলো আসলে ধূসর রঙের সীল। এদের নাম ওয়েডেল সীল (Weddell Seals) এবং এলিফ্যান্ট সীল (Elephant Seal)। ঠিক নৌকোর মতই দেখতে লেজের দিক ও মাথার দিক সরু পেটের কাছে চওড়া। আর চলাফেরা করে নৌকোর মতই দুলতে দুলতে। বিরাট দেহ এক একটার ওজন প্রায় দু-আড়াই টন তো বটেই। দেহের ওজনে ডাঙ্গার ওপর এদের চলাফেরাও সীমিত। ডন বুঝিয়ে দিল যে, এরা এখন রোদ্দুর পোহাচ্ছে। এরা এইভাবে চরে পাঁচদিন দলবদ্ধ হয়ে গা ঘেঁসে চুপচাপ শুয়ে থাকবে তারপর জলে গিয়ে চার পাঁচদিন ধরে শুধু খাবে।

—এরা কি খায়?

—চিংড়ি মাছ (Krill চিংড়ি মাছের মতই)

—এত চিংড়ি আছে এখানকার জলে?

—নিশ্চয়ই। তুমি যদি এখানে ডুব দিয়ে দেখ তাহলেই বুঝবে জলের নীচে অঢেল চিংড়ি। আর চিংড়ির সাথে সাথে এরা খায় সমুদ্রের শ্যাওলা। পেংগুইনরাও ভীষণ চিংড়ির ভক্ত। আন্টার্কটিকায় চিংড়ি অফুরন্ত। তবে মানুষের ধরা নিষেধ সবই সংরক্ষিত।

সীলগুলোর পাশ দিয়ে যেতেই ওরা আমাদের দিকে মিট মিট করে তাকাতে লাগল। দেখেই মনে হল শান্তিপ্রিয় জীব। বালির চড়ার ওপর নজরে পড়ল আর এক রকম পাখি অনেকটা চীলের মত ধূসর রঙের নাম সাউদার্ন জায়ান্ট পেট্রেল (Southern Giant Petrel)। এই দ্বীপেও একটা ক্র্যাটার রয়েছে। আমাদের দল উঠে এল পাহাড়ের ওপর, প্রায় আধঘন্টার পথ। ক্রাটারের (Crater) মুখে সামান্য ঘাসের মত শ্যাওলা। বুঝলাম আমরা উত্তরে পিছিয়ে এসেছি। আজকের দিনটায় খুবই পরিশ্রম হয়েছে তাই আমরা আবার জাহাজে ফিরলাম।

মঙ্গলবার, ৮ই ডিসেম্বর, এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড।

আজ সূর্যোদয় হল ৪টে ২৪ মিনিটে। আমরা যথারীতি যোগ ব্যায়াম সেরে হাতে গরম কফির মগ নিয়ে ক্যাপ্টেনের ডেকে এসে জড়ো হলাম। আজকে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে জার্মানের তরুণী বৈজ্ঞানিক কাথারিনা (Katharina Rademacher)। কাথারিনা বায়োলজিস্ট। মেরুর পশু বিশেষজ্ঞ। হঠাৎ অনুমতি চাইল একটা স্পেশাল ল্যান্ডিং-এর জন্য। ক্যাপ্টেন সহাস্যে বললেন—"পারমিশনের দরকার নেই, আমাদের জাহাজ থেমেই আছে। সামনে এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড আর বাঁদিকের ওই পয়েন্টা হচ্ছে কেপ্ লুক্আউট (Cape Look Out)। তুমি ইচ্ছে করলে নামতে পারো।"

কাথারিনা খুব খুশি। কাথারিনার সঙ্গে অ্যামি, গ্রেগ ও আমি যোগ দিলাম। অ্যামি আমেরিকান মেয়ে কিন্তু চলাফেরা ও স্মার্টনেসে ছেলেদের হার মানায়। ক্রেন দিয়ে একটা জোডিয়াক জলে নামিয়ে আমরা স্টার্ট দিলাম কেপ্ লুক্ আউটের দিকে। জাহাজ থেকে আমাদের লাগল আধঘন্টার মত। ডাঙ্গার কাছাকাছি এলেও ডাঙ্গায় জোডিয়াক লাগানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। প্রথম বাঁধা গ্লেসিয়ারের মসৃন পাঁচিল আর সরু প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে গেলে নিতে হবে রিস্ক (Risk)। জলের তাপমাত্রা ১° সেন্টিগ্রেড। জলের ঢেউয়ে গ্লেসিয়ার গলে গিয়ে সৃষ্টি করেছে সরু পথ ও সুরঙ্গ। জোডিয়াকের মেসিনের শব্দে ও তার ভাইব্রেশনে গ্লেসিয়ারের অংশ যখন তখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। আমরা বাধ্য হয়ে জাহাজে ফোন করলাম। ক্যাপ্টেন পরামর্শ দিলেন "কাছে যেও না। বাংকিসের উচ্চতা প্রায় দশ মিটার। বাইচান্স যদি তোমরা ভেতরে ঢোকো তারপর উল্টোদিকে মুখ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বিপদ মানে মৃত্যু। সবচেয়ে ভাল হয় তোমরা যদি কেপ্ লুক্আউটের পেছন দিক দিয়ে ঢোকো। সেখানে বরফমুক্ত পাথর পাওয়া যাবে। সেখান দিয়ে ল্যান্ডিং করতে পারো।"

—অলরাইট, থ্যাংক ইউ বলে আমরা এগিয়ে চললাম। কেপ্ পেরোতেই হঠাৎ আমরা বাধা পড়লাম। নীচের আল্‌গি (Algae) বা জলের তলার গাছগলো আমাদের মেশিনের পাখায় জড়িয়ে পড়ল। অ্যামি এর জন্য প্রস্তুত ছিল সে সঙ্গে সঙ্গে মেশিন তুলে পাখার থেকে লতার মত পাক খাওয়া শ্যাওলাগুলো ছাড়িয়ে নিল। তারপর আরও দূরে ঘুড়ে আমরা কেপের অন্যদিকে চলে এলাম। এখানে আমাদের দ্বিতীয় বাধা দিল ঢেউ। ঢেউ-এর ফলে আমরা ঠিক মতো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না। আমরা তিনজনে জোডিয়াকের পেছন দিকে সরে এলাম। তার ফলে জোডিয়াক প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রী কোণায় উঠে গিয়ে লাফাতে লাগল ঢেউ-এ। আমরা হঠাৎ এই ঢেউ-এর জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা ওয়েট ল্যান্ডিং-এর জন্য উপযুক্ত পোষাক পড়েছি কাজেই শরীর ভেজার সম্ভাবনা নেই। বরফ, সামুদ্রিক শ্যাওলা আর ঢেউ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমরা এলিফ্যান্ট আইল্যান্ডে পৌঁছলাম। এই দ্বীপটা হাতীর মাথার মত দেখতে তাই এর এই নাম দেওয়া হয়েছে। আমরা যেখানে নামলাম সেটা মোটেই বালির চড়া নয় ঝামা পাথরে তৈরি একটা পাহাড়ের গা। টানাটানি করে জোডিয়াককে ওপরে তুলে একটু চারিদিকে তাকাতেই সামনের দিকে এক ভয়াবহ দৃশ্য। আমাদের মাথার ওপরে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ভালুকের মতো কালো সীল। মনে হয় এতক্ষণ ধরে আমাদের দুরবস্থা দেখছিল। আর একটু এগুতেই আমাদের দিকে ঘোৎ ঘোৎ করে এগিয়ে এল। এমতাবস্থায় কি করা যায় তা আগে থেকেই জানা ছিল তাই রক্ষে। তাড়াতাড়ি দুটো পাথর কুড়িয়ে হাততালি দেবার মত ঠক্ ঠক্ করে বাজাতে লাগলাম। আশ্চর্য বটে তারা আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। আমরা তাদের এড়িয়ে পাহাড়ের গাঁ ঘেঁষে এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পর আমরা ফিরে এলাম কেপের উল্টোদিকে অর্থাৎ যেখান দিয়ে প্রথম জোডিয়াক নিয়ে অবতরণ করার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের সামনে এখন এক অনবদ্য দৃশ্যের পটভূমি। অসংখ্য পেংগুইন আর সীলে ভরা পার্বত্যভূমি। আর একটু দূরেই জলের ওপর ভাঙা গ্লেসিয়ারের বাহার। দূরে দেখা যাচ্ছে আমাদের জাহাজ, ছবির মতো। ঝামা পাথরের ওপর বরফ গলে গেছে কিন্তু নীচের বরফ সবে গলতে শুরু করেছে। কাথারিনা বলল যে এই ধরনের পাথর গরম তাই বরফ তাড়াতাড়ি গলে। এখানকার পশমে ভরা সীল। এই পশমী সীল (Fur Seal) ধরার জন্য অনেক জাহাজ ও নাবিক প্রাণ হারিয়েছে। আর হাজার হাজার সীলের চামড়ায় তৈরি পোষাক ১৯৩০-৩৫ সালে ইউরোপের অভিজাত মহলের বনেদি শীতবস্ত্র তৈরি হয়েছিল। এই সময় সীল ও পেংগুইনদের সন্তান উৎপত্তির সময়। তারা আমাদের এই অহেতুক ভ্রমণ ঠিক পছন্দ করেনি। তাই অনেক পুরুষ সীল আমাদের দেখে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছে দেখলাম। আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কিন্তু পেংগুইনদের কথা আলাদা। ওরা যে যেখানে ছিল সেখানেই বসে বসে ডিমে তা দিতে থাকল। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

আমরা আন্টার্কটিকা সংরক্ষণ সংবিধানে সই করেছি এবং প্রতীজ্ঞা করেছি যে এখানকার বাসিন্দাদের কোন রকম বিরক্ত করবো না। তাই পেংগুইন রুকারীতে প্রবেশ

করলাম না। আমরা ফেরার পথ ধরলাম। পেংগুইন ও সীল সম্পূর্ণ দুই ধরনের আলাদা প্রাণী অথচ তাদের এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

আবার ঢেউ-এর সাথে যুদ্ধ করে দ্বীপের ভেতর দিকে এসে সরাসরি জাহাজের দিকে জোডিয়াক ঘোরালাম। অভিযান আর আনন্দ আমাদের মন ভরে দিল। প্রায় তিন ঘন্টার এই জোডিয়াক ট্যুর জীবনের আর এক অমূল্য মুহূর্ত।

বুধবার, ৯ই ডিসেম্বর সাউথ অর্কনী দ্বীপপুঞ্জ (9th December, South Orkney Islands)

আন্টার্কটিকা মূল ভূ-খণ্ডে আছে স্থায়ী বরফের স্তর। আর তার চারপাশের স্তর গরমকালে ও অপেক্ষাকৃত গরম জলের স্পর্শে আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছে। তার জন্য বরফের স্তর আলগা হয়ে ফেটে পড়ছে জলে। সৃষ্টি হচ্ছে ভাসমান বরফের দ্বীপ। জাহাজ মূল ভূ-খণ্ডে ঠিকমত এগুতে পারছে না। ধাক্কা খাচ্ছে বরফের সঙ্গে। এই ধরনের এক ছোট্ট আইস্‌বার্গে ধাক্কা খেয়েছিল টাইটানিক জাহাজ সে কথা আজ কে না জানে? টাইটানিক ফিল্ম আজ জগৎবিখ্যাত। আমাদের জাহাজ আইসবার্গের ধাক্কা সহ্য করার উপযুক্ত আর তাছাড়া রয়েছে সর্বাধুনিক ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট রাডার আর স্যাটালাইট কানেকশন। কাজেই আমাদের ভয় নেই। আমাদের জাহাজ আইসব্রেকার সরঞ্জামে ভর্তি। জলে আইসবার্গ ও স্থলে গ্লেসিয়ার। জলের একই অবস্থার দুই নাম। বরফের জন্য আমাদের জাহাজ কখনও নীচে আবার কখনও উত্তরে ওঠা নামা করতে বাধ্য হচ্ছে।

গত রাতে এলিফ্যান্ট আইল্যান্ড ছেড়ে জাহাজ আবার দক্ষিণের পথ ধরেছে। আজ বুধবার সূর্যোদয় হল দুটো পঞ্চাশ মিনিটে। উৎকণ্ঠাকে চেপে রাখতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেনের কেবিনে উঠে এলাম। জাহাজ চলছে নিজে নিজেই, অটো কন্ট্রোল। রাডার অপারেট করছে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ল্যাটিচ্যুড ৬০°৫০' সাউথ (60°50' South) লংগিচ্যুড ৪৪° ৫৭' ওয়েস্ট (44°57' West)। জলের তাপমাত্রা -২° সেন্টিগ্রেড (-2°C)। বুঝলাম আমরা অনেক দক্ষিণে নেমে এসেছি। গত বছর (১৯৯৭) আমি উত্তর কানাডার ৬০° উত্তর ল্যাটিচ্যুডে ইনুইটদের সঙ্গে ছিলাম কিন্তু দক্ষিণের ঐ একই ল্যাটিচ্যুডে মানুষের কোন স্থায়ী বসতির কথা ভাবা যায় না। যারা আছে তারা একান্ত প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রের লোক।

বলাই বাহুল্য যে আমরা এখন খাঁটি দক্ষিণ মেরুতে। আমরা পোলার সার্কেল পেড়িয়ে এসেছি। ব্রেকফাস্টের পর জাহাজ এসে দাঁড়াল। সামনের দ্বীপটির নাম সাউথ অর্কনে আইল্যান্ড। দ্বীপ সাদা বরফ আর নীল ও সবুজ আবরণের গ্লেসিয়ারে ঢাকা। তারপর লক্ষ্য করলাম সারি সারি কতগুলো কমলা রঙের মেটালিক ঘর। আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

লাউড্‌ স্পীকারে ঘোষণা করা হল : "আমরা এখন সাউথ অর্কনে আইল্যান্ডে (South Orkney Island) এসে পড়েছি।" এটা একটা দ্বীপপুঞ্জ। লিডো লাউঞ্জে

আমাদের ডাকা হল। ডন, গ্রেগ্‌, অ্যামে, কাথারিনা, ইয়ানিস্‌ (Janice), হেইকে (Heike), জন রোমান ও আমি। এক্সপেডিসন লীডার ইয়ান (Ian Bryde) আমাদের ব্রীফিং দিল।

"আমরা অর্কনে দ্বীপপুঞ্জে এসেছি। আমাদের সামনের দ্বীপটার নাম লরী আইল্যান্ড (Laurie Island)। এই উপসাগরের নাম স্কসিয়া বে (Scotia Bay)। আর্জেন্টিনা সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র। এদের মূল কাজ আবহাওয়া ও পেংগুইন গবেষণা। আর এই স্টেশনটার নাম অর্কাডাস (Orcadas)।"

ইয়ান ও ক্যাপ্টেন একটু চিন্তা করে বলল যে আমরা ল্যান্ডিং ও গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করার অনুমতি পেয়েছি তবে জলের ওপর গ্লেসিয়ারের পাঁচিল বেশ উঁচু। জোডিয়াক থেকে ওঠা মুশকিল। যাইহোক অর্কাডাস থেকে ইন্সপেক্টর আসবে সেই আমাদের পরমার্শ দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন নীল পোষাকে চারজন জোডিয়াক নিয়ে আমাদের জাহাজে এলো। একজন ইন্সপেক্টর আর তিনজন মিলিটারি রিপ্রেজেনটেটিভ। আমরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালান। ইন্সপেক্টর মোনাদা (Monada) আমাদের সাথে করমর্দন করে বললেন দীর্ঘ সাত মাস পর এই প্রথম বাইরের লোক দেখছেন। আলোচনার পর আশ্বাস পেলাম, এতদূর যখন আমরা এসে পৌঁছেছি তখন আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে না। এখন বাংকিজের (বাংক ফরাসী শব্দ মানে বেঞ্চ, জলের পর বরফের পাঁচিলকে বলা হয় বাংকিজ) বরফ এখন নরম কাজেই আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছি। আপনারা নামার জন্য প্রস্তুত হোন। আমরা মোনেদা ও তার লোকদের (কম্যান্ডার মোনেদা) ব্রেকফার্স্টে আমন্ত্রণ জানালাম। তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

জাহাজ থেকে জোডিয়াক নামানো হল ৯টা ১০ মিনিটে। কম্যান্ডার মোনাদার কথামত অর্কাডাস পরিদর্শনের জন্য ডাঙ্গা ও জলের মধ্যবর্তি গ্লেসিয়ারকে বিশেষ ধরনের কুড়ুল দিয়ে কেটে সুরঙ্গ করা হল। তারপর সরাসরি শক্ত বরফের স্তর কোন অসুবিধা নেই। আমরা সেই পথে জোডিয়াক ছেড়ে অগ্রসর হলাম।

আন্টার্কটিকায় সম্ভবতঃ এটাই সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। বছরের বারো মাসই খোলা থাকে। তবে শীতের সময় মাত্র দশ জন থাকে। তাঁরা সবাই বৈজ্ঞানিক। শক্ত লোহার ফ্রেমের ওপর প্লাটফরম আর তার ওপর তৈরি করা লোহার ঘর বসানো। কমলা রঙের এই ঘরগুলো অনেক দূর থেকে দেখা যায়। প্রত্যেকটা ঘরে ডিজেলের হিটার সীস্টেম। বছরে দুবার ট্যাংকার আসে ডিজেল সাপ্লাইয়ের জন্য। গরমের সময় এখানে ষাটজন থাকে। আমরা সবাই খুব সাদর অভ্যর্থনা পেলাম। মেটিওরজিক্যাল ল্যাবরেটরী। অতি জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে ভরা। ঠাণ্ডার তারতম্য অনুসারে বাতাসের গতি, জলের স্রোত, তাপমাত্রা আর আবহাওয়া তত্ত্ব বিশ্লেষণের যাবতীয় যন্ত্রগুলো বিশেষজ্ঞ ছাড়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। মিলিটারি গাইড আমাদের বুঝিয়ে দিল যে

এই অর্কাডা স্টেশনটাই দক্ষিণমেরুর সবচেয়ে পুরোনো কেন্দ্র। ১৯০৩ সালে স্কটিস ন্যাশনাল এক্সপেডিসন গ্রুপ এখানে প্রথম গবেষণার জন্য এই কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিল। দলের নেতা ছিলেন উইলিয়াম ব্রুস্ (Scotish National Expediton 1903, led by William Bruce)।

বেস্ থেকে বেড়িয়ে এসে আমরা এদিক ওদিক ঘোরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু নরম বরফে কোমর পর্যন্ত প্রায় বসে যাবার যোগার। তাই বাধ্য হলাম ফিরতে। ফেরার পথে আর একটা লোহার কেবিনের সামনে কয়েকজন আর্জেন্টিনিয়ান সৈনিক আমাদের হাসিমুখে তাদের ঘরে যেতে অনুরোধ করল। লোহার ছোট ঘর আটটা বিছানা সবই দোতলা বিছানা। সামনে একটা সাপাঁ বা ক্রিস্‌মাস ট্রী সুন্দরভাবে সাজানো। তার তলায় ভার্জিন মেরী ও যীশুর শিশু মূর্তি। সাপাঁ বা ফারগাছ (Far) ক্রীস্‌মাস ও বড়দিনের উৎসবের প্রতীক। পাশের একটা টেবিলে বিস্কুট ও ফ্লাস্কে গরম কফি। পরিচিত হলাম, এই আটজনের সঙ্গে। সবাইই সৈনিক। এদের কাজ IAATO'র চুক্তির (Treaty) ওপর নজর রাখা। আজ ডিসেম্বরের ৯ তারিখ। বড়দিনের উৎসব সামনেই। তাই সবাইকে আপ্যায়ন জানাচ্ছে। আমাদের তরফ থেকে কোন কন্ট্রিবিউশন গ্রহণ করল না, হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। শেষের আর একটা কেবিনে আন্টার্কটিকায় পদক্ষেপের জন্য স্যুভনির হিসেবে টুপি ও পোস্টকার্ড বিক্রি হচ্ছে। আর আমাদেরপাশপোর্ট ও লগবুকে তাদের রবার স্ট্যাম্প-এর ছাপ দিয়ে দিচ্ছে। সূর্য মাথার ওপর। আমাদের পরনে ওয়েট ল্যান্ডিং ড্রেস। তার ওপর রয়েছে হ্যাভার স্যাক, ক্যামেরা, দূরবীন, আইস্‌স্টিক কাজেই গরমে ঘাম হতে লাগল। বিশেষ করে এই কাদার মতো বরফ অতিক্রম করা সত্যি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

তীরে পৌঁছে দেখি যে যে পথে আমরা এসেছিলাম সে পথটি সম্পূর্ণ নরম বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। ডাঙ্গা থেকে জলে জোডিয়াক পর্যন্ত যেতে হলে প্রায় দশ ফুট বরফের ঘন কাদা ডিঙ্গোতে হবে। আর ডিঙ্গোতে হলে চাই উপযুক্ত স্নো বুট, র‍্যাকেট। আমরা তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ভাগ্য ভাল অর্কাডাসের অভিজ্ঞ লোকেরা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। একঘন্টার মধ্যে এই পরিবর্তনের সাথে তারা পরিচিত। তাই কাঠ ও প্লাস্টিকের ব্রীজ তৈরি করে আমাদের জোডিয়াকে পৌঁছে দিল। চারদিকের পেংগুইনগুলো আমাদের দুরবস্থা দেখে নিজেদের মধ্যে হয়তো বলাবলি শুরু করেছে—এই জন্তুগুলোর নাম মানুষ। কেনই বা আসছে আর কেনই বা যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

জাহাজে পৌঁছে বাইরের দিকে আবার দেখলাম। অজস্র সামুদ্রিক পাখি (Pintado Petrels, Snow Petrels) জল ও পাহাড়ের ক্লীফ-এর ওপর ঘোরাফেরা করছে। পরিষ্কার আকাশ বরফে ঢাকা পাহাড় আর গ্লেসিয়ারের মধ্যে তাদের উড়ন্ত ছবি এখানকার সৌন্দর্যকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। জাহাজ ছাড়ল জলের ওপর দেখলাম আরও অজস্র করমোরান্ড (Cormorands)।

বৃহস্পতিবার, ১০ই ডিসেম্বর, স্কসিয়া সী (Scotia Sea)

সূর্যোদয় হল ২টো ২৮ মিনিটে, সূর্যোদয়ের জন্য অবজারভেটরিতে বসে ছিলাম। কিন্তু দেখা হল না। কারণ আকাশ পরিষ্কার নয়। দক্ষিণমেরুতে এখন গরমকাল কাজেই রাতের অন্ধকার একদম নেই। বাইরের আলোতে রাত্রিবেলাতেও ডায়েরি লেখা যায়। সূর্যোদয়ের সময়টা নোট করাই ছিল প্রত্যেকদিন রাত্রিতে শোবার আগে সূর্যাদয়ের সময়টা নোট করে নিই। ফিরে গেলাম ডেকে। কেবিন যাত্রীর যাতে ঘুম না ভাঙে তার জন্য খুব ধীরে দরজাটা খুলে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। জাহাজ চলেছে স্কসিয়া সীর মধ্য দিয়ে অতি মসৃণ গতিতে।

৭টায় ওয়েক আপ্ কল্ হল আমি তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। লিডো লাউঞ্জে আগের দিন কথা হয়েছিল যে ওয়েক আপ কলের সাথে সাথে আমার যোগের ক্লাশ আরম্ভ হবে। আনেত ও ক্যাপ্টেন আজ আবার আমাদের সাথে যোগ দিল। যোগের ক্লাসের পর মার্কোপোলা ডাইনিং রুমে এলাম ব্রেকফাস্ট খেতে। ব্রেকফাস্টের বিপুল আয়োজন। ফ্রেঞ্চ ক্রোয়াসঁ (Croissan), কন্টিনেন্টাল ও আমেরিকান সব রকম ব্যবস্থা। সূর্যোদয় দেখার জন্য এবং ভোরের দৃশ্য যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় তার জন্য আমরা দশবারোজন দৃশ্য পাগল লিডো লাউঞ্জের সেল্ফ সার্ভিস ব্রেকফাস্টেই সন্তুষ্ট। তাই আজ এই দৃশ্য দেখে অবাক লাগল। জাহাজ আজ কোথাও থামবে না। সারাদিনই লেকচার ও ইনফরমেশন প্রোগ্রামে ভর্তি। পেংগুইন বিশেষজ্ঞ গ্রেগ, সমুদ্র বিশেষজ্ঞ ডন আর জিওলজি ও ইকলজি বিশেষজ্ঞ জন তারাই সারাদিন বক বক করবে। ক্যাপ্টেনের কেবিন সব রকম প্রশ্নের জন্য খোলা।

শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, গ্রীটভিকেন বন্দর, সাউথ জর্জিয়া দ্বীপ

আমরা লংগিচ্যুড ও ল্যাটিচুডের পরিবর্তনের জন্য এবং বিভিন্ন টাইম জোন পাড় হবার জন্য সব সময়ই রিসেপসনের ঘড়ির সঙ্গে আমাদের ঘড়ি মিলিয়ে নিই। সেটাতেই লোকাল টাইম দেওয়া থাকে নয়তো আমাদের প্রোগ্রাম ধরে রাখা মুশকিল।

সূর্যোদয় হল তিনটে চল্লিশে। আমরা উত্তরে উঠে এসেছি। সাউথ জর্জিয়া দ্বীপটি তিমি শিকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। জাহাজ থেকে দেখতে পেলাম দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু সুন্দর তুষার শোভিত পর্বতশৃঙ্গ। মাউন্ট পাজেট ২৯৩৪ মিটার (Mount Paget 2934 M.)। পাশাপাশি আরও অনেকগুলো প্রায় ২০০০ মিটার উঁচু পর্বতশ্রেণী দ্বীপের শোভা বর্দ্ধন করছে। পাহাড়ের ঢালুতে সুন্দর গ্লেসিয়ারের নদী। মেঘলা আকাশ তবুও গ্লেসিয়ারের সৌন্দর্য ঢাকা পড়েনি। ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি সার্ভ করা হল। আটটার সময় আমরা জোডিয়াক নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

বন্দরে নেমেই আমাদের দৃষ্টি আঘাত পেল। আন্টার্কটিকার সুন্দর ছন্দময় দৃশ্যের পরিবর্তে পেলাম বিরাট সংঘাত। অনেকগুলো ভাঙা বাড়ি, পরিত্যক্ত কারখানা, ভাঙা লোহা লক্কর, পরিত্যক্ত জাহাজের কংকাল, রেল ও ট্রলি ভাঙা, টিন ও প্ল্যাটফর্ম, পরিত্যক্ত মরচে পরা জেটি, বিরাট বিরাট তেল রাখার ড্রাম ও ট্যাংক, একনজরে

দেখলে মনে হবে এই বন্দরের ওপর হঠাৎ বোমা বর্ষণ হয়েছে। কাথারিনা বলল আমরা এখানে এসেছি আমাদের অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে।

গ্রীটভিকেন দক্ষিণ মেরু অভিযানের এক উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। ক্যাপ্টেন কুক, শ্যাকেলটনের (Shackleton) থেকে শুরু করে ব্রিটিশ, নরওয়েজিয়ান, আর্জেন্টিনিয়ান ও আমেরিকান বিভিন্ন নাবিক ও অভিযাত্রীদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এই দ্বীপে। ১৯৩৫ সালে এই দ্বীপটি তিমি ও সীল শিকরীদের তীর্থক্ষেত্র ছিল। হাজার হাজার সীলের চামড়া আর শয়ে শয়ে টন তিমি মাছের চর্বির জন্য এই দ্বীপটি ভরে উঠেছিল কারখানায়। তিমি মাছের চর্বিতে প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক গোলা বারুদের কারখানা চলত। তারপর পেট্রল আবিষ্কারের ফলে আস্তে আস্তে সেই ব্যবসায় ভাঁটা পরে। তারপর আমেরিকানদের হস্তক্ষেপের ফলে আজ আন্টার্কটিকার জলে বা স্থলে সব রকমের শিকার আইনবিরুদ্ধ হয়।

যতই ঐতিহাসিক মূল্য থাক না কেন আমার কিন্তু একদম ভাল লাগল না। আমার কাছে এই গ্রীটভিকেন বন্দর আন্টার্কটিকার এক বিরাট দূষণ কেন্দ্র। আজকাল এখানে একটা সুন্দর মিউজিয়াম করা হয়েছে। সীল ও তিমি মাছের রিসার্চ স্টেশন রয়েছে। এখানকার ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয়ান প্রতিনিধি আমাদের সব ঘুড়িয়ে দেখালেন। এককালে এখানে গরমকালে প্রায় একহাজার লোক কাজ করতো। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে সুদূর ইউরোপ থেকে পালতোলা জাহাজ ও পরে কয়লার স্টীম জাহাজের যুগে কি করে এই বিরাট কারখানা ও ঘরবাড়ির সরঞ্জামগুলো আনা হয়েছিল। শুধু কারখানা ও থাকার বাড়ি নয়, তার সাথে সাথে রয়েছে হাসপাতাল, সিনেমা গীর্জা ও ক্লাবঘর। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই সব পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও চর্বির কারখানাগুলোর মধ্যে অজস্র সীল বসবাস করছে দেখে মনে হচ্ছে এরা জলজন্তু নয় স্থলেরই। আনন্দের বিষয় যে আজকাল আন্তর্জাতিক তিমি, সীল ও পেংগুইন সংরক্ষণ আইন বলে এ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় প্রায় অবলুপ্ত তিমি ও সীলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের গণনাতে জানা গিয়েছে যে এই অঞ্চলে প্রায় তিরিশ লক্ষ (30,000,00) এলিফ্যান্ট সীল, আর প্রায় কুড়ি লক্ষ (20,000,00) পশম সীল আছে। আর অসংখ্য পেংগুইন ও অন্যান্য পাখির এক স্বর্গরাজ্য।

আমি সেখানে বেশিক্ষণ না থেকে আমার গ্রুপ নিয়ে চলে গেলাম পাহাড়ে। আবিষ্কার করলাম এক বিরাট অবিশ্বাস্য পেংগুইন জগৎ। মিউজিয়ামের কিউরেটর পলিন ও টিম (Paulin, Tim) আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল এই পেংগুইন কলোনী দেখার। এখানকার পেংগুইনদের বলে কিং পেংগুইন (King Penguin)। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পেংগুইন, উচ্চতায় নব্বই সেন্টিমিটার (90 cm) ওজনে পনেরো কিলোগ্রাম (15 Kg)। সবচেয়ে বড় পেংগুইনের নাম এম্পেরার। উচ্চতায় এক মিটার, ওজন প্রায় চল্লিশ কেজি (40 kg)। সম্পূর্ণ ভ্যালি ভর্তি কিং পেংগুইন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ। আর প্রায় প্রত্যেকটি পেংগুইনের সামনে তাদের শাবক ধূসর রঙের রোমশ। সত্যি দেখার মত। এদেরই দেশ, আমরা পর্যটক মাত্র।

ফেরার পথে বন্দরে দেখলাম অজস্র এলিফ্যান্ট সীল ওজনে সাড়ে তিন টনের মতো, লম্বায় প্রায় চার মিটার। সামনে দিয়ে যেতে ভয় করে। আচার ব্যবহার সত্যি নিরীহ ও শান্তিকামী। আমরা জাহাজে ফিরলাম বেলা দুটোয়। সবাইই ক্লান্ত। আমার মতে একমাত্র কিং পেংগুইন ছাড়া আমাদের ল্যান্ডিং সফল হয়নি। তবে ইউরোপীয়ানরা সবাইই আনন্দিত কারণ তারা গ্রীটভিকেনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

শেষের কয়েকটা দিন :

আমরা এরপর উত্তরের পথ ধরলাম। ফেরার পথে আমরা আর ড্রেক প্যাসেজ পাইনি। আমরা আরও পূর্বদিকে আন্টার্কটিকার পেনিনসুলা ধরে এগিয়ে এলাম। ফেরার পথে যে সব দ্বীপে থেমেছি তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

শনিবার, ১২ই ডিসেম্বর, সাউথ জর্জিয়া আইল্যান্ড অবতরণ :

কুপার বে, দেখলাম। চিনস্ট্র্যাপ (Chinstrap), পেংগুইন রুকারী (Penguin Rookery), এলিফ্যান্ট সীল, পেট্রেল ডাক্‌স্ (Petrel Ducks), কেল্প গাল (Kelp Gulls) এক ধরনের হিংস্র সীল যাদের নাম বীচ মাস্টার বুল্, কুকুরের মতো মানুষদের তাড়া করে এক নতুন অভিজ্ঞতা। শনিবার ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য আমরা বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারিনি। যারা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ঘোরে তাদের কাছে এই দ্বীপের সামুদ্রিক পাখির প্রাচুর্য ধরা দিল। এখানেই প্রথম দেখলাম রাজহাঁসের মত বিরাট বিরাট আলবাত্রোস (Albatros)।

রবিবার, ১৩ই ডিসেম্বর।

ভোর ৪টের সময় আমরা জোডিয়াক ট্যুরে বেরোলাম। স্যালিসবারী প্লেইন (Salisbury Plain)-এর বিরাট কিং পেংগুইন কলোনী দেখার জন্য। জোডিয়াক থেকে বেরোতেই প্রচণ্ড বাতাস ও বৃষ্টি আমাদের বাধা দিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একটা গ্লেসিয়াল নদী পাড় হয়ে স্যালিসবারী প্লেনে উপস্থিত হলাম। দারুন বৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পেংগুইন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি তাদের কাছে কিছুই না। আমরা প্রচণ্ড বাতাসকে উপেক্ষা করে পাহাড়ের ওপর এগুচ্ছি এমন সময় জাহাজ থেকে অর্ডার এল প্লীজ কাম ব্যাক্...। আমরা ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।

সোমবার, ১৪ই ডিসেম্বর, স্কসিয়া সী

সূর্যোদয় হল তিনটে সাতান্ন মিনিটে। সূর্যাস্ত হবে ৮টা ৫৮ মিঃ। সুন্দর আকাশ জাহাজ স্কসিয়া সী ধরে উত্তরে ফাল্‌ক্‌ল্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্কসিয়া সী আটলান্টিক মহাসাগরের সর্বদক্ষিণাংশ। আজ আর কোথাও থামা হবে না। আর যোগ ব্যায়ামের ক্লাশে এত লোক আসতে শুরু করল যে শেষে স্থানাভাব দেখা দিল। ক্লাশে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন সম্ভবতঃ আন্টার্কটিকায় এই প্রথম সমবেত যোগব্যায়ামের

ক্লাশ হল। অবশ্য জাহাজের লগবুকে সে রকমই লিখেছি। একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা।

সারাদিন আলোচনা, বন্ধুত্ব বিনিময়ের মাধ্যমে দিন কাটল। আমরা কয়েকজন বিভিন্ন ডেকে দূরবীন নিয়ে ঘোরাফেরা করেও কোন তিমি মাছের ঝাঁক দেখতে পেলাম না। ক্যাপ্টেন বললেন আরও পনেরো কুড়ি দিন পর এই অঞ্চলে তিমি মাছের ঝাঁক দেখা দেবে। আমি ভাগ্যবান কারণ এর আগের বার তিমি মাছের ঝাঁক দেখেছিলাম।

১৫ই ডিসেম্বর সারাদিন আমাদের জাহাজেই কাটল। আমাদের লক্ষ্য ফাল্‌ক্‌ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ। ডন ফকল্যান্ডের ইতিহাস, আর্জেন্টিনার সঙ্গে ব্রিটিশদের সংঘাতেরপূর্ণ বিবরণ দিয়ে সময় কাটাল। জাহাজের বারে দু'দিন যাবৎ বেশ আড্ডা জমেচে। স্কসিয়া সী দিয়ে ফেরার পথে জাহাজকে আর সামুদ্রিক বিরাট ঢেউ-এর সম্মুখীন হতে হল না। তাই কারও সী সিক্‌নেস হয়নি।

বুধবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ফাল্‌ক্‌ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সী লায়ন দ্বীপ (Sea Lion Island, The Falklands)

শেষে দিগন্তে দেখা দিল স্থলভাগ। একটি দ্বীপ। জাহাজ এসে পৌঁছল সী আইল্যান্ড দ্বীপে। এখন দুপুর ২টো। ঘোষণা করা হল যে এটাই আমাদের শেষ জোডিয়াক ট্যুর। ড্রাই ল্যান্ডিং-এ কোন অসুবিধা হল না। অনেকদিন পর দেখতে পেলাম বড় বড় ঘাস। চড়ায় পেলাম বিরাট বিরাট কালো রঙের সীল, ডাক নাম সী লায়ন। তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে তিন চার টনের পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

দ্বীপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে সীল, পেংগুইন, সারস ও অন্য অনেক ধরনের পাখি রয়েছে। আর এখানে আনা হয়েছে ভেড়া, গরু, আর ইয়াক। সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ একটা দ্বীপ। দ্বীপের পাহাড়ি সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করল। এখান থেকেই দেখলাম আন্টার্কটিকার সূর্যাস্ত। অতি সুন্দর, আটলান্টিকের ঢেউ-এর কোলে আস্তে আস্তে সূর্যাস্ত হল।

বৃহস্পতিবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮

ভোর পাঁচটায় উঠে আমরা মার্কোপোলো লাউঞ্জে যোগব্যায়াম করলাম, সূর্য প্রণাম আর নীরবতার মাধ্যমে আমরা দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানালাম। সূর্যোদয় হয়েছে ৪টে ২৮ মিনিটে কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা তাই প্রত্যক্ষ দর্শন হলনা। আমরা ভাগ্যদেবতাকে আমাদের এই সফল অভিযানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম। নিজেকে ধন্য মনে করলাম। এই পৃথিবীতে ক'জনের ভাগ্যেই বা এমন সুযোগ আসে।

সাড়ে ছ'টায় (৬টা ৩০মিঃ) মার্কোপোলো লাউঞ্জ বা ডাইনিং রুমে আস্তে আস্তে

সবাই ব্রেক ফার্স্টের জন্য জমা হতে লাগল। হেভি ব্রেক্ফার্স্টের সাথে বিদায়ের করুণ সুরে, মাইক্রোফোনে বেজে উঠল জন্ সেবাস্তিয়ান বাকের (J. S. Bach) একটা সীম্ফনি। আমাদের সামনেই দেখা দিল একটা দ্বীপ। ফাল্ক্ল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের রাজধানী স্ট্যানলে (Stanley)।

রাতেই লাগেজগুলো কেবিনের বাইরে রাখা ছিল। ক্যাপ্টেন গতকাল রাতেই সবাইকে সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেছিলেন। আবার দেখা হবে বলে সবাই সবাইকে গুড্বায় জানিয়ে ঠিকানা বিণিময় করেছিলাম। জাহাজ থেকে ডকে নামতে নামতে প্রায় ন'টা বেজে গেল।

ডকে বাস দাঁড়িয়ে ছিল। স্ট্যানলের মেয়র আমাদের সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আপল্যাণ্ড গুজ হোটেলে (Upland Goose Hotel) চায়ের জন্য আপ্যায়ন জানালেন। অভিযাত্রীদের জন্য স্ট্যানলে মিউজিয়াম ফ্রি। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য আমাদের এই দ্বীপে অবস্থান। বেলা বারোটায় আমাদের প্লেন ছাড়বে সান্তিয়াগোর উদ্দেশ্যে।

স্ট্যানলে নামেই রাজধানী। এক নজরে দেখলে মনে হবে বর্দ্ধিষ্ণু একটা গ্রাম। উশুয়াইয়া এর তুলনায় অনেক বড়। ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনার সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের লড়াই-এর কারণে ফাল্ক্ল্যাণ্ডের কথা আজ সবাই জানে। গ্রেট্ ব্রিটেনের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আর আর্জেন্টিনার একদম কাছে। কাজেই আর্জেন্টিনার দাবী ন্যায়সংগত, কিন্তু রাজনীতি ইতিহাস আর শক্তির দিক থেকে গ্রেট্ ব্রিটেনের দাবী আন্তর্জাতিক মহলে মেনে নিয়েছে।

স্ট্যানলেতে দাঁড়িয়ে বার বার মনে হচ্ছে সেই প্রাচীন কলোনীয়াল আমলের কথা। ছোট ছোট বাংলো টাইপের বাড়ী। বাড়ীগুলোর ধরন দেখলেই বোঝা যায় যে বাড়ীগুলো তৈরি হয়েছে স্থানীয় কাঠ-পাথর দিয়ে। স্ট্যানলের গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমদিকে ভ্যাগাবণ্ড ইংরেজ রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার আর অভিযাত্রী নাবিকদের নিয়েই এই দ্বীপের জনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। ইউরোপ থেকে ক্যাপ হর্ন হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাশ (California gold rush) এর দিকে এগিয়ে যাবার এটাই ছিল প্রধান পথ অর্থাৎ জলপথ। সহজে ধনী হওয়ার স্বপ্নে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে যাওয়ার পথে ও আসার পথে, জাহাজের মেরামতি ও রসদ সংগ্রহের এটাই ছিল মূল ঘাঁটি। ক্যাপ হর্ন-এর ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ে অনেক জাহাজ এখানে পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ হতাশ বা আহত নাবিকদের জাহাজের সম্পত্তিগুলো অনায়াসে স্ট্যানলের গভর্নমেন্ট দখল করে নিত। আর তাছাড়া সে যুগের সবচেয়ে বড় আয় ছিল তিমি শিকার।

বর্তমানে স্টানলেতে দেখা যায় বহু ভেড়ার ফার্ম। ভেড়ার মাংস আর উৎকৃষ্ট উলের জন্য স্ট্যানলে বিখ্যাত। আর মাছের ব্যবসা তো আছেই।

এক নজরে দেখলে মনে হয় একটি শান্ত শহর মূল ভূখণ্ডের থেকে অনেক দূরে

হলেও এখানকার প্রত্যেকটি বাড়িই ছোটখাটো বাংলো ধরনের সাজানো গোছানো। প্রত্যেক বাড়িতেই ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস ও তেলের প্রাচুর্য। খাবার জন্য এদের বাইরে থেকে কিছুই আনতে হয় না। তবে উচ্চ শিক্ষা বা ইউনিভার্সিটির জন্য এদের যেতে হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যাণ্ডে। এখানকরা মূল আকর্ষণ গভর্নমেন্ট হাউস আর মিউজিয়াম।

একঘন্টায় সাইট সীইং করে আমরা এসে উঠলাম আপল্যাণ্ড গুজ হোটেলে। সেখানে চা, বিস্কুট, কফি, কেক-এর মাধ্যমে আমাদের সম্বর্ধনা ও বিদায় জানানো হল। আবহাওয়াটা একটু শুকনো বলে মনে হল।

এরপর আমাদের ফেরার পথ। শহর থেকে প্রায় আধঘণ্টা পীচের রাস্তা ধরে আমরা এসে পৌছলাম এখানকার মিলিটারী এয়ারপোর্টে। আমাদের স্পেশাল ফ্লাইট ল্যান চিল (Lan Chile)-এর সাতশ সাত বোয়িং আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। কাস্টম্‌স্ চেক্ এর প্রয়োজন হল না শুধু লাগেজগুলো আইডেন্টিফাই করা হল।

আবার সেই পথ তুষারাবৃত ও ফিওর্ডসংকুল করদিয়েরা দেজান্দেস্ এর সুন্দর দৃশ্যের ওপর দিয়ে আমরা ধরলাম সান্তিয়াগোর দা চিলির আকাশ পথ।

পরিশিষ্ট

আনন্দ সংবাদ : নুনাভুত (NUNABHUT)

শুনতে অনেকটা নুনাভুতের মতো হলেও বাংলার সাথে এই নুনাভুত শব্দের কোনো মিলই নেই। "নুনাভুত" ভাষাটা ইনুক্‌তিতুত (INUKTITUT)। মানে, "আমাদের দেশ" অর্থাৎ এস্কিমোদের দেশ। আমি আগেই লিখেছি যে আজকাল এস্কিমো কথাটা অচল তাদের বলে ইনুইত (INUIT)। আমি ভারতীয় পর্যটকদের সুবিধার জন্য এস্কিমো কথাটা ব্যবহার করেছি। নুনাভুত ইনুইতদের দেশ। স্বাধীন রাজ্য কিন্তু স্বাধীন দেশ নয়। কানাডার অধীনে। উত্তর কানাডার এই নতুন রাজ্যটির রাজধানী ইকালুইত্ (IQALUIT)। অবস্থান গ্রীণল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে, আলাস্কার দক্ষিণ পূর্বে, লাব্রাডার সাগর ও হাড্‌সন বে'র উত্তরে, ৬০°ল্যাটিচুডের উত্তরে। ইনুইতদের দেশ নুনাভুতের মধ্য দিয়েই আর্কটিক সার্কেল ঘুড়েছে।

১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ইনুইত জাতির এই নুনাভুত দেশটি স্বাধীন হল। আমার ইচ্ছা থাকলেও তাদের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করতে পারিনি তাই এ বছর ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এখানে এসেছি। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু ডায়েরিটা পুরোনো কিন্তু সময়াভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বন্ধু-বান্ধব ও পর্যটকদের চাপে পড়ে এবার লেগে গেলাম কাজে। আশা করি ২০০২ সালের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হবে। নুনাভুত অংশটা তাই জুড়ে দেওয়া সম্ভব হল।

"ইন্‌উইত"-দের নতুন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেল কানাডার এই নর্থ ওয়েস্ট টেরিটরির বিরাট অংশ। সাত লক্ষ সত্তর হাজার বর্গমাইল (7,70,000 Square miles) উত্তর মেরুর এই বিরাট অংশের লোকসংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার। এই লোক সংখ্যার অনেকেরই আদি বাসস্থান ছিল গ্রীণল্যাণ্ড বা সাইবেরিয়ায়। কানাডা সরকার এখন অন্যান্য উত্তর মেরুর যাযাবর বা বাসিন্দাদের এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই অঞ্চলে যদিও চাষযোগ্য জমির অভাব কিন্তু সামুদ্রিক জীব ও মাছের প্রাচুর্য। জল আর বরফের দেশ। নুনাভুতের রাজধানী ইকালুইত্ (IQALUIT)। নামেই রাজধানী। আলাস্কার অ্যাংকরেজ বা জুনো এর থেকে অনেক বড়। এখানকার পীচের রাস্তা মাত্র ২০ মাইল। দেশের সর্বত্রই কুকুরে টানা স্লেজ অথবা বল্গা হরিণের টানা গাড়ী। নুনাভুতের উত্তরাংশ সম্পূর্ণটাই আর্কটিক মহাসাগরের অংশ, বিশেষ করে এলেসমোর আইল্যাণ্ড (ELLESMERE

ISLAND) থেকে উত্তর মেরুবিন্দু (North Pole Point) যাবার জন্য বর্তমান পর্যটক অভিযাত্রীরা এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। গ্রীণল্যাণ্ড অথবা এলেস্‌মের আইল্যাণ্ড থেকে উত্তর মেরুর বিভিন্ন অঞ্চল অভিযানের জন্য কুকুরের ও শ্লেজগাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে যে সব অভিযাত্রী পর্যটক নুনাভুতে আসার পরিকল্পনা করবেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ হচ্ছে : সরাসরি মন্‌ট্রিয়াল (ফরাসী উচ্চারণ মঁরিয়াল) অথবা টরেন্টো বা অটোয়া থেকে সরকারী কোন পর্যটন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে প্লেনে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। নিজস্ব ট্র্যান্সপোর্ট বা গাড়ী না থাকলে প্লেনে যাতায়াতই সবচেয়ে সুবিধাজনক। অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি নুনাভুতের বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ইতিহাসের পাতা থেকে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযান

উত্তর মেরু অভিযান ঃ

১৮৪৬ সাল (1846)	আলাস্কার উত্তর থেকে ব্যারো প্রণালী হয়ে একদল অভিযাত্রী জাহাজে পাড়ি দেয় উত্তর পশ্চিমের পথে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জলপথে উত্তর মেরুর পথ আবিষ্কার করা। লর্ড ফ্র্যাংকলিনের সেই জাহাজটি উত্তর মেরুর পথেই হারিয়ে যায়। তারও অনেক পরে পরের অভিযাত্রী দল সেই পথে যাওয়ার সময় পূর্ব্বোক্ত দলের একটি মাত্র মৃতদেহ উদ্ধার করে। ব্যারোর কাছে বেরচে দ্বীপে (Berchey Island) সেই প্রথম অভিযাত্রী দলের একটি প্রস্তরলিপি, তাদের সম্মানার্থে স্থাপিত হয়েছে।
১৮৬১ সাল (1861)	ফ্রিডজোফ নানসেন (Fridjof Nansen)। প্রথম অভিযাত্রী যিনি হেঁটে সম্পূর্ণ গ্রীণল্যাণ্ড ঘুরেছেন। বিশেষ করে গ্রীণল্যাণ্ডের দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত। নরওয়ের এই তরুণ অভিযাত্রীর বয়স ছিল ২৮ বছর।
১৮৯৪ সাল (1894)	তেত্রিশ বছর পর ওই একই অভিযাত্রী নান্‌সেন, জাহাজ নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন জলপথে উত্তর মেরু আবিষ্কারে। তিনি উত্তর মেরুর খুবই কাছে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় উত্তর মেরু পৌঁছতে পারেননি। তার জাহাজ আইস্‌বার্গে আটকে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন দীর্ঘ দু বছর পর। নরওয়ের এই জাহাজটির নাম ছিল Fram বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়াবে "এগিয়ে চল"।
১৯০৮ সাল (1908)	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেডেরিক্ কুক্-এর (Frederick) বিরাট একক অভিযানের সঙ্গে ছিল

দশজন এস্কিমো, এগারোটি শ্লেজ আর (১০৫) একশ পাঁচটি কুকুর। উদ্দেশ্য নর্থপোলে পৌঁছানো। ১৯০৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী যাত্রা করে ফিরে আসেন ১৯০৯ সালের ১৮ই এপ্রিল সম্পূর্ণ একা। একটা কুকুরও ফিরে আসেনি।

১৯০৯ সাল (1909)

সম্পূর্ণ একা উত্তর মেরু অভিযান থেকে ফিরে এসে ফ্রেডেরিক কুক্ নিজেই ঘোষণা করলেন যে, তিনিই প্রথম উত্তর মেরু বিজয়ী—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তার এই বিজয় অভিযান কোন সরকারি বা বেসরকারি স্বীকৃতি পেল না। তারই পাঁচদিন পর ফিরে এল রুজভেল্ট জাহাজে কমাণ্ডার পিয়েরী (Commander Peary)। তিনি উত্তর মেরুর কেন্দ্রে ৮৯° (89^0) প্যারালালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা গেঁথে ফিরে এলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কমাণ্ডার পিয়েরীকেই প্রথম উত্তর মেরু বিজয়ী আখ্যা দেওয়া হল।

১৯১২ সাল (1912)

রাশিয়ার অন্তর্গত উত্তর মেরু অঞ্চল অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গেরগুই সেদোভ্, পুরো নাম Gueorgu Yakovlevitch Sedov। তিনি একা স্কি-এর সাহায্যে উত্তর মেরু কেন্দ্রের প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। দারুণ ঠাণ্ডায় তার মৃতদেহটাকে প্রায় অক্ষত পাওয়া গেছে তার তিরিশ বছর পর।

১৯২৬ সাল (1926)

জাহাজে, পায়ে হেঁটে, শ্লেজে করে উত্তর মেরু বিজয়ের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে হার মানিয়ে শুরু হল আকাশ পথে উত্তর মেরু বিজয় অভিযান। ১৯২৬ প্রথম নরজ্ (Norge) নামক বেলুন উত্তর মেরু কেন্দ্র অতিক্রম করে। ঠিক সময়টা ছিল ১৯২৬ সালের ১২ই মে রাত ১টা ১৫মিনিট। বেলুনটা ছেড়েছিল স্পিটবার্গ থেকে উত্তর মেরু কেন্দ্র অতিক্রম করে সরাসরি পৌঁছেছিল আলাস্কায়। বেলুনে উত্তর মেরু কেন্দ্র অভিযানের আরও কয়েকটা বিফল অভিযান হয়েছিল।

১৯২৬ সাল (1926)

১৯২৬ সালে বেলুনে উত্তর মেরু কেন্দ্র অতিক্রম অভিযানের দলনেতা ছিলেন নরওয়ের শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী রোয়াল্‌ড্‌ আমুণ্ডসেন (Roald Amundsen)। পরে তিনি আবার চার মোটরের একটা প্লেনে ঘুড়ে এলেন উত্তর মেরু। ঐ একই সালে আমুণ্ডসেনের আকাশ পথ অনুসরণ করে আমেরিকার এক তরুণ পাইলট রিচার্ড বীর্ড (Richard E. Byrd) তার ফোকার মোনোপ্লেনে (Fokker Monoplan) ঘুড়ে এল নর্থপোল পয়েন্ট।

১৯২৭ সাল (1927)

অভিযাত্রী ক্নুড রাসমুসেন (Knud Rasmussen) নিঃসন্দেহে একক নর্থপোল অভিযাত্রীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি একা সম্পূর্ণ গ্রীণল্যাণ্ড এবং আলাস্কা পায়ে হেঁটে ঘুড়ে এলেন। তিনি বেরিং স্ট্রেটও পাড় হলেন। পিতা ডেনমার্কের এবং মাতা গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমো। পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন দূরে যাবার নেশা আর মা'র কাছ থেকে শিখেছিলেন বরফের সাথে যুদ্ধ করার মনোবল। গ্রীণল্যাণ্ডের ইতিহাসে রাসমুসেনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

১৯২৮ সাল (1928)

ইটালিয়ান পাইলট বেলুনে করে দ্বিতীয়বার উত্তর মেরু অভিযানে বেরোন। ১৯২৬ সালে আমুণ্ডসেনের সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন এবার সম্পূর্ণ একা। ইটালিয়ান এই অভিযাত্রীর নাম উমবের্তো নোবিল (Umberto Nobile)। তিনি সফল হয়ে ফিরে আসার পথে নীচে একটি আইস্‌বার্গের সঙ্গে ধাক্কা খান, আহত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এক সুইডিশ পাইলট তার লাল রঙের তাঁবু দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

১৯৩৭ সাল (1937)

সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নর্থপোলে সাইনটিফিক মিশন পাঠান। ১৯৩৭ সালের এই প্রথম অস্থায়ী গবেষণা কেন্দ্রের

দলনায়ক ছিলেন ইভান পপেনিন (Yvan Papanine)। টেলিকমিউনিকশন ও মেটিওরলজি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি নর্থপোলে দুশ চুয়াত্তর দিন (২৭৪দিন) কাটান। এস্কিমোদের মত ইগ্‌লু করে তার মধ্যে তার বৈজ্ঞানিক সহকর্মীদের তাঁবু খাঁটিয়ে বাস করে তিনি দেখিয়ে দিলেন শুধু ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল থাকলে মানুষ কি না করতে পারে।

১৯৫৯ সাল (1959)

১৯৫৯ সালের ১৭ই মার্চ ইউনাইটেড স্টেটস্ এর প্রথম নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নর্থপোল পয়েন্টের বরফের ছাত মাথার ওপর রেখে নির্বিঘ্নে পাড় হল উত্তর মেরু। প্রমাণিত হল যে উত্তর মেরুকেন্দ্র শুধু বরফ নয় তার তলায় রয়েছে সাগর। সাবমেরিন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। অবশ্য সাধারণ সাবমেরিন নয় প্রবল শক্তিশালী নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। এই সাবমেরিনটির নাম ছিল স্কেট্ (Skate)।

১৯৭৭ সাল (1977)

সোভিয়েত নিউক্লিয়ার জাহাজ আর্কটিকা (Arctika) জলপথে গ্লেসিয়ারের পাহাড় ভেঙে নর্থপোলে পৌঁছল, ১৭ই আগস্ট ১৯৭৭ সালে। সোভিয়েতের ৭৫০০০ হর্স পাওয়ারের (75000 H.P.) এই জলদৈত্য, বলাই বাহুল্য যে সেই সময়ে সেটাই ছিল পৃথিবীর সেরা শক্তিশালী আইস্‌ব্রেকার।

১৯৭৮ সাল (1978)

জাপানী এক্সপ্লোরার উয়েমুরা (Uemura), একক প্রচেষ্টায় উত্তর মেরু অভিযান করলেন। তার পর থেকে উত্তর মেরু কেন্দ্রের পথ অভিযাত্রীদের সহজ হয়ে গেছে। আজ ইউরোপের প্রত্যেক অভিযাত্রীই একক চেষ্টায় মেরু কেন্দ্রে পৌঁছবার ঝুঁকি নিচ্ছে। আজকাল সরঞ্জাম, খাদ্যভাণ্ডার আর সহজ মোবাইল টেলিফোনের সুবিধার জন্য অতীতের দুর্গম পথ আজ সুগম হয়ে উঠেছে। প্লেন ও হেলিকপ্টারের সাহায্যে অনেক পর্যটক অভিযাত্রীদের পক্ষেও উত্তর মেরু আজ নাগালের মধ্যে।

দক্ষিণ মেরু অভিযান :

১৮৩৮ সাল (1838)	দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার একজনের দ্বারা নয় অভিযাত্রী নাবিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই নতুন আবিষ্কার। আন্টার্কটিক গ্রীক্ শব্দ। আর্কটিক উত্তর মেরু তার বিপরীত আন্টি-আর্কটিক। ফরাসী নাবিক এবং অভিযাত্রী দুমঁ ডুরভিল (Dumont D'urville) সর্ব্ব প্রথম আন্টার্কটিক যাবার পরিকল্পনা করেন এবং তিনিই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে আন্টার্কটিকের পথে তার জাহাজ নিয়ে যান।
১৮৪০ সাল (1840)	১৮৪০ সালে তিনি প্রথম আন্টার্কটিক পৌঁছন এবং তার সহধর্মিনীর নামানুসারে দক্ষিণ মেরুর এই নব-আবিষ্কৃত বরফ ভূমির নাম রাখেন আদেলী (Adelie)। তিনি সেখানে ফরাসী পতাকা গাঁথলেন। তার পালতোলা জাহাজটির নাম ছিল অ্যাস্ট্রোল্যাব (Astrolab)।
১৮৪১ সাল (1841)	জেমস্ ক্লার্ক রস্ (James Clark Ross)। ১৮২৯ সালে মিঃ রস্ উত্তর মেরুর ম্যাগনেটিক পোল আবিষ্কার করেন আর ১৯৪১ সালে তিনি এরেবুস্ (Erebus) জাহাজে আন্টার্কটিকার যে অঞ্চলে পৌঁছন তারই নামানুসারে নাম রাখা হয় রস্ সী (Ross Sea)।
১৮৯৯ সাল (1899)	নরওয়ের অভিযাত্রী কার্স্টেন বর্সগ্রেভিংক (Carstens Borchgrevink) প্রথম শীত কালে দক্ষিণ মেরুতে কাটিয়েছিলেন তার সঙ্গে ছিল তারই এক বন্ধু, দুজন ল্যাপবাসী, শ্লেজগাড়ী ও কুকুর।
১৯০২ সাল (1902)	১৯০২ সালের ২১শে জানুয়ারী ডিস্কভারী (Discovery) নামক বেলুনে চড়ে প্রথম আকাশ পথে যিনি রস্ বেরিয়ার (Ross Barier) পাড় হলেন তার নাম রবার্ট ফাল্কন্ স্কট (Robert Falcon Scott)।
১৯০৯ সাল (1909)	ব্রিটেনের অভিযাত্রী শ্যাক্লেটন (Shackleton) এর আন্টার্কটিকা অবতরণ।
১৯১১ সাল (1911)	আন্টার্কটিকার ইতিহাসে একটি অমর নাম রোয়াল্ড্ আমুণ্ডসেন (Roald Amundsen) ১৮ই

নভেম্বর ১৯১১ সালে তিনি দক্ষিণমেরুর মেরু বিন্দু বা মেরু কেন্দ্রে নরওয়ের পতাকা বসিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে ছিল চারটি শ্লেজ গাড়ী আর বাহন্নটি কুকুর। তারই নিকট প্রতিযোগী ছিল গ্রেট ব্রিটেনের রবার্ট ফাল্‌ক্‌ন স্কট্‌ (Robert Falcon Scott)। দুর্ভাগ্যের বিষয় মিঃ স্কট আমুণ্ডসেনের আগে পাড়ি দিয়েও শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না পথেই মারা যান। কিন্তু স্কটের নাম আমুণ্ডসেনের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। দক্ষিণমেরু কেন্দ্রে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র আমুণ্ডসেন ও স্কটের নামানুসারেই রাখা হয়।

১৯২৮-১৯২৯ সাল (1928–1929) আন্টার্কটিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ঘাঁটি স্থাপন। কেন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল Residents। এক্সপেডিসন লীডার ছিলেন রিচার্ড বীর্ড্‌ (Richard Byrd)। আমেরিকার অভিযাত্রী পাইলট বীর্ড ১৯২৬ সালে আমুণ্ডসেনের সঙ্গে উত্তর মেরু অভিযানেও গিয়েছিলেন।

১৯৩৬ সাল (1936) ফরাসী সরকার কর্তৃক আন্টার্কটিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন। ব্যবস্থাপনায় মঁসিও শারকোত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৫০ সাল (1950) ফরাসী অভিযাত্রী পল্‌ এমিল্‌ ভিক্টর (Paul Emil Victor) দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করলেন।

১৯৫৬ সাল (1956) দক্ষিণমেরুর কেন্দ্রস্থলে (আজ যেখানে আমুণ্ডসেন ও স্কটের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে) ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৬ আমেরিকার বিরাট অভিযাত্রী বাহিনী নিয়ে পৌঁছল বিমান ডি সি-৩ (DC-3)। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য দক্ষিণমেরু কেন্দ্রে এই প্রথম বিমান অবতরণ।

১৯৫৬ সালেই আন্তর্জাতিক জিওফিসিক্স বর্ষ হিসেবে ঘোষিত হল। সেদিন থেকেই ঠিক হল যে আন্টার্কটিক বা দক্ষিণমেরু কোন জাতি বা দেশের সম্পত্তি নয় পৃথিবীর মানবজাতির এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। অভিযান, শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার-এর জন্যই আন্টার্কটিকায় ছোট ছোট স্থায়ী বা অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা যেতে পারে।

আন্টার্কটিকা ভ্রমণের টুকিটাকি :

আন্টার্কটিকা যেতে হলে যে কোন আন্তর্জাতিক ট্রাভেলিং এজেন্সির সঙ্গে আগে যোগাযোগ করা দরকার। আমি যে সংস্থার মাধ্যমে দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম তার ঠিকানা :

Society Expeditions
2001 Western Avenue, Suite 300
Seattle
Washington 98121
U.S.A.

ভাড়া : Miam-Santiago-Ushuaia যাতায়াত প্লেনে উশুয়াইয়া-আন্টার্কটিকা-পোর্ট স্ট্যানলে। ক্রুজ ডবল কেবিন, সাধারণ এবং সবচয়ে সস্তা। ২১/২২ দিনের সবশুদ্ধ খরচ পড়বে কমপক্ষে দশ হাজার ইউ এস ডলারের (10000 U.S. $) মত। গ্রুপ হলে আরও কম (১৯৯৮ সালের আনুমানিক বাজেট)।

ভারতবর্ষ থেকে সুবিধা হচ্ছে মাদ্রীদ-সাওপোলো-উশুয়াইয়া তারপর সেখান থেকে জাহাজ ধরা। বাজেট ধরতে হবে কম করে এগারো হাজার ডলার (11000 U.S. $)

ইউরোপে Kuoni-Zericann-Artou এবং দক্ষিণ মেরুর অন্যান্য Travel Agency আছে। ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ মেরু অভিযান বিরাট খরচসাপেক্ষ।

পোষাক : চার সেট পোষাকের বিশেষ প্রয়োজন।

১। উইন্ড প্রুফ ও ওয়াটার প্রুফ কাওয়ে ধরনের, টুপী, জ্যাকেট, প্যান্ট, জুতো।
২। মাউন্টেনীয়ারিং আনোরাক প্যান্ট, টুপী, জুতো।
৩। অল প্রুফ কম্বিনেশন আন্ডারউয়ের।
৪। নরমাল স্নোপ্রুফ সেট।

চার রকমের জুতো, চার রকমের জ্যাকেট, চার রকমের প্যান্ট এবং সে অনুযায়ী টুপি, মোজা, হাত-মোজা ইত্যাদি।

অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য এক্সপেডিশন গ্রুপ লীডারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে কারণ তা নির্ভর করছে গন্তব্যস্থলের ওপর এবং কতদিন কোথায় থাকবে তার ওপর।

জাহাজে যারা দলবদ্ধ হয়ে যাবেন তাদের জন্য জাহাজ কর্তৃপক্ষ পারকা, জুতো, লাইফ বেল্ট ও হ্যাভারস্যাক সরবরাহ করে থাকে।

[১৯৯৫ সালের আলাস্কা ভ্রমণের এই অংশটি সংক্ষেপে পুনঃপ্রকাশিত হল]

উত্তর মেরু

আলাস্কা

[পথ : জেনেভা - ভ্যাংকুভার - কেচিকান - জুনো - অ্যাংকরেজ - ফেয়ারব্যাঙ্ক - ব্যারো - অ্যাংকরেজ - ভ্যাংকুভার - জেনেভা]

২৯শে জুন, ১৯৯৫ — ২০শে জুলাই, ১৯৯৫

29th June, 1995 — 20th July, 1995

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া দুই মহাশক্তির মাঝখানে Bering Sea

হিমবাহ ভেঙ্গে পড়ছে

উপরের ছবিরই কয়েক ঘন্টা পরের দৃশ্য

উত্তরমেরু যাতায়াতের জন্য ফ্লোটিং প্লেন

মাউন্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে, উচ্চতা—৬২০০ মিটার
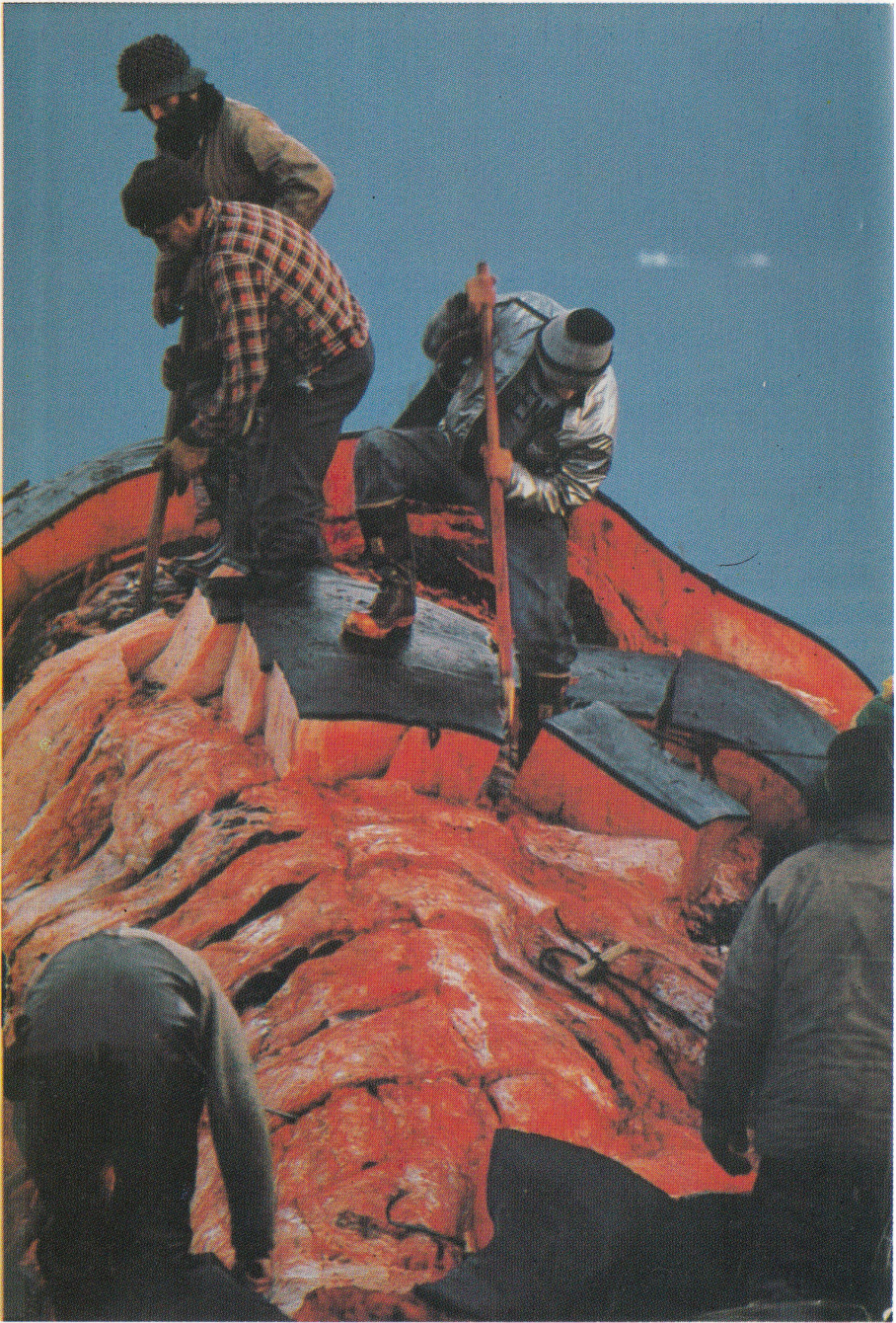
একটি তিমি মাছ কাটার দৃশ্য

শিকারের সন্ধানে মধ্যরাত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোলার বিয়ার মা ও শিশু
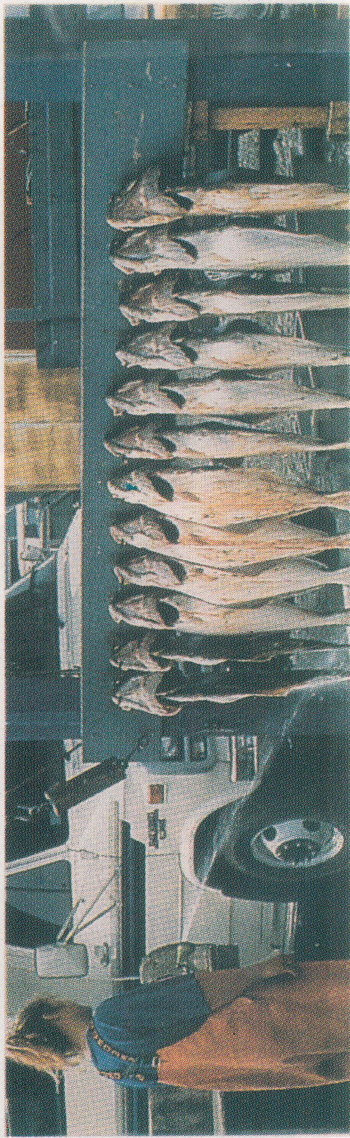
কেচিকানের ফিস্ প্যাকেজিং সেন্টার—ছবিতে সালমন মাছ ধোওয়া হচ্ছে

উত্তর আমেরিকার সর্বোত্তরের শহর ব্যারোজ, অধিকাংশই সরকারী সংস্থা

একটি এস্কিমো 'ইনুইট' ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। দুঃখের বিষয় মদ্যপান ও ধূমপান দিন দিন বেড়েই চলেছে

প্রকৃতি দেবীর এক বিচিত্র লীলা—গ্লেসিয়ার আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছে,
— এক অনবদ্য দৃশ্য

অ্যাংকরেজ শহর

উত্তর মেরু ও মেরুবাসী বিভিন্ন ইনুইত্ সম্প্রদায়
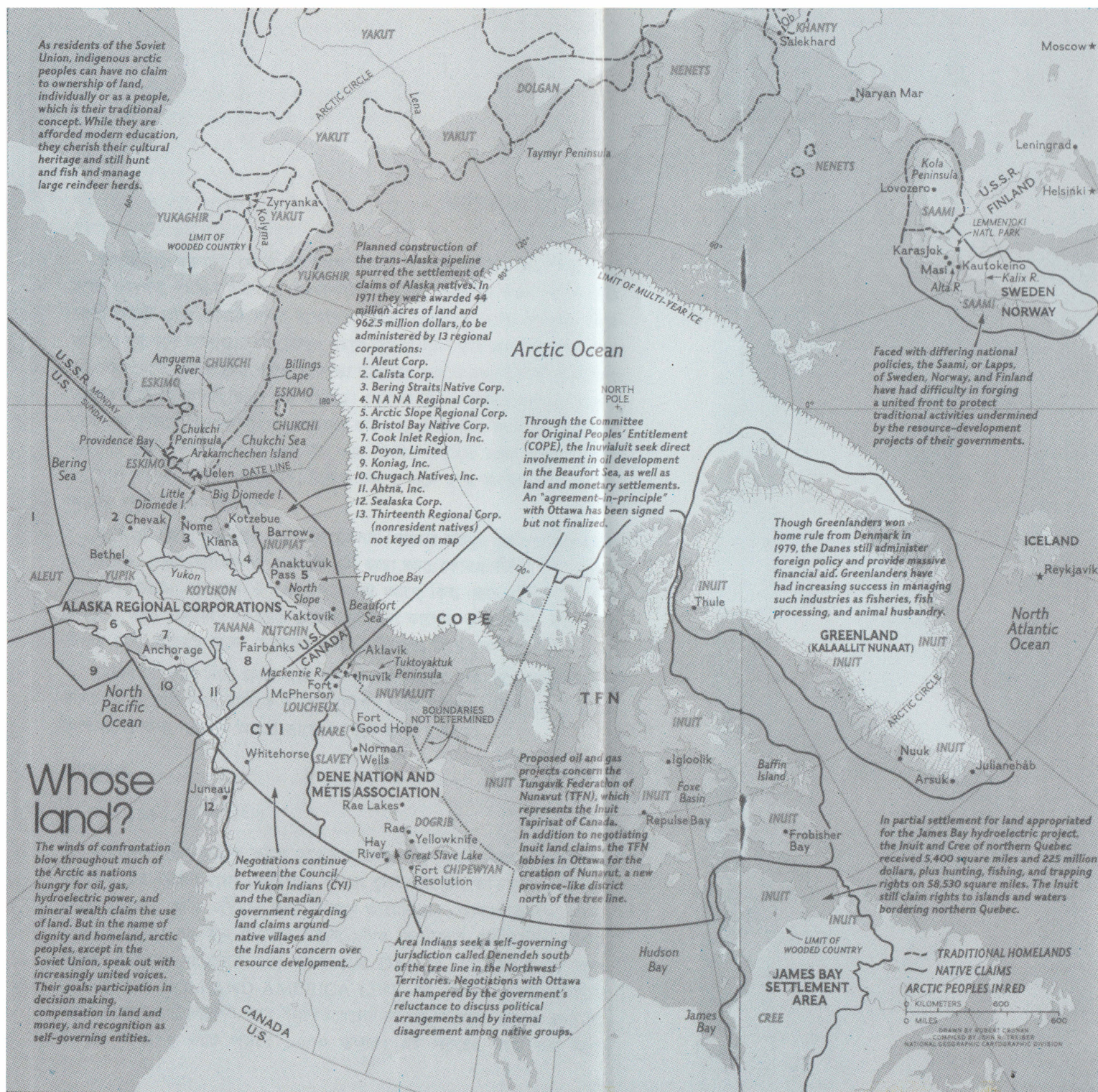
আলাস্কা অভিযান

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাস্কায় যাবার সবচেয়ে সুন্দর আকর্ষণীয় রাস্তা হচ্ছে জলপথ, মেরিন হাইওয়ে। ওয়াশিংটন স্টেটের সেয়াটল বন্দর থেকে গাড়ি ফেরি বোটে তুলে নেবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। স্কাগওয়ে পর্যন্ত জলপথে গিয়ে তারপর স্থলপথে আলাস্কার যে কোনও শহরে যাওয়া যায়। যারা সরাসরি ড্রাইভ করে আলাস্কা যেতে চান তাদের পক্ষে আলাস্কা হাইওয়ে ধরা ভালো। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ডওসন সিটি থেকে এই রাস্তা শুরু হয়েছে। শেষ হয়েছে ফেয়ারব্যাংকস-এ। রাস্তার দূরত্ব এক হাজার পাঁচশো মাইল। নামেমাত্র হাইওয়ে, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় ষাট মাইলের বেশি স্পিড নেওয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্ছে রাস্তায় সহজে পেট্রোল পাম্প চোখে পড়বে না। চলতে চলতে মনে হবে জনমানবহীন সম্পূর্ণ আরেক জগতে এসে পড়েছি।

আমি এ রাস্তায় দশ বছর আগে গিয়েছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে একমাত্র আংকরেজ, ফেয়ারব্যাংকস ও হোয়াইট হর্স ছাড়া অন্য কোনও বিরাট শহর চোখে পড়েনি। রাস্তায় রেস্তোরাঁ ও মোটেল যথেষ্ট আছে কিন্তু খরচ বেশি। সবচেয়ে অসুবিধা গাড়ি মেরামতের। গাড়ি ব্রেকডাইন হলে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই নিজে মেরামতি করার অভিজ্ঞতা নিয়ে চলা ভালো।

মেরিন হাইওয়ে দিয়ে চলার মজা হল অসংখ্য দ্বীপের মধ্য দিয়ে জাহাজ চলে। ডানদিকে পাহাড়ি দৃশ্য, বাঁদিকে দ্বীপের সৌন্দর্য। গত বছরের আমার এই আলাস্কা অভিযানের কথা সরাসরি আমার ডায়েরি থেকে তুলে ধরলাম।

ভাংকুভার

২৯ জুন, ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার

আমাদের পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার জন্য জন্য সবাই মিলে জড়ো হলাম ভ্যাংকুভারের ডেল্টা প্লেস হোটেলে। আমরা মোট সাতজন অভিযাত্রী। ইউরোপ থেকে তিনজন, আমি এশিয়ান, আর তিনজন আমেরিকান। আমরা সাতজন এখানে এসে পৌঁছেছি। ৩০ জুন শুক্রবার সকাল ৯টায় হোটেলের ডেলিগেটস লাউঞ্জে আমরা বসলাম। আমাদের সঙ্গে যোগ দিল DANZA TRAVEL-এর দুজন প্রতিনিধি আর HOLLAND AMERICA LINE-এর একজন। ওরাই আমাদের টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্ট আর ইনশিওরেন্সের দায়িত্ব নিয়েছে। গ্রুপের জন্য সব মিলিয়ে মাথাপিছু খরচ পড়বে ১২০০ ডলার। এই খরচের মধ্যে ধরা আছে

ভ্যাংকুভার থেকে আলাস্কা গিয়ে ভাংকুভার ফেরা ছাড়াও হোটেল ও ফেরি বোট এবং জাহাজের খাওয়া। ব্যারো ও ফ্লোটিং বোটের খরচ আলাদা। জলপথেই আলাস্কা যাব, অর্থাৎ Marine Highway ধরে যাব। তাতে সাউথ ইস্ট আলাস্কার ফিওর্ডগুলোর সঙ্গে পরিচয় হবে।

ভ্যাংকুভার ইনসাইড প্যাসেজ ধরে প্রথম থামব কেচিকান, তারপর রাজধানী জুনো, সিটকা, হাবার্ড গ্লেসিয়ার, ভালডেজ, কলম্বিয়া গ্লেসিয়ার, হোয়াইটিয়ার, অ্যাংকরেজ, ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক, ফেয়ারব্যাংক, ব্যারো, অ্যাংকরেজ ভ্যাংকুয়ার। আমরা কাগজপত্রে সই করে সব বুঝে নিলাম।

কেচিকান

১ জুলাই, শনিবার

আজ আমরা আলাস্কার উদ্দেশে রওনা হলাম। আমাদের নিয়ে সকাল ১০টায় হল্যান্ড আমেরিকা লাইন্সের জাহাজ ভ্যাকুভার বন্দর ছাড়ল। বিরাট জাহাজ সখের বোট সবসুদ্ধ প্রায় তিনশো জন। সবাই যাচ্ছে গ্লেসিয়ার দেখতে, সখের ভ্রমণ। আমরা গ্লেসিয়ারের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করেছি। আমাদের ডাবল কেবিন। জাহাজে খাওয়াদাওয়া, আমোদপ্রমোদ, গাইড রেস্টুরেন্ট-বার, ড্যান্সিং কোনও কিছুরই অভাব নেই। জাহাজ প্রথমদিকে মনে হল মহাসাগরে পড়েছে কিন্তু ৭ ঘন্টা পর আস্তে আস্তে বাঁদিকে কয়েকটি দ্বীপ রেখে ভেতরে ঢুকল। এবার দুদিকে সবুজ দ্বীপ ও বনভূমির সুন্দর দৃশ্য। অনেকটা সোসাইটি আইল্যান্ডের মতো। আমরা এবার কানাডা ছেড়ে আলাস্কা জোন-এ এসে পড়লাম। জাহাজটা নদীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। এরই নাম মেরিল হাইওয়ে। ডানদিকে প্রিন্স রাপার্ট, বাঁদিকে মাতলাকাতিয়া দ্বীপ ছেড়ে তিনদিনের দিন আমরা পৌঁছলাম আলাস্কার একটি ছোট্ট বন্দর শহর কেচিকানে।

৩ জুলাই, সোমবার

আজ সকাল ১০টা নাগাদ জাহাজ ছেড়ে বন্দরে পা দিলাম। কেচিকান মাছ ধরার বন্দর। এখানে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের শ'খানেক জাহাজ ও ছোট ছোট ফিশিং বোট নজরে পড়ল। একটা ফিশ প্যাকেজিং সেন্টার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সালমন মাছগুলোকে মেশিনেই আঁশ ছাড়ানো পেট কেটে পরিষ্কার করা ও তারপর ছোট ছোট টুকরো করে রান্না করা কৌটায় ভর্তি করা হচ্ছে। সবই হচ্ছে মেশিনে। সালমন মাছ ছাড়াও অন্যান্য মাছও রয়েছে। ট্যুরিস্টদের জন্য ছোট ছোট সাজানো রেস্টুরেন্টও রয়েছে। এখানকার টটেম পার্ক হিস্টরিক্যাল মিউজিয়াম বিকেলবেলা ঘুরলাম। শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ। রাতে আমাদের কেচিকান সী কোস্ট রেস্টরেন্টে কারবন-রোস্টেড সালমন খেলাম। এমন সুস্বাদু টাটকা মাছ এর আগে আর খাইনি। ইলিশ মাছের পরেই এর স্থান। আমরা ডিয়ার মাউন্টেনে ভোরবেলা উঠে একটু ঘুরলাম। দশটা নাগাদ আমাদের জাহাজ ছাড়ল। শহর হিসেবে ছোট হলেও এর বৈশিষ্ট্য কম নয়।

কেচিকান আলাস্কার পাঁচ নম্বর বন্দর শহর, আর দক্ষিণ আলাস্কার সবচেয়ে বড়। আলাস্কার সবচেয়ে নামকরা জিনিস হচ্ছে এখানকার পিংক সালমন আর কিং সালমন। কেচিকান আলাস্কার দক্ষিণে একটা বড় সরু লেনের মতো কানাডার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখানকার অক্ষাংশ ডাবলিন, ম্যানচেস্টারের মতোই। কাজেই আমরা আর্কটিক সার্কেলের অনেক দূরে। নরওয়ে বা গ্রীনল্যান্ডে এর থেকে অনেক বেশি শীত পেয়েছি। কেচিকানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার পাহাড়ি সৌন্দর্য। এখানকার বন সম্পদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য সম্পদ। কেচিকান শহরের একটু বাইরেই চোখে পড়ে বিরাট বিরাট টিম্বার ফ্যাক্টরি। এরা ফার্নিচার তৈরি করে না। শুধু গাছ কেটে গাছের গুড়িগুলো বহন উপযোগী করে কেটে তৈরি করে রাখে। তারপর অধিকাংশই জলপথে অথবা স্থলপথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চালান দেওয়া হয়। ট্যুরিস্টদের জন্য সব উন্মুক্ত দ্বার, কেচিকানে কোথাও Prohibited শব্দটা চোখে পড়ল না। হোটেলে ও চলার পথে যাদের দেখলাম তারা সব মিক্সড অর্থাৎ স্থানীয় ইন্ডিয়ান এস্কিমো ও আমেরিকান। কেচিকানে আমরা জাহাজের কেবিনেই থাকলাম। এখানকার হোটেলগুলো বেশ ভালোই। ১৬ মে থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর খোলা থাকে।

জুনো

৪ জুলাই, মঙ্গলবার

বিকেল ও রাত ধরে আমাদের জাহাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। গাইড বলল যে আমরা যদি এখানকার ছোট-বড় সব দ্বীপগুলো পরিক্রমা করি তাহলে আমাদের প্রায় ১৫০০ মাইল ঘুরতে হবে। দ্বীপের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। অবশ্য যেসব দ্বীপের কাছাকাছি জাহাজ যেতে পারবে না, তার কথা ছেড়েই দিলাম। আমরা যে মেরিন লাইন ধরে চলেছি তার দূরত্ব মাত্র ৪৪ মাইল। আমরা সকাল ৮টা নাগাদ জুনো পৌঁছলাম।

আলাস্কার রাজধানীর লোকসংখ্যা বারো থেকে তেরো হাজার। সমুদ্র যেখানে বহু দ্বীপের মধ্য দিয়ে ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে তাকে বলে ফিওর্ড বা খাঁড়ি। আরেকটা বিশাল ব-দ্বীপের মতো। জাহাজ থেকে জুনোকে দেখলাম। দূরে পাহাড়, তারই নিচে ফিওর্ডের তীরে একটি শহর। পাহাড়টির নাম জুনো, জাহাজ থেকেই দেখা যায়। বিরাট বক্স টাইপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং। পাহাড়ের কোলে জমে আছে মেঘ। কেচিকানের থেকে আরও সুন্দর।

জুনোতে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে ওয়েস্ট মার্ক বারানফ হোটেলে। মাঝারি ধরনের হোটেল। আমরা হোটেলের টেরাসে বসে কফি খেতে খেতে এখানকার একজন ইন্ডিয়ান (আমেরিকান) ট্যুরিস্টের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। ভদ্রলোক এখানে গরমের সময় আসেন। কাঠের ব্যবসাদার। কথায় কথায় তিনি বললেন যে আলাস্কার রাজধানী হওয়া উচিত ছিল অ্যাংকরেজ কিন্তু আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেটা অনেকট দূর তাই জুনোতেই রাজধানী করা হয়েছে। রাজধানীতে দেখার অনেক কিছু আছে। যেমন স্টেট ক্যাপিটাল, স্টেট মিউজিয়াম, আলাস্কা হিস্টরিক্যাল লাইব্রেরি, গভর্নর্স ম্যানসন, হাইস অব উইকার্সহাম, আইসফিল্ড ইত্যাদি। কফি খেয়ে আমরা একটি স্পিড বোট ভাড়া করে ৭ জনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম লিন ক্যানেলের দিকে। জুনোতে সাইট সিয়িংয়ের জন্য প্রচুর ভালো বন্দোবস্ত আছে।

মেনডেনহল গ্লেসিয়ার

বরফের বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছে জঁ পিয়ার। ২৭ বছরের ফরাসি যুবক। ফরাসির গ্রনোবল ইউনিভার্সিটির গ্লেসিওলগ। আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সেখানে পৌঁছলাম। হঠাৎ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনের ভাব যেন কিছুতেই প্রকাশ করতে পারলাম না। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে বিরাট একটা নদী হঠাৎ কোনও মন্ত্রবলে বরফ হয়ে গিয়েছে। আর সেই বরফে ফাটল ধরে অদ্ভুত সুন্দর ঘন নীল রঙের বাহার সৃষ্টি করেছে। আমরা আমাদের রাবারের স্পিড বোটটাকে গ্লেসিয়ারে গায়ে এনে থামালাম। জঁপিয়ার আমাদের প্রথম ব্রিফিং দিল, আপার জুনোর বিরাট আইসফিল্ডের নতুন তুষারপাত যখন গরমের বরফ গলার মাত্রা পেরিয়ে যায় তখন নতুন বরফের চাপে সৃষ্টি হয় গ্লেসিয়ার। বছরে প্রায় একশো ফুট বা তারও বেশি তুষারপাত হয় এই গ্রেট জুনো আইসফিল্ডে। এই আইসফিল্ডের আয়তন বিরাট। প্রায় এক হাজর পাঁচশো স্কোয়্যার মাইল। কোনও কোনও জায়গায় এর গভীরতা কয়েকশো ফুট। এই বিরাট আইসফিল্ডের চাপে ষোলটা বিরাট গ্লেসিয়ার আর বহু ছোট ছোট গ্লেসিয়ারের সৃষ্টি করেছে। সাধারণ ভাষায় বলা যায় শক্ত বরফের নদী। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই আইসফিল্ড আরও প্রসারিত হচ্ছে। এই গ্লেসিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ২০০ বছর আগে। এখানকার আইসফিল্ডের উচ্চতা তিন হাজার আটশো ফুট। আমরা দেখেছি নিচের থেকে। গ্লেসিয়ারের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। আমরা তার কাছে গেলেও গ্লেসিয়ারের ওপর চলাফেরা করার ঝুঁকি আজ নিলাম না, কারণ গ্লেসিয়ার বে-তে আমাদের অভিযান করার পরিকল্পনা রয়েছে। জঁপিয়ারের সঙ্গে আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। এখানকার উল্লেখযোগ্য তাকু গ্লেসিয়ারের দিকে। তাকু হিমবাহ এখানকার তাকু ইনলেট-এ এসে পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিরাট তাকু হিমবাহ তার ওজন ওপরে ধরে রাখতে পারছে না, তাই ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে। এটাকে বলে মুভিং গ্লেসিয়ার। গবেষণার পক্ষে খুবই প্রেরণার বস্তু। আমরা খাবার সঙ্গেই এনেছিলাম, কাজেই অনেকক্ষণ ধরে সেই অভাবনীয় সুন্দরের রাজত্বে ঘুরে বেড়ালাম। কখনও গ্লেসিয়ার ধরে কখনও পাশে হেঁটে আমরা আলাস্কার প্রথম গ্লেসিয়ার ফিল্ড ঘুরে হোটেলে ফিরলাম রাত এগারোটায়। এই যাত্রায় এই প্রথম গ্লেসিয়ার দেখলাম। জুনোর আর কোথাও ঘোরা সম্ভব হল না।

সিটকা

৫ জুলাই, বুধবার

আমাদের জাহাজ ছেড়েছে সকাল ৮টায়। হোটেল থেকে আমরা ভোরে উঠতে বাধ্য হয়েছি। তবে তার জন্য আপশোস নেই, কার চারদিকের আকর্ষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরিষ্কার নীল জলে আজ প্রচুর মাছ চোখে পড়ছে। জুনো থেকে সিটকা যেতে হলে অ্যাডমিরালটি আইল্যান্ড ঘুরে যেতে হয়। আমাদের জাহাজ আরও উত্তরে উঠে ব-দ্বীপের মতো অ্যাডমিরালটি আইল্যান্ড ঘুরে আবার নিচে অর্থাৎ দক্ষিণে নেমে চলেছে। আমরা এলাম প্রশান্ত মহাসাগরীয় তীরে অর্থাৎ আলাস্কা গালফে। জুনো পর্যন্ত আমরা ফিওর্ডের মধ্য দিয়েই চলছিলাম। এখন এসে পড়লাম উন্মুক্ত পথে।

সিটকায় এসে পৌঁছলাম বিকেল তিনটেয়। এখানকার প্রথম আকর্ষণ হচ্ছে রাশিয়ান চার্চ সেন্ট মিখায়েল ক্যাথিড্রাল। সিটকা ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ান আমেরিকার রাজধানী ছিল। এখানকার অনেক পরিবার রাশিয়ান বংশোদ্ভুত। সিটকা শহরে তাই বিভিন্ন বাড়িঘরের গঠন রাশিয়ান গোল গম্বুজ ধরনের। আর কয়েকটি রেস্টুরেন্টে আজও রাশিয়ান খাবার পরিবেশন করা হয়। সিটকায় সামার মিউজিক ফেস্টিভ্যাল খুব নামকরা। সিটকাতে আগে ফার কোটের ব্যবসায়ীরাই বাসা বেঁধেছিল। তারপর গোল্ড রাশের ফলে ও পেট্রোল পাইপ লাইন ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ঘাঁটি হিসাবে পরিণত হয়েছে। আজকাল ট্যুরিস্টদের জন্য সিটকার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। একনজরে দেখে মনে হচ্ছে রাশিয়ার কোন ট্যুরিস্ট গ্রামে এসে পড়েছি। আমরা রাতে শহরের একটা রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে শুনলাম যে এখানকার চার্চটা নতুন, আসল চার্চ ১৯৬৬ সালে আগুন লেগে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে নতুন চার্চে আগের আসবাবপত্র যা বাঁচানো গিয়েছে তা সবই রক্ষিত হয়েছে। নতুন চার্চের নাম বদলে রাখা হয়েছে St. Michael। আমরা রাতে জাহাজের কেবিনেই ফিরে এলাম। রাতেই জাহাজ ছাড়ল।

হাবার্ড গ্লেসিয়ার

৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার

সকালবেলা হল্যান্ড-আমেরিকা লাইনের (জাহাজের নাম) ক্যাপ্টেনের গলার আওয়াজে আমাদের ঘুম ভাঙল। আমেরিকান কায়দায় ঘুম ভাঙানো হল। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আনোরাক গায়ে দিয়ে দৌড়ে এলাম ডেকে। কি সুন্দর! প্রকৃতি দেবীর আরেক খেলা, সৃষ্টিকর্তার আরেক বিচিত্র লীলা। আমাদের জাহাজটা গ্লেসিয়ার বে-র হাবার্ড গ্লেসিয়ারের ঠিক মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের ওপর বহুবার বহু রূপে গ্লেসিয়ার দেখেছি। আল্পস হিমালয় গ্রীনল্যান্ড সেসব জায়গার স্থির উপত্যকায় গ্লেসিয়ারের রূপ দেখে বার বার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এই আলাস্কার গ্লেসিয়ারের দেখেছি আরেক রূপ। তরল রূপহীন জলের কঠিন রূপ অবিশ্বাস্য ঘটনা। একটা

বিরাট নদী তীব্র গতিতে সমুদ্রে এসে পড়েছে আর সেই সময় কোনও এক অদৃশ্য যাদুকরের কাঠির ছোঁয়ায় সেই তরল জল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের ক্রুইজশিপ ইঞ্জিন থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডেকের সব যাত্রীরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই শুধু নয়নভরে দেখার পালা। প্রায় আধঘন্টা লাগল আমাদের সেই অভাবনীয় দৃশ্য সহ্য করতে, তারপর যখন সেই সৌন্দর্যের ধাক্কাটা কাটল তখন শুরু হল ক্যামেরার ক্লিক আর বাজিং শব্দ। দৃশ্যটা বড় চমৎকার একদিকে কঠিন পাথরে পাহাড় আর তার ওপর বরফের সাদা কঠিন চাদর আর তারই বাড়তি অংশ গলে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। জল থেকে ওপরকার দৃশ্য আমরা দেখছি। ওপরের বরফের নদী যদি হঠাৎ সূর্যের তাপে গলতে শুরু করে তাহলে আমাদের এই ক্রুইজশিপ একটা কাগজের নৌকোর মতো নিমেষে তার তলায় চাপা পড়ে মরবে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির লীলাও বাড়তে লাগল। আমাদের চারদিকের ঘন নীল জলের ওপর দেখা দিল এক ঝাঁক সীল। আমাদের দেখা দেবার জন্য জাহাজের চারদিকে ঘুরতে লাগল। পরে জানলাম যে ওরা সালমন মাছ খেতে ভালোবাসে তাই মাছের ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও এসেছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমাদের ডেকের ওপর হঠাৎ দেখা দিল সাদা সী-গাল আর কারমরান্ট। জাহাজের লোকেরা বলল যে খাবার শেষে জাহাজের রান্নাঘর পরিষ্কার করা হয় আর যাত্রীদের বাড়তি খাবারও জলে ফেলে দেওয়া হয় কাজেই এই সামুদ্রিক পাখিদের ভিড়।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা জাহাজ থেকে একটা ক্যানো নিয়ে এগিয়ে গেলাম গ্লেসিয়ার ঘুরতে। আমাদের Explorer card ছিল কাজেই জাহাজের Life-boat cum canoe পেতে অসুবিধা হল না।

গ্লেসিয়ার জলে এসে পড়েছে আর তারই এক অংশ ওপরে ভাসমান। আমাদের নৌকো থেকে ওর উচ্চতা আরও ৯-১০ মিটার উঁচু। কাছ থেকে মনে হয় একটার পর একটা পাঁচিল দাঁড় করানো হয়েছে। প্রথমেই ওখানকার ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের হুঁশিয়ার করিয়ে দিল। থার্মোমিটারে দেখলাম মাইনাস দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে জলে মনে হয় তাপমাত্রা আরও কম। গ্লেসিয়ারের ভেতরে একটু ক্লাইম্বিং করলাম। সবচেয়ে ভালো লাগল এখানকার সুন্দর সবুজ রং আর নিস্তব্ধতা। ওপরে নীল আকাশ। সেইজন্যই ফিওর্ডের জল ঘন নীল। আমাদের সামনে এই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যের তুলনা নেই। এই গ্লেসিয়ারে হাঁটা সম্ভব নয়। অসংখ্য খুদে ক্যানিয়নের সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের চলা অসম্ভব। তাই বাধ্য হলাম আবার জাহাজে ফিরে আসতে। আমাদের পরবর্তী ও আসল প্রোগ্রাম শুরু হবে কলম্বিয়া গ্লেসিয়ারে।

ভালডেজ

৭ জুলাই, শুক্রবার

ভালডেজ ছোট্ট একটি বন্দর শহর। আমাদের আমেরিকা-হল্যান্ড লাইন জাহাজটি

এখানেই সন্ধ্যের দিকে এসে নোঙর ফেলল। জাহাজেই খাবার ও থাকার ব্যবস্থা। শুধু দেখবার জন্য নির্দেশ পেলাম। একনজর দেখলেই বোঝা যায় যে এটা ছোট্ট একটা শহর যার কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। অধিকাংশ বাড়িঘর সব কাঠের। মনে হল নতুন তৈরি। শহরের শেষের দিকে সারি সারি ঘরবাড়ি দেখে মনে হল এরা সবাই আসে গরমের সময় সামার জব-এর জন্য। আমি ও জঁ পিয়ার একটা ছোট কফির দোকান দেখে তাতে ঢুকে পড়লাম। দোকানের মালিক আলাস্কান। ইন্ডিয়ান কফি খেতে খেতে যতটুকু জানলাম তা হচ্ছে : এই শহরটি ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ প্লাবনে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শহরের সব বাড়িঘরগুলো ফিওর্ডের উপচে আসা জলে ভেঙে গেছে অথবা ভেসে গেছে। শহরের অধিকাংশ লোকই মারা গেছে। সেই বন্যার পর কেউ আর পাকা বাড়ি করে না। এখনকার এই শহর পুরনো শহর থেকে চার মাইল ভেতরে। অধিকাংশ লোকই এখানকার পাইপ লাইনে কাজ করে। আলাস্কার পাইপ লাইন এই শহরের মাটির তলা দিয়ে গিয়েছে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অনেক এস্কিমো যাযাবর এই অঞ্চলে শীতের সময় চলে আসে। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেও খুব ভাল কাজ পাওয়া যায়। এখানকার ব্যারাকগুলো সবই সামার শেল্টার। একমাস আগেও এখানে সব বরফে ঢাকা ছিল। এখন চারদিকের গ্লেসিয়ারের জন্য প্রচুর ট্যুরিস্ট আসবে। বছরে মাত্র তিন মাস হোটেল ও রেস্তোরাঁ খোলা থাকে। বাকি সময়ে সকলে নেমে যায় জুনোতে।

আমরা সবাই ফিরে এলাম জাহাজে। সেদিন রাতেই আমেরিকা-হল্যান্ড লাইন আমাদের ফেয়ারওয়েল জানাল।

কলম্বিয়া গ্লেসিয়ার

৮ জুলাই, শনিবার

আজ থেকেই শুরু হবে আমাদের মূল অভিযান। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা প্যাকিং শুরু করলাম। জাহাজ ছেড়েছে ভোর ৭টায়। জাহাজের ওপরই আমাদের ক্যানো অর্থাৎ হেভি প্লাস্টিকের নৌকোটাকে হাওয়া ভর্তি করে পিছনে মোটর লাগিয়ে দিলাম। আমাদের দলের মালপত্র ও এক্সপেডিশন মেটেরিয়ালের দায়িত্বভার পড়েছে বেয়াত মুলারের ওপর। ওর বয়স ছাব্বিশ বছর। সুইজারল্যান্ডের বহু এক্সপেডিশনে ও অংশগ্রহণ করেছে। জুরিখের ছেলে। আমাদের মধ্যে সকলের পিঠে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাগ ছাড়াও রয়েছে প্রচুর মালপত্র। সবচেয়ে ভারি হচ্ছে ক্যানো টেন্ট, খাবার সরঞ্জাম ও ক্যামেরা। ফটোগ্রাফের দায়িত্ব আমেরিকান ফ্রেড হাচিংসন-এর ওপর। বয়স আঠাশ। আমেরিকার ছেলে লেনেক্স সাকারফ কমিউনিকেশনের দায়িত্ব নিয়েছে। ওর বয়স পঁচিশ বছর। চার্লস মুরদক আমেরিকান, বয়স ছাব্বিশ ও দায়িত্ব নিয়েছে খাওয়াদাওয়ার। আমাদের দলে ডাক্তার হিসেবে আছে সের্জ বোঁসাতোঁ। ফ্লান্সের নবীন ডাক্তার। বয়স ছাব্বিশ, ও স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আর আমি এদের টিম কো-অর্ডিনেটর। ফরাসি জঁ পিয়ার

আমাদের সঙ্গে এসেছে বিজ্ঞানী হিসেবে। ওর বয়স ২৭ বছর। আমরা সবাই নিজেদের মালপত্র সাজিয়ে তুললাম ক্যানোতে। সঙ্গে রাখলাম একান্তই দরকারি জিনিসপত্র। যেমন কম্পাস, দড়ি, বরফ কাটার কুড়ুল, ম্যাপ। আমাদের পরনে ইমপেরমেয়াবল প্যান্ট, আনোরাক জ্যাকেট, হাইটেক ক্লাস ফাইভ বুট, শীল্ড কমোশন চশমা, শু-হুক, টুপি, গ্লাভস, গরম জলের ফ্লাস্ক, ফ্রস্ট বাইট ক্রিম ইত্যাদি। প্রত্যেকের পিঠে চাপানো হল ১৫ থেকে ১৮ কেজি মালপত্র। নিজেদের মধ্যে যাতে কো-অর্ডিনেশন বজায় থাকে এবং আরও দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে তার জন্য দশ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য বুঝিয়ে দিলাম। মে মাসে মঁ ব্লাঁ পাহাড়ে ৫ দিনের একটা গ্লেসিয়ার ট্যুর দিয়েছিলাম আমরা, মানে জঁ পিয়ার, সের্জ, বেয়াট ও আমি। কাজেই আমাদের মধ্যে ভালো বোঝাবুঝি আছে। এখন আমাদের দলে রয়েছে আরও তিনজন আমেরিকান। ভ্যাংকুভার থেকে এই পর্যন্ত আমরা একই সঙ্গে প্রায় দশ দিন ধরে চলেছি। আমাদের মধ্যে তাই খুব ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আমরা সকাল ১০টার সময় কলম্বিয়া গ্লেসিয়ারের কাছে এসে জাহাজ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের ক্যানোতে চেপে বসলাম। জাহাজের সবাই ডেক থেকে আমাদের হাত নেড়ে সাফল্য কামনা করল।

জাহাজের ওপর থেকে আমরা সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম, দূরের সেই সুন্দর পাহাড়ি দৃশ্য আর গ্লেসিয়ারের ক্লিয়ার ভিউ ক্যানোতে বসা মাত্রই যেন অদৃশ্য হল। কারণ, উচ্চতার তফাৎ। যাইহোক, আমরা এবার গ্লেসিয়ারের উদ্দেশে আমাদের মোটর চালালাম। এখন থেকে তিনদিন আমরা গ্লেসিয়ারে ঘুরব।

কলম্বিয়া গ্লেসিয়ার আড়াই মাইল চওড়া এবং জীবন্ত গ্লেসিয়ার নদী, প্রতিদিন হাজার হাজার টন বরফের পাথর প্রিন্স উইলিয়াম সাইন্ড ফিওর্ডে এনে ঢালছে। চোখের সামনে দেখছি একটা ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। যত কাছে এগোচ্ছি ততই মনে হচ্ছে আমাদের বিরাটত্ব একফোঁটা জলের মতো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। আকর্ষণীয় এই ভয়ঙ্কর জীবন্ত গ্লেসিয়ারের যে কোনও সামান্য অংশ আমাদের ওপর পড়লে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সাধ্য নেই আমাদের জীবন রক্ষা করে। বরফ ফাটার শব্দ আর তার পতনের শব্দে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে উঠল। এক নতুন ভয়াবহ জগতে প্রবেশ করলাম। আমরা বোটের মোটর থামিয়ে আস্তে বৈঠা মেরে এগোতে লাগলাম। যত কাছে আসছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমরা পাহাড়ের গ্লেসিয়ার দেখে অভ্যস্ত। পাহাড়ের গ্লেসিয়ার স্থির আর তাতে ফাটলের সংখ্যা খুবই সীমিত। নদী ও সাগরের গ্লেসিয়ার অস্থির আর তাতে ফাটলের সংখ্যা অজস্র। আমাদের সামনে ভাসমান গ্লেসিয়ার। এর উচ্চতা প্রায় ২০০ ফুট। আর জলের তলায় ডুবন্ত অংশের পরিমাণ হবে প্রায় ৭৫ ফাদম। তার মানে আমাদের সামনে ভাসমান বরফের চাঁইটির উচ্চতা ও গভীরতা মোট প্রায় ৬৫০ ফুট।

এখানে আরেক অসুবিধা রয়েছে আওয়াজের। আমাদের নৌকোয় মেশিন চালানো যাবে না। কারণ, যে কোনও শব্দের কম্পনের ফলে সামনের বরফে ফাটল ধরার সম্ভাবনা আছে। এমনকী এখানে জোর চেঁচালেও অনেক সময় গ্লেসিয়ার ফেটে

যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে একটা গ্লেসিয়ার ফাটলে তার আওয়াজে আশপাশে অন্যান্য গ্লেসিয়ারও ফাটতে শুরু করে এবং এইভাবে শুরু হয় বিরাট শব্দতরঙ্গ। ঠিক যেমন ঘন ঘন বজ্রপাত।

পাহাড়ের গ্লেসিয়ারের সঙ্গে সাগরের গ্লেসিয়ারের অনেক তফাৎ। পাহাড়ের গ্লেসিয়ার পুরনো গ্লেসিয়ার, আর সাগরের গ্লেসিয়ার তারই শেষের অবস্থা। গ্লেসিয়ারে ফাটল ধরলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে সে আবার জলে পরিণত হবে। আমাদের বোট ছোট্ট বরফের ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমাদের মধ্যে কোনও কথাবার্তা নেই। শুধু আশ্চর্য হয়ে পৃথিবীর এই অদ্ভুত রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম। নিঃশব্দে দেখা মানে তার এই রূপকে আরও গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা। আনন্দে ও বিস্ময়ে সময় তাড়াতাড়ি কেটে যায়। চারঘন্টা কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। চার্লস ঘড়ি দেখিয়ে ইশারায় দূরের জাহাজ দেখাল। তার মানে এখন আড়াইটা, জাহাজ চলে যাবে তার যাত্রীদের নিয়ে আমরা থেকে যাব এখানে। বাইনোকুলার নিয়ে হাত নাড়িয়ে দূরের জাহাজকে বিদায় জানালাম। জাহাজের ওপর যাত্রী বন্ধুদের কাছ থেকেও সাড়া পেলাম তারাও হাত নাড়ছে। জাহাজ নিঃশব্দে তার ফেরার পথ ধরল, কিছুক্ষণের মধ্যেই উধাও হয়ে গেল। আমরা এখন এই গ্লেসিয়ার সাগরে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি।

চার্লস আমাদের জন্য চা-কফি-কোকাকোলা ও স্যান্ডউইচ তৈরি করল। খাওয়াদাওয়ার শেষে দুদলে ভাগ হয়ে আমরা নেমে পড়লাম গ্লেসিয়ারে। বোটে রইল লেনক্স। আমাদের সঙ্গে ওয়াকি-টকি রইল প্রয়োজনে লেনক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। আমাদের বুটে স্পাইক্স পরিয়ে নিলাম। দড়ির মাধ্যমে নিজেদের নিরাপত্তা আরও দৃঢ় করে নিলাম। গ্লেসিয়ার যেখানে নিচের জলে মিশেছে সেখানে পা ফেলতেই দেখি আরেক বিপদ। ছোট ছোট বরফের চাঁই এখানে হাজার হাজার খুদে দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। একটার থেকে আরেকটায় এগোতে গেলে আগে থেকে ভাবতে হবে যে আরও দূরে যাওয়া যাবে না আবার ফিরে আসতে হবে। এ জায়গাটা সত্যিই গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে। আমাদের সামনে, পিছনে আর চারধারে দৈত্যাকৃতি দাঁতের মতো ঘিরে রয়েছে গ্লেসিয়ারের ভগ্নাংশ। আমাদের সামনে লং ভিউ বলতে কিছু নেই। অতি সাবধানে আমরা এগোতে লাগলাম। এক বরফ থেকে আরেক বরফে যাওয়ার সময় যদি জলে পড়ে যাই তাহলে ঠাণ্ডায় আমাদের অবস্থার কথা চিন্তা করতেও গা শিরশির করে ওঠে। ভাগ্য ভালো যে এই দ্বীপের মতো ভাসমান বরফের চাঁইগুলো জলের স্রোতে বেশি দূরে সরে যায় না। সরে গেলেও তার গতি অত্যন্ত ধীর। সারা দিনে তারা চার থেকে পাঁচ ফুট মাত্র এগোয়। আমাদের চলার পথে সেটাও মনে রাখতে হবে। খুব গরমের সময় জলে বরফের মাত্রা যখন কমে যায় অর্থাৎ জুলাই ও আগস্ট মাসে, তখন তাদের গতি হয় দিনে সাত থেকে দশ ফুট। আমরা এখন বরফের মায়াপুরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিকেল পাঁচটার সময় আমরা আবার ফিরে এলাম আমাদের বোটে। কলম্বিয়া গ্লেসিয়ারের মুখটা প্রায় আড়াই মাইল চওড়া।

ভেবেছিলাম আমাদের প্রথমদিনের উৎসাহ উদ্দীপনায় অন্তত আধ মাইল ঘুরব। কিন্তু ফিরে এসে হিসেব করে দেখলাম খুব বেশি হলেও আমরা দুশো ফুটের বেশি এগোতে পারিনি। আমরা এবার বোট নিয়ে এগিয়ে চললাম শুকনো মাটির দিকে। সবাই একসঙ্গে বৈঠা মারাতে সন্ধ্যে ৭টার সময় ডাঙায় নৌকো তুললাম। এখন আমাদের আলাপ-আলোচনা শুরু হবে, অর্থাৎ আমাদের দুই দলের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পালা। তারপর গ্লেসিয়ারের কাছেই আমরা তাঁবু খাটিয়ে রাতের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করলাম। রাতে শীত বেশি ছিল না। আজকের মূল শিক্ষা হল, ফাটা গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে চলা বিপজ্জনক তো বটেই, অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব।

৯ জুলাই, রবিবার

আজ কলম্বিয়া গ্লেসিয়ারের দ্বিতীয় দিন। আজকে ঠিক হল আমি থাকব কমিউনিকেশনের জন্য। তাঁবুর আশপাশেই। আর ওরা সবাই একসঙ্গেই বেরোল। আজকের গ্লেসিয়ারের আরও ওপরে উঠে ওরা সবাই মিলে গ্লেসিয়ার পার হবে। ওপরের দিকে ফাটল নেই শুধু কঠিন বরফে পিছলে যাবার সম্ভাবনা। প্রতি পদক্ষেপে স্পাইক্স-কুড়ুল আর সিকিউরিটির জন্য দড়ি ব্যবহার করতে হবে। আজকে আমার করার কিছু নেই। আমি ওয়াকি-টকি নিয়ে বসে রইলাম ওদের গাইড করার জন্য। ওদের সাবধানে চলার জন্য হুঁশিয়ার করে দিলাম। সকাল ৮টায় ওরা চলে গেল।

বেলা ১০টা নাগাদ ঘোৎ ঘোৎ শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। একটু এগিয়ে যেতেই দূরে চোখে পড়ল পাথরের ওপর অসংখ্য সীল। ভোঁদরের মতো, কিন্তু বিরাট দেহ। ডানা দিয়ে ওরা হাতের কাজ করে আর মাছের লেজের মতো বিরাট লেজ দেখতে অতি সুন্দর। মনে হয় এক ঝাঁক সালমন মাছের পিছন পিছন ওরা এখানে এসে পড়েছে। আমার সময় কাটানোর একটা সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল। অভিজ্ঞতা তো বটেই। সারাদিন ওদের খেলা দেখেই কেটে গেল। আমাদের দল ফিরে এল বেলা তিনটের সময়। যথারীতি শুরু হল অভিজ্ঞতা বিনিময়। ওরা বলতে লাগল মসৃণ বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার গল্প আর আমি বললাম, সীল মাছের গল্প।

আমরা জায়গা পাল্টালাম আগের পরিকল্পনানুযায়ী। সেদিন রাতে আমরা তাঁবু খাটালাম ঠিক গ্লেসিয়ারের ওপরে। আমাদের ক্যানো মোটরসমতে নিচেই রেখে এসেছি। গ্লেসিয়ারে বহুবার হেঁটেছি, কিন্তু এই প্রথম সরাসরি রাত কাটাব। আরেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে। দিনেরবেলা গ্লেসিয়ারের ওপর তাঁবু খাটানোর বিপদ অনেক। প্রথম বিপদ হচ্ছে তাঁবুর মেটাল-খুঁটি। সূর্যের তাপে মেটাল খুঁটির চারদিকের বরফ সহজেই গলে যায় আর তার ফলে তাঁবুকে ধরে রাখা অসম্ভব। শক্ত বরফের ওপর একবার পিছলে পড়লে কিছুতেই আর তাকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। অভিযানের তাঁবুগুলো সবই এক পিসের, অর্থাৎ জমি, দেওয়াল ও ছাদ সবই একই থলির মধ্যে, শুধু চেন খুলে ঢুকে পড়তে হয়। তুষারপাত ও ঝড়জলের পক্ষে খুবই সুবিধা কিন্তু হিমবাহের পক্ষে বিপজ্জনক। আমরা তাই দিনেরবেলা বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে

রাত্রিবেলায় তাঁবু খাটালাম। গ্লেসিয়ারে তাঁবু ফেলার সুবিধা হচ্ছে যে এখানকার ভাল্লুকেরা মসৃণ ঢালু বরফ পছন্দ করে না কারণ তাদের ভারি দেহ সহজেই পিছলে যায়। আমাদের চলাফেরার অসুবিধা নেই। আইসহুক বুটের সঙ্গেই লাগানো, আইস এক্স আমাদের কোমরে ঝোলানো। আমাদের কোমরে দড়ি পরস্পরকে বেঁধে রেখেছে। রাতে বরফ গলার কোনও সম্ভাবনাই নেই, কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁবুর মধ্যেই ঢুকলাম। আজকে আমার কোনও পরিশ্রমই হয়নি। বন্ধুদের অবস্থা ঠিক উল্টো। ওরা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই উঠতে হবে তাই আমরা তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিলাম। আমাদের এতটুকু শীত লাগছে না। রাতে আমরা গরম কিছু খেলাম না, সবই কৌটোর ঠাণ্ডা খাবার। যদিও গ্লেসিয়ারের ওপর আমাদের তাঁবু খাটিয়েছি কিন্তু তাই বলে শীতের প্রকাপ একদম নেই। আমাদের স্লিপিং ব্যাগ খুবই আরামদায়ক। তাঁবুর মধ্যে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করছি কারণ বুটের হুকগুলো খুবই সাংঘাতিক, তাঁবু ফুটো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। পরদিনের কর্মসূচি ঠিক করে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

১০ জুলাই, সোমবার

এখানকার নিস্তব্ধতার কথা আর নাই বা লিখলাম। আশপাশে জঙ্গল নেই, গাছগাছড়া নেই, নদীর ঢেউ নেই, এমনকী বাতাসও বন্ধ। শীত আছে তবে আমাদের উপযুক্ত পোশাক ও বিছানা থাকার দরুন বরফের ওপর যে শুয়ে আছি তা মনেই হল না। পরদিন ভোরবেলায় আমি উঠে পড়লাম ছটায়। আকাশে দিনের আলো সবে ফুটে উঠছে। তাঁবুর মধ্যেই খেয়ে নিলাম চা, কফি, টোস্ট আর শুকনো ফল। সের্জ আমাদের প্রেসার দেখে নিল, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, সবাই ফিট। তাঁবু তোলার দায়িত্ব আমার ও সের্জ-এর ওপর। সব গুটিয়ে আমরা রওনা দিলাম। খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে। এক পায়ের হুক বরফে না গেঁথে অন্য পা তোলা বারণ। প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের সাবধানে এগোতে হচ্ছে। এখান থেকে এই মসৃণ বরফের নদী নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। কাজেই একবার পিছলে পড়লে শরীরকে ধরে রাখা মুশকিল। অবশ্য আমরা পরস্পরকে কোমরের দড়ি দিয়ে ধরে রেখেছি, সাবধানের মার নেই।

গ্লেসিয়ার ছেড়ে আমাদের শুকনো পাথরে আসতে লাগল একঘন্টা ষোল মিনিট। অতিক্রম করেছি মাত্র ৫০০ মিটার। আমরা নিচে নেমে আবার আমাদের রাবার বোটে আশ্রয় নিলাম। রাবার বোটটা ভালোভাবে ধুতে হল, কারণ গতকাল এখানকার করমোরান্ড পাখিগুলো বোট নোংরা করে ফেলেছে। বোট জলে নামিয়ে আবার জলপথ ধরলাম। আমরা উত্তরমুখী হয়ে বৈঠা মারতে শুরু করলাম। এই অঞ্চলটা ন্যাশনাল পার্ক। এখানে মোটরের বা অন্য কোনও যন্ত্রের আওয়াজ করা নিষেধ। আওয়াজে গ্লেসিয়ারে ফাটল ধরার সম্ভাবনা আর স্থানীয় প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। আলাস্কার এই অঞ্চলের নাম কেনাই পেনিনসুলা।

আমরা ডানদিকের স্থলভাগের নিশানা করে এবং সবসময় ডানদিকে রেখে এগোতে লাগলাম। জল এখানে শান্ত ও গভীর। আমাদের দুদিকে সবুজ, সুন্দর বনভূমি। দূরে অনিন্দ্যসুন্দর বরফে ঢাকা পাহাড়। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু আমাদের বৈঠা ছপ ছপ শব্দ করে সেই অনন্ত নিস্তব্ধতাকে বিরক্ত করছে। আমাদের বোটে চারটি মাত্র বৈঠা। মোটর থাকা সত্ত্বেও চালাবার অধিকার নেই। অতি ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে শুধু মাঝি বদল হচ্ছে আর খাওয়াদাওয়া তো আছেই। একঘেয়েমি হলেও সেই শান্ত পরিবেশে চলার আনন্দ আছে। প্রকৃতি দেবী এখানে ঢেলে দিয়েছেন সৌন্দর্য, পরিশ্রম গায়েই লাগে না। আমরা একটানা প্রায় দশঘণ্টা বৈঠা মেরে ছোট্ট একটা গ্রাম পেলাম। নৌকো ভিড়িয়ে তাদের থেকে পথনির্দেশ জেনে নিলাম। তারা জানাল যে এখান থেকে আরও দুই মাইল যেতে হবে, তারপরই সাইলেন্স জোন শেষ হবে। তার মানে আমরা আবার মোটর চালাতে পারব। এই ছোট্ট গ্রামটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরই, অর্থাৎ ন্যাশনাল গার্ড সেন্টার। শেষের আড়াই মাইল আমাদের কাছে ভীষণ কষ্টকর মনে হল, আমরা সবাইই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সাইলেন্স জোন পেরোতেই আমরা আবার মোটরে স্টার্ট দিলাম। সেখানকার গাঢ় নিস্তব্ধতা নিষ্ঠুরের মতো আমরাই ভাঙলাম। ঘন্টাখানেক একঘেয়েমি গোঙানির মধ্যে কাটিয়ে তারপর ডানদিকে দেখতে পেলাম আলো। এখন রাত দশটা। দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ভেবেছিলাম অন্ধকারে বোটেই রাত কাটাতে হবে। আমরা ১১টায় এসে ভিড়লাম। ছোট্ট শহর নাম হোয়ইটিয়ার। দুপাশের জেটি দেখেই মনে হচ্ছে তেল ও কাঠের রপ্তানি বন্দর। রাত্রিবেলা আমরা কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘাটের ওপরই তাঁবু খাটালাম।

১১ জুলাই, মঙ্গলবার

হোয়াইটিয়ারকে শহর না বলে ছোট্ট একটা রেলওয়ে স্টেশনই বলব। মাত্র তিনটি চায়ের দোকান, দুটো ছোট হোটেল, কয়েকটি রেস্টুরেন্ট, খেলার ঘরের মতো কাঠের পোস্ট অফিস, স্টেশন-অফিস আর পাশেই বিরাট বিরাট কারখানার মতো শানটিং স্টেশন। স্টেশনে একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। ফ্ল্যাট ওয়াগনে দুটো করে চারটে খালি মালের বগি আরেকটি প্যাসেঞ্জার কামরা। আমরা এখানে আমাদের ক্যানোটা একটা হোটেলের মালিককে রাখতে দিলাম। তিনি বিনা পয়সায় এবং বিনা শর্তে রাখতে রাজি হলেন। তবে আমাদের কথা দিলেন যে তিনি সাবধানেই রাখবেন এবং সপরিবারে তিনি ব্যবহার করবেন, তাতে ইঞ্জিনটা মেন্টেইন্ড হবে। আমাদের অন্য কোনও উপায় ছিল না। সকাল আটটায় আমাদের ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনটা কিছুদূর এসে শহরে ঢুকল। এখানেই আমরা মেন লাইন পেলাম। এতক্ষণে ভুল ভাঙল। আসলে আমরা বন্দরের কাছাকাছি শান্টিং স্টেশন থেকে উঠেছি। মূল শহরে আমরা আর নামলাম না।

এখন থেকে আমাদের শুরু হল আলাস্কার স্থলাভিযান। ভ্যাংকুভার থেকে এই

পর্যন্ত আমরা সমুদ্র উপকূল ও ইনল্যান্ড সী ধরে এগিয়ে এসেছি। এখন থেকে আমরা স্থলভাগ পেলাম। ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে উঠল। আমাদের ওপেন টিকিট ছিল কাজেই নতুন করে আর টিকিট কাটতে হল না। ট্রেনেই চেকার স্ট্যাম্প মেরে দিল। এখান থেকে অ্যাংকরেজ মাত্র একশো পনের কি.মি.। ইউনাইটেড স্টেটস-এর অসুবিধা, কিলোমিটার লেখা থাকলেও অধিকাংশ সময়েই মাইল ও ফুটই ব্যবহৃত হয়।

আলাস্কার প্যাসিফিক কোস্টকে বিদায় জানালাম। আলাস্কার এই অঞ্চলটাই সবচেয়ে সুন্দর। ট্যুরিস্টদের স্বর্গভূমি। দুটো লম্বা টানেল পার হয়ে ট্রেন এসে থামল পোরতেজ নামক ছোট্ট একটি স্টেশনে। তারপর মেন লাইন ধরল। আলাস্কান হাইওয়ে এখন আমাদের সমান্তরালে চলছে। দূরে দেখতে পাচ্ছি অতি সুন্দর বরফে ঢাকা আলিয়েস্কা পাহাড়। উচ্চতা মনে হয় ছ হাজার ফুট ছাড়িয়ে। আলিয়েস্কা গ্লেসিয়ার ও আইসফিল্ড নামকরা। এখানেই আমেরিকানরা আসে উইন্টার অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য। আলিয়েস্কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানকার পেট্রোল। আলিয়েস্কা পাইপলাইন সার্ভিস কোম্পানিতে আলাস্কার প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ লোক এই কাজ করে। সামনে সুন্দর বনভূমি আর দূরের পাহাড়ি সৌন্দর্য আমাদের দৈহিক ক্লান্তি দূর করে দিল।

অ্যাংকরেজ

পাঁচঘন্টা ট্রেনযাত্রার পর আমরা অ্যাংকরেজের হোটেলে এসে পৌঁছলাম। (হোটেল চেইন WESTMARK ANCHORAGE, 720 WEST 5TH AVENUE, 99501, ALASKA কেচিকান ও জুনোতেও এই হোটেল চেইন ওয়েস্টমারকে উঠেছিলাম, ফেয়ারব্যাংকেও আমরা থাকব এদেরই অর্থাৎ WESTMARK GROUP হোটেলে)। অ্যাংকরেজ আলাস্কার সবচেয়ে বড় শহর কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার। শহরটা বর্ধিষ্ণুই বলতে হবে। ট্যাক্সিতে হোটেলে যাবার পথে ফোর্থ অ্যাভেন্যু দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পাশাপাশি আটটা গাড়ি যাতায়াত করছে। আগে অ্যাংকরেজ ছিল আলাস্কার রাজধানী। বর্তমানে রাজধানী জুনো এর তুলনায় ছোটই বলতে হবে। অ্যাংকরেজকে দেখেই মন হয় এখানে ডলারের অভাব নেই। ফোর্থ অ্যাভেন্যুর শেষের দিকে স্কাইলাইনের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে চুগাচ পাহাড়। চুগাচ পাহাড়ের নিচেই এই বর্ধিষ্ণু শহরটা আলাস্কার প্রাণকেন্দ্র। ফিফথ অ্যাভেন্যুতে হোটেল ওয়েস্টমার্ক-এ আমাদের ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখেই বুঝলাম যে ভদ্রলোক এস্কিমো। সাজানো গোছানো অতি সুন্দর হোটেল। হোটেলের ফরমালিটি সেরে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম শহরে। আজব শহর এই অ্যাংকরেজ। বাতাসে আছে বরফের ছোঁয়া। তারই সঙ্গে ভেসে আসছে পেট্রোলের গন্ধ। দোকান, রেস্তোরাঁ পাব, আলো, বার আর গাড়ির শব্দে শহরের চাঞ্চল্য বজায় থাকছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ১৯১৫ সালে এই শহরের

কোনও অস্তিত্ব ছিল না। মাত্র কয়েকটি তাঁবু খাটিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রথম গ্রাম। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এখানকার সোনা খোঁজা আর তারও পরে সোনা খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পেল পেট্রোল। পেট্রোল আলাস্কার প্রধান ধনভাণ্ডার। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অ্যাংকরেজে আসে জনজোয়ার। আলাস্কার তিনভাগের দুভাগ লোকই আজকাল বেছে নিয়েছে অ্যাংকরেজ। শিক্ষা, চাকরি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো। অ্যাংকরেজ একটি আধুনিক বন্দর ও শহর। কর্মখালির অভাব নেই।

১২ জুলাই, বুধবার

আমরা স্থলভাগ দিয়ে এলেও জলপথে সহজেই অ্যাংকরেজে আসা যায়। অ্যাংকরেজে আমাদের অনেক কাজ। ফেয়ারব্যাংকস ব্যারো এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ টেলিফোনের মাধ্যমেই হল। সবাইকে জানানো হল যে আমাদের অগ্রসর অব্যাহত আছে, আমাদের শরীরও ভালো। অ্যাংকরেজে বিভিন্ন অ্যাভেন্যু ঘোরার সময় হঠাৎ নজরে পড়ল নির্দেশ—যেখানেই যাই না কেন ভারত থেকে সেখানে যাওয়ার পথনির্দেশ ও থাকার ব্যবস্থাটা যেন নোট করে রাখি। আমি তাই ভ্রমণ পত্রিকার যেসব পাঠক আমাদের সহধর্মী তাঁদের জন্য এইসব তথ্য সংগ্রহ করলাম।

আর্কটিক সার্কেলে অভিযানের জন্য এখানে বহু এজেন্সি আছে। অ্যাংকরেজের রাস্তায় যাদের চোখে পড়ছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই এস্কিমো, আর তারপরই আলেউটস ইন্ডিয়নাদের স্থান। ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকাংশই সাদা আমেরিকানদের হাতে। অ্যাংকরেজের আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানকার জাপানি দ্রব্য ও জাপানিদের আনাগোনা। বহু রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে জাপানি ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড নজরে পড়ছে।

আমরা অ্যাংকরেজের রাস্তা ও অলিগলি ঘুরে শেষে একটা ফোরহুইল ড্রাইভ ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম শহরগুলিতে। চুগাচ পাহাড়ের রাস্তা ধরলাম। এখানকার হাইওয়েতে ড্রাইভ করার মজা আছে। প্রশস্ত রাস্তা, লোকজন কম। বন ও পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য অভিযাত্রীদের উৎসাহিত করে। আমরা রাত নটা নাগাদ ফিরে এলাম। পরদিন আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। আমাদের দল ছোট হলে এই গাড়িটাই রেখে দিতাম ফেয়ারব্যাংকে যাবার জন্য।

১৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আজকের গন্তব্যস্থল ম্যাককিনলে পাহাড়। তিনশো আশি কিমি. পার হবার জন্য আমরা সকাল আটটার সময় ট্রেন ধরলাম। ট্যুরিস্টদের জন্য ঐতিহাসিক ট্রেনটাই সবচেয়ে সুন্দর, নামটাও চমৎকার 'ME KINLEY EXPLORER'। জানলার দুধারে দুটো করে সীট। চা, টোস্ট, কফি, বিয়ার, হুইস্কি, কোক, হামবুরগার সবকিছুই পাওয়া যায়। প্রতি ঘন্টায় ভেন্ডার যাতায়াত করছে। বাইরের দৃশ্য সত্যি চমৎকার।

পাহাড় আর সবুজ চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমির মধ্য দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। বলা বাহুল্য যে এখানকার বনজসম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই এলাকার নাম মাউন্ট ম্যাককিনলে ন্যাশনাল পার্ক। ট্যুরিস্টরা যেখানে সাধারণত যায় সেই জায়গাটার নাম ডেনালি পার্ক। অতি সুন্দর রঙিন পাহাড়ি উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে—আমরা একেক করে স্টেশনগুলোতে থেমে আবার চলতে লাগলাম। পার হলাম মনতানা, সানসাইন, তালকিতনা চেজ, কারী, গোল্ড ক্রীক। তারপর আমরা এসে পৌঁছলাম ডেনালি। এখন বিকেল চারটে। আমাদের এই সফর খুবই আরামের হয়েছে। সাইট সিয়িং করতে করতে সময় কেটেছে। আজ রাতে এখানে ছোট্ট একটা কাঠের বাড়িতে উঠলাম। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে পাশের রেস্টুরেন্টে। আমরা মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামে নাম হিলি। গ্রামের লোকেরা সবাই এস্কিমো। ট্যুরিস্ট ভিলেজ, এখানে সবকিছুই পাওয়া যায়। নদীতে চলার জন্য ছোট বোট। পাহাড়ি এলাকার জন্য ছোট জিপ। আর অনেক হেলি-এজিন্সি অর্থাৎ মাউন্ট ম্যাককিনলে প্রদক্ষিণ করার জন্য হেলিকপ্টার। ছোট ছোট স্কি-প্লেনও রয়েছে।

গ্রামটা পার হতেই নজরে পড়ল অনিন্দ্যসুন্দর মাউন্ট ম্যাককিনলে। উচ্চতা ছ'হাজার দুশো মিটার। হিমালয়ের কাছে ছেলেমানুষ। মাউন্ট ম্যাককিনলে উত্তর আমেরিকা ও কানাডার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, আমেরিকানদের গর্ব। এভারেস্ট যাবার আগে এরা সবাই আসে এখানে ট্রায়াল দিতে। কুড়ি হাজার তিনশো কুড়ি ফুট উচ্চতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে বারোমাসই বরফে ঢাকা থাকে। আর এই পাহাড়ি অঞ্চলে ভাল্লুক, বনবিড়াল আর নানা ধরনের পাখিতে ভরা। নদীর জলে অসংখ্য মাছ কিলবিল করছে। মাউন্ট ম্যাককিনলেতে চড়া সহজ নয়, পাহাড়টা হঠাৎ যেন ওপরে উঠে গেছে। এখানকার বরফ গলা জলে সৃষ্টি হয়েছে ইউকোন নদী। আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম নদী। এর দৈর্ঘ্য এক হাজার নশো ঊনআশি মাইল (1979 miles)। আমেরিকার বৃহত্তম নদী ম্যাককিনলে। আমরা এখানে দুটো জিপ ভাড়া করে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ালাম। ডেনালি পার্ক ও মাউন্ট কিনলে ন্যাশনাল পার্কের মোট আয়তন প্রায় তিন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল। সাঁইত্রিশ রকমের জীবজন্তু আর একশো বত্রিশ রকমের পাখি এখানে আছে, বছরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ট্যুরিস্ট আসে। আমরা সূর্যাস্তের রঙিন অপরূপ শোভা দেখে মন ভরালাম। ম্যাককিনলে পাহাড়ের সৌন্দর্যকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে তুলনা করা যায়। চিরতুষারাবৃত মাউন্ট ম্যাককিনলের সৌন্দর্য আমি লিখে বোঝাতে পারব না, তাই এই প্রসঙ্গে এখানেই থামতে বাধ্য হলাম। ডেনালি স্থানীয় নাম, মানে মহৎ। ডেনালি থেকে মহান ম্যাককিনলের সৌন্দর্য দেখা যায় বলে এই স্থানের নাম ডেনালি। আমরা কাঠের ঘরে ফিরলাম রাত দশটায়। দূর থেকেই ম্যাককিনলেকে প্রণাম জানালাম।

১৪ জুলাই, শুক্রবার

ডেনালি থেকে আমরা খুব ভোরের বাস ধরলাম। ডেনালি-ফেয়ারব্যাংক ১৯০

কিমি.। সুন্দর পাহাড়ি উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। ভোরবেলাতেই দেখতে পেলাম প্রথম ভাল্লুকের দল। তিনটে ভাল্লুক আমাদের দিকে চেয়ে বিদায় জানাচ্ছে। বাসের ড্রাইভার নিজেই ভালো গাইড, যেতে যেতে আমাদের বিভিন্ন জায়গার বর্ণনা দিতে লাগল। আমরা এখন সরাসরি উত্তরের দিকে যাচ্ছি অ্যাংকরেজ-ফেয়ারব্যাংকস হাইওয়ে ধরে। আর্কটিক সার্কেলের অনেক দূরে আমরা আছি। বাষট্টি ডিগ্রি অক্ষাংশের থেকে যাচ্ছি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের দিকে অর্থাৎ সরাসরি উত্তরে। অতি সুন্দর রাস্তা। আমাদের বাস যাচ্ছে ঘন্টায় আশি কিমি. স্পিডে। ব্রেকফাস্টের জন্য থামলাম সামিট ব্রড পাস-এ। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস, কনকনে শীত। আধঘন্টা পর আমরা আবার রাস্তা ধরলাম। বাসের যাত্রীরা অধিকাংশই এস্কিমো আর বাকি আলেউটস ইন্ডিয়ান আর আমরা বাইরে থেকে এসেছি প্রায় এগারোজন যাত্রী আমাদের গ্রুপের ৭ জন সমতে। আমরা বারোটার আগেই ফেয়ারব্যাংকস এসে পৌঁছলাম। শীতের সময় লাগে প্রায় দশ ঘন্টা, তুষারপাতে রাস্তা ঢেকে যায়।

ফেয়ারব্যাংক্স্

ফেয়ারব্যাংক্সে বেশ কয়েকটা ভালো হোটেল আছে। আমাদের কনট্র্যাক্ট হয়েছে ওয়েস্টমার্ক গ্রুপের সঙ্গে তাই আমরা উঠলাম ওয়েস্টমার্ক ইন-এ। (WESTMARK INN, 1521 S GUSHMAN 99701, FAIRBANKS, ALASKA) আমরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য ইউনিভার্সিটি। ফেয়ারব্যাংকস অ্যাংকরেজের তুলনায় ছোট বটে কিন্তু মনে হয় আলাস্কার মূল শিক্ষাকেন্দ্র। ড্রাইভার আমাদের একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে নিয়ে এল, নিচে দেখা যাচ্ছে সুন্দর একটি নদী, নাম চেনা নদী। মূল শহর থেকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পাঁচ মাইল। একটা পার্কিংয়ে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। সামনেই একটা প্রস্তরফলকে নাম লেখা University of Alaska। আমাদের দেখা করতে হবে Arctic Studies Institute-এর Departmental head Professor Alfred Mitson-এর সঙ্গে। অতি সুন্দর বাড়ি। Professor Mitson এক জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। তার সেক্রেটারিকে তিনি সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, কাজেই আমাদের কোনও অসুবিধা হল না। এখান থেকে আমাদের পরবর্তী ধাপ ব্যারো। আলাস্কার সর্বোত্তম শহর। ব্যারো আর্কটিক সার্কেলে। ভীষণ শীত বলে আমাদের অনেক তথ্য দরকার, তাপমাত্রা, একপ্লোরিং গ্রাউন্ড, কমিউনিকেশন, মানুষের সহ্যশক্তি, ডগ শ্লেড ইত্যাদি। আলাস্কার এই Arctic Studies Institute, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্লেসিয়ার ল্যাবরেটরি। এখানেই আমরা জানলাম যে ফেয়ারব্যাংকসের আলাস্কা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে এই শহরের প্রধান আকর্ষণ। এই ইউনিভার্সিটিতে সব ডিপার্টমেন্টই আছে বিশেষ করে এখানকার বিভিন্ন অয়েল ফিল্ড, ল্যাবরেটরি এই ইউনিভার্সিটিরই অন্তর্ভুক্ত। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম যখন শুনলাম যে এই ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব অ্যানথ্রোপলজি জগৎবিখ্যাত। সেক্রেটারি আমাদের বললেন, এখানকার বিভিন্ন অয়েল ফিল্ডে খনন

কাজ করতে গিয়ে প্রায় তিনশো প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কোনও কোনওটা প্রায় বারো হাজার বছরের পুরনো। যদি সময় থাকে তাহলে অবশ্যই যেন ওই ডিপার্টমেন্ট দেখে আসি। দুঃখের বিষয় আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। তাই বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে আমরা দুদলে ভাগ হয়ে পড়লাম। জঁপিয়ার, বেয়াট, আর সের্জ ইনস্টিটিউটে থেকে গেল আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য। আর বাকি চারজন বেরিয়ে পড়লাম অন্যদিকে।

এবার আমরা রওনা দিলাম NORD Air Force Base-এর উদ্দেশে, ব্যারো আমেরিকার নর্থমোস্ট পয়েন্ট জায়গাটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়ার মধ্যে পড়ছে তাই আমাদের প্রয়োজন স্পেশ্যাল এন্ট্রি পারমিট। আধঘন্টার মধ্যেই আমরা NORD regional Combad Centre-এর গেটে এসে পড়লাম। মিলিটারি এলাকা হলেও ওদের আপ্যায়ন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। রেফারেন্স লেটার দেখাতেই আমরা চেয়ারে বসার অধিকার পেলাম। ওদের ভদ্রতা ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের কাজ হল না কারণ চিফ অভ কম্যান্ড উপস্থিত নেই। কাজেই সকাল দশটায় আসতে হবে। কাল আসব বলে বিদায় জানালাম।

আমরা সন্ধ্যে সাতটার সময় সবাই আবার বসলাম আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সংগৃহীত তথ্য বিনিময় করলাম। হোটেলের ম্যানেজার নিজেই আমাদের সব রকমের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যদি সব ঠিকমতো হয় তাহলে কাল বিকেলেই আমরা ব্যারো যাত্রা করতে পারব। ফেয়ারব্যাংকসে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস্ অ্যান্ড স্টাফ, অয়েল ফিল্ড আর মিলিটারি বেস—এই তিনটের প্রভাব ও অবস্থানে এখানকার আবহাওয়াটা ঠিক মনের মতো লাগছে না তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেয়ারব্যাংক ছাড়ার কথা ভাবতে লাগলাম।

১৫ জুলাই, শনিবার

আজকের দিনটা ভালো, শনি ও রবি ছুটির দিন, তাসত্ত্বেও সকাল দশটায় চিফ অব কম্যান্ড অফিসে এসে আমাদের স্পেশ্যাল পারমিটে সই করে দিলেন। ফেয়ারব্যাংকসকে আমি ট্যুরিস্ট টাউন বলব না। এটি একটি কর্মব্যস্ত পাহাড়ি শহর। আজকাল পেট্রোলের জন্য বিখ্যাত, আগে সোনার জন্য বিখ্যাত ছিল। সোনার সন্ধানে আগে আভানচুরিয়ের দল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসত। আজও তার প্রচুর নিদর্শন আছে।

ফেয়ারব্যাংক থেকে ব্যারোর দূরত্ব প্রায় এক হাজার একশো চল্লিশ কিমি.। সরাসরি কোনও রাস্তা নেই। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা হেলিকপ্টার বা প্লেন। আমরা অ্যাংকরেজ থেকে আলাস্কান এয়ারওয়েজকে রিকনফার্ম করেছিলাম, কাজেই তাদের টেলিফোন করতেই তারা জানিয়ে দিল কোনও অসুবিধা নেই। আবহাওয়া ভালো আছে।

বেলা ১টা ১২ মিনিটে আমাদের নিয়ে ছোট্ট ফ্লোটিং প্লেন ছাড়ল। ফ্লোটিং প্লেনের সুবিধা হচ্ছে যে ল্যান্ডিংয়ের জন্য রানওয়ের দরকার নেই। যে কোনও জলাশয়ে অনায়াসে সে নামতে পারে। প্লেনে দশ জনের সীট, আমরা সাত জন। এটা প্রাইভেট ফ্লাইট, ফেয়ারব্যাংক থেকে ব্যারো যাতায়াতের জন্য মাথাপিছু লাগে চারশো ডলার। আমরা প্লেন থেকেই দেখতে লাগলাম ফরেস্ট লাইন, ইউকন নদী, পাহাড়ি সৌন্দর্য আর বরফে ঢাকা বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাস্কার দয়ন ডিস্ট্রিক্ট ছেড়ে ঢুকলাম আর্কটিক স্লোপে। আমরা দুটো চল্লিশে এসে পৌঁছলাম উত্তর আমেরিকার সর্বোত্তর শহরে।

ব্যারো

আমাদের ফ্লোটিং প্লেন বোফর সী-র এলসন লাগুনের জলে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কোস্টগার্ড বোট আমাদের স্বাগতম জানাল। বন্দরে এসে পাসপোর্ট ভিসা এক্সপ্লোরিং পারমিট দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের ছেড়ে দিল। যতটা ঠাণ্ডা ভেবেছিলাম তার থেকে কম ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ব্যারো ছোট্ট মিলিটারি শহর। আমাদের হোটেলের নামটাই চমৎকার TOP OF THE WORLD HOTEL ছোট্ট সাজানো কাঠের বাংলো। ব্যারোতে মাত্র তিনটে হোটেল। লোকসংখ্যা সবসুদ্ধ তিন হাজার। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। আমাদের হোটেলের ম্যানেজার নিজেই গাড়িতে করে আমাদের ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন, মিনিবাসের ভেতর থেকে আমরা সুন্দর শহরটি দেখতে লাগলাম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আমরা এখন আর্কটিক সার্কেল থেকে তিনশো পঁয়ত্রিশ মাইল আরও উত্তরে চলে এসেছি। এই শহরে সবাই এস্কিমো। তুন্দ্রা অঞ্চলের এস্কিমোরা গরমের সময় এখানেই চলে আসে। শীতের সময় এখানে সূর্যের মুখ কেউ দেখতে পায় না। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে রাত্রি। আজকাল মিলিটারি এরিয়ার জন্য এই শীতের তিনমাসে রকেট লাইটয়ের বন্দোবস্ত থাকে। আমরা সাইট সিয়িং করে হোটেলে ফিরে এলাম সন্ধ্যে সাতটায়। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের খুব যত্ন করে এখানকার নামকরা গোল্ডেন হোয়েল-এর রোস্টেড মাংস খাওয়ালেন। আমাদের সঙ্গে প্লেনের পাইলট ও কো-পাইলট এই হোটেলেই উঠেছেন। তারা কালকে ফিরে যাবেন। আবার আসবেন আমাদের নিতে।

প্লোভার আইল্যান্ড

১৬ জুলাই, রবিবার

সকালবেলা আমরা প্রস্তুত হলাম আমাদের শেষ ধাপের জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য প্লোভার আইল্যান্ডস। ব্যারো বন্দরে দেখলাম U.S. Coast Guard Glacier Cutter। শীতের সময় এই আর্কটিক সাগরের জল যখন জমে বরফে পরিণত হয়, তখন এই বরফ কাটা জাহাজ জল পরিবহণ ব্যবস্থা বজায় রাখে। অথবা যেসব জাহাজ বরফে আটকা পড়ে যায়, তাকে উদ্ধার করে। বন্দরের পূর্বদিকে বিরাট কারিবু পার্ক

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কারিবু অর্থাৎ বলগা হরিণ। তুন্দ্রা অঞ্চলের বলগা হরিণের ন্যাশনাল রিজার্ভ পার্কে হাজার হাজার হরিণ দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের শিংগুলো দেখার মতো।

বন্দর থেকে আমরা একটা বোট ভাড়া করলাম, বোট আমাদের চালাতে দেবে না তার জন্য আলাদা মিলিটারি কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি নিতে হবে, অনেক ঝামেলা। অবশ্য প্লোভার দ্বীপপুঞ্জের সব তথ্য আমাদের অজানা। সেদিক থেকে ভালোই হল। নাবিক সমতে বোট ভাড়া করলাম ঘন্টায় পাঁচ ডলার। আমাদের পুরো মালপত্র নিয়ে চারঘন্টার পর একটা ছোট্ট দ্বীপে আমাদের ছেড়ে দিয়ে বোট ফিরে গেল। কমিউনিকেশনের জন্য আমরা লোকাল কোস্ট কার্ডের ওয়েভ লেনথ ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছি। লেনকস দ্বীপে পৌঁছেই রেডিও ফোনে জানিয়ে দিল আমাদের অবস্থান মালপত্র সব ঠিক আছে। আমাদের শরীর এবং মন ভালোই আছে।

এই দ্বীপের সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানকার পাথর, মাটি বলতে এখানে বিশেষ কিছু নেই। জলে খাওয়া পাথরগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় ভাঙা গ্লেসিয়ার, দ্বীপের উত্তরদিকে আর ভেতরের স্থির জলে এখনও বরফ গলেনি। আবহাওয়াটা নর্থ পোলের। তাপমাত্রা এখানে মাইনাস ফোর। শীতের সময় নেমে যায় মাইনাস ত্রিশ বা চল্লিশে। আমরা তাঁবু খাটালাম একটা ছোট্ট সমতল জায়গায়। হাওয়া একদম নেই জল স্থির ও পরিষ্কার। নিচের শ্যাওলাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাছের ঝাঁক নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর্কটিক সাগরে আমাদের প্রথম রাত্রি। রাতে এখানে টুইলাইটের জন্য একদম অন্ধকার হয় না, নরওয়ে ট্রমসো বা আরও উত্তরে যারা গেছেন তারা ভালোভাবেই আমাদের অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারবেন। দ্বীপের ছোট একটি শুকনো জায়গায় তাঁবু খাটালাম। তার পাশের শুকনো অংশটার আয়তন হবে পাঁচ বর্গমিটার। তাছাড়া উপায় নেই। হয় জল অথবা এবড়ো খেবড়ো অসমতল। দ্বীপ না বলে ফিওর্ড বলাই ভালো। তাঁবুর মধ্যে আমরা জিনিসপত্র রেখে মুন-বুট পরে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। তিন দলে বিভিক্ত হয়ে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। আজ রাতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে।

দ্বীপটা ছোট্ট, জল ও বরফের মিশ্রণ। শীত আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল রাতের আকাশ লাল হয়ে স্থির হয়ে গেল। আমরা প্রায় চারঘন্টা ধরে হেঁটে পরস্পরকে আবার খুঁজে পেলাম। হারাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ দ্বীপটা মনে হল খুব বেশি হলেও ৮-৯ কি.মি.র বেশি কিছুতেই নয়। ভোরবেলার দিকে আমাদের পা ঠাণ্ডা হতে শুরু করল তার মানে বুঝতে হবে আমাদের শরীরের উত্তাপ কমে আসছে। অর্থাৎ ক্যালরির মাত্রা কমে আসছে। তাঁবুতে ফিরলাম সূর্যপ্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে আমরা বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লাম।

১৭ জুলাই, সোমবার

পোলার সার্কেলে দ্বিতীয় দিন। বোটের হর্নে ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

দেখি সকাল ১১টা। তাঁবুর চেন টেনে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বেশ বেলা হয়ে গেছে। আগের দিনের শর্তানুযায়ী বোট ঠিক সময়েই এসে হাজির। সঙ্গে এনেছে দুটো বড় ফ্লাস্কে গরম কফি। বোটে উঠেই আমাদের দ্বিতীয়বার ব্রেকফার্স্ট হল। তারপর আবার তাঁবু গোটাবার পালা। সারারাত ধরে হেঁটেছি। ফলে শরীরের অবস্থা কাহিল। বোটের এস্কিমো নাবিকের কাছে শুনলাম রাতের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন বুঝলাম কেন শীত করছিল। প্লোভার আইল্যান্ড অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে গড়া, এখানে সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে, মেরুসাগরের কঠিন গ্লেসিয়ারের পাঁচিল নেই, এখানে আছে শুধু জলজ ঠাণ্ডা হাওয়া। আজকের দ্বীপটা অপেক্ষাকৃত বড়, একটা পাহাড়ের চারপাশে জল। জলের ধারে প্রচুর শ্যাওলা আর পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। বোটম্যান আমাদের পাগলামি নেশার কিছু প্রশংসা করে আবার কালকে আসবে বলে চলে গেল। আমরা যথারীতি তাঁবু খাটিয়ে যে যার নিজের ডায়েরি লেখা আরম্ভ করলাম। আমাদের চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা আর কনকনে শীত আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল যে আমরা এখন পৃথিবীর আরেক নতুন কঠিন প্রকৃতির সঙ্গে মোলাকাত করছি কালকের মতো, আজকেও আবার বেরিয়ে পড়লাম। এখন বিকেল ৫টা, সন্ধ্যের পর আস্তে আস্তে সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিমাকাশে। তারপর মনে হল সে যেন কোথায় আটকে পড়েছে, আর এগোতে পারছে না। গতকাল আকাশে মেঘের জন্য অস্তগামী সূর্য দেখতে পাইনি আজ আকাশ পরিষ্কার, আজ দেখছি রাত্রির সূর্য। গরমকালে এই দেশে সূর্যাস্ত হয় না। আমরা এখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের উত্তরাংশে পৌঁছেছি, তারই প্রমাণ। আজকে ফ্রেডের মুভি ক্যামেরা চলছে। আমরা পাহাড়ি রাস্তা ধরলাম। রাতের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস আরও প্রখর হয়ে উঠল। আমাদের থার্মোমিটারে হঠাৎ দেখি মাইনাস আট ডিগ্রি সেলসিয়াস। আনোরাকের কলার তুলে দিলাম মাথার টুপি লাগিয়ে নিলাম তাতেও মনে হয় ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই নেই। হাতের দস্তানায় মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা ঢুকছে। তারই মধ্যে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। বাতাস আরও জোরে বইতে শুরু করল, মনে হচ্ছে আমরা যত এগোচ্ছি ততই আমাদের বাধা দেবার জন্য প্রকৃতিদেবী শক্ত বাধা সৃষ্টি করছেন। শেষ রাতে সাড়ে এগারোটার সময় আমরা পাহাড়ের ওপর হাজির হলাম। এখান থেকে রাতের সূর্যের আরও এক রূপ দেখলাম। এখন রাত বারোটা, মনে হচ্ছে যেন সূর্যাস্ত দেখছি। মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের কয়েক মিনিটের পূর্বাবস্থা। সার্থক হল আমাদের পরিশ্রম। এখান থেকে মনে হচ্ছে বহু দূরে মহাসাগরে সূর্যাস্ত দেখছি। এখানে শেষ হল আমাদের স্ট্যামিনা টেস্ট।

রাত একটার সময় আমাদের বন্ধুরা হাঁপাতে হাঁপাতে গলদঘর্ম হয়ে আমাদের কাছে এসে বসে পড়ল। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ঘন। মুখের কারবন ডাই অক্সাইড গোঁফে লেগে সঙ্গে সঙ্গে জমে গিয়ে সাদা বরফে পরিণত হতে লাগল। ডাঃ সের্জ বাঁসাতো সবাইকে সাবধান করে যতটা সম্ভব মুখ ঢাকা দিয়ে রাখতে বললেন। শীত

খুব বেশি নয় কিন্তু এই ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি বুকে ঢুকলে অবস্থা কাহিল হবে। আমরা আরও একঘন্টা সেখানে কাটিয়ে অন্যদিক দিয়ে অর্থাৎ সূর্যকে সামনে রেখে নিচে নামতে শুরু করলাম। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ আমাদের কাছে এখন ধাঁধার মতো। আমরা দিকবিচার না করে নিচের দিকে এগোতে লাগলাম। বাতাস এখন আমাদের পিছনে। ভীষণ ঠাণ্ডা থেকে মুখ রক্ষা পেল। আমরা যখন পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছলাম তখন হঠাৎ দেখি সূর্য আবার প্রখর হতে শুরু করেছে। নিচে নামতে লাগল প্রায় আড়াই ঘন্টা। যারা নেপালের মনকামনা পাহাড়ে দেবীপীঠে গিয়েছেন তারা এই পাহাড়ি রাস্তার কথা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। তবে নেপালের সেই অঞ্চলে এখানকার মতো শীত নেই। মনকামনায় আছে সবুজ বনভূমি আর এখানে শুকনো ন্যাড়া পাথর শুধু পথের দূরত্ব ও ওঠানামা একই রকম।

১৮ জুলাই, মঙ্গলবার

আমরা আবার তাঁবুতে ঢুকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল বিরাট একটা দুর্যোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। সের্জ সকলের প্রেসার ও থরো চেক আপ করে আমাদের স্লিপিং ব্যাগে যেতে নির্দেশ দিল। ভীষণ ক্লান্তিতে দুমিনিটের মধ্যেই সবাই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রায় বারোটার সময় আবার বোট এল আমাদের নিতে, শরীর যেন কিছুতেই জাগতে চাইছে না। মনে হচ্ছে এই সময় তাঁবুর বাইরে আমাদের টেনে আনা আর অর্ধমৃতদের সঙ্গে আলোচনা করা একই কথা। ঘুমের ঘোরেই আমরা তাঁবু গোটালাম। বোটে বসে গরম কফি খেয়ে ক্লান্ত দেহটাকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তুললাম।

আমাদের বোট আরও এগিয়ে চলল। জঁপিয়ারের সঙ্গে বোটম্যানের কী কথাবার্তা হল বুঝলাম না। বোট এগোতে লাগল। একঘন্টা চল্লিশ মিনিট চলার পর বোটের মোটর হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বোটম্যান আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা তার ইশারা অনুযায়ী তাকিয়ে দেখি একটা সাদা বিরাট ভাল্লুক তার তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। দুধের মতো সাদা। আমাদের সামনের দ্বীপটা মাত্র কুড়ি মিটার দূরে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পোলার বিয়ার, নর্থ পোলের সাদা ভাল্লুক। বোটম্যান এখানকার এস্কিমো। সে ভাল্লুকের চলা দেখে তার চরিত্র বুঝতে পারে। এই সাদা ভাল্লুকটা মা-ভাল্লুক। সে তার বাচ্চাগুলোকে চোখে চোখে রাখে। কারণ বাচ্চা ভাল্লুককে একলা পেলে মদ্দা ভাল্লুক তাকে আক্রমণ করে ও মেরে তার মাংস খায়। এই ভাল্লুকগুলো খুব সাংঘাতিক। প্রায় তিন বছর শাবকগুলো মার সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভালো সাঁতার কাটে, এদের প্রধান খাদ্য মাছ। বড় ভাল্লুকগুলোর ওজন নশো থেকে এক হাজার কিলোগ্রাম। সাধারণত এস্কিমোদের আক্রমণ করে না। আজকাল আন্তর্জাতিক আইনবলে এই ভাল্লুক শিকার করা নিষিদ্ধ।

আমরা ঘুমের ঘোরে তার অর্ধেক কথা শুনলাম, অর্ধেক কথা বুঝলাম না।

ব্যারোতে আমরা ফিরে এলাম বিকেল পাঁচটায়। হোটেলে ঢুকে গরম গরম সালমন মাছের ঝোল খেয়ে সরাসরি বিছানায় পড়লাম—আঃ কি আনন্দ!

১৯ জুলাই, বুধবার

গত দুই রাতে ঘুম হয়নি আর সারারাত ট্রেকিং করার দরুন শরীরের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। আর অন্যদিকে ঠাণ্ডা বাতাস রোমকূপের মধ্য দিয়ে দেহটাকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। উৎসাহ উত্তেজনায় মনটা ভীষণভাবে মেতে উঠেছিল। আজকে তাই আমরা সবাই নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে একমাসের পথ আমরা দুদিনে পার হয়েছি। আইল্যান্ডের অন্যদিকে আরও মেরু-ভাল্লুক দেখার পরিকল্পনাকে বাদ দিতে হল। এবার ফিরে যাবার পালা। ব্যারোর মিলিটারি কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম তাদের সহযোগিতার জন্য। বিদায় জানালাম উত্তর আমেরিকার সর্বোত্তর শহরকে।

আমাদের ফ্লোটিং প্লেন ঠিক সময়েই এসে হাজির হল এলসন লাগুনে। কোস্টগার্ডের বোট আমাদের পৌঁছে দিল প্লেনে। আমাদের আলাস্কার গ্লেসিয়ার রুট ভ্রমণের এখানেই সমাপ্তি। আমরা এখন ফিরে চললাম সরাসরি অ্যাংকরেজে। ফেয়ারব্যাংকসে ফিরব না। অ্যাংকরেজ থেকে আমরা ফিরে যাব আমেরিকান এয়ারলাইন্স-এর প্লেনে সরাসরি ভ্যাংকুভার। আসার পথ ছিল দীঘ আর কষ্টসাধ্য, ফেরার পথ ঠিক বিপরীত। খুব কম সময়ে কম দূরত্বে আকাশপথে পৌঁছে যাবে ভ্যাংকুভার, তারপর সেখান থেকে জেনেভা।

আলাস্কা : কিছু তথ্য

আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম স্টেট। যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ বা স্টেট হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আলাস্কায় যেতে হলে কানাডা পেরিয়ে যেতে হবে আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে উত্তরাংশে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আয়তন ও আয়ের দিক থেকে বিচার করলে আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আলাস্কার মূল উৎপন্ন দ্রব্য পেট্রোলিয়াম, ন্যাচারাল গ্যাস, সী ফুড প্রসেসিং আর ট্যুরিজম। বলা বাহুল্য যে, আলাস্কা একটি বিশাল দেশ। লোকসংখ্যা মাত্র চার লক্ষ। লোকসংখ্যা কম হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অত্যধিক শীত। আর্কটিক সার্কেলের কাছাকাছি ফিওর্ড আর পাহাড়ে ঘেরা পৃথিবীর এই অঞ্চলটি আজও সাধারণ পর্যটকদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এখানকার বাসিন্দারা নিজেদের আমেরিকান বলে না, আলেউটস বা এস্কিমো বলে দাবি করে।

আলাস্কার পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দাদের বলে আলেউটস। আলাস্কা তাদেরই দেওয়া নাম, মানে বিরাট দেশ। আলেউটস দ্বীপপুঞ্জের বিস্তার প্রায় এগারোশো মাইল। আলাস্কার এই অংশটাই লেজের মতো সরু হয়ে গিয়ে ডেট লাইনে মিশেছে। আলাস্কার নাম শুনলে অনেকেরই আর্কটিক সার্কেলের কথা মনে হয়, কিন্তু আলাস্কার সবটা বরফে ঢাকা নয়। আলাস্কার মাত্র শতকরা তিনভাগ অর্থাৎ কুড়ি হাজার বর্গমাইল বরফে ঢাকা, অধিকাংশ গ্লেসিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ আলাস্কায় অবস্থিত, আলাস্কার সবচেয়ে উঁচু পর্বত ম্যাককিনলে। উচ্চতা ৬১৯৪ মিটার। আমেরিকার পর্বত অভিযাত্রীরা মাউন্ট ম্যাককিনলেতে আসে তাদের স্ট্যামিনা টেস্ট করার জন্য। কাছাকাছি শহরের নাম তালকিতনা সেখানে থেকেই শুরু হয় পর্বত অভিযান। যেমন, নামচেবাজার এভারেস্ট অভিযানের মূল ঘাঁটি। আলাস্কার দক্ষিণাংশ ও গ্লাসগো একই দ্রাঘিমাংশ ছুঁয়েছে। নর্থ পোলের থেকে দক্ষিণ আলাস্কার কেচিকান শহর বহু দূরে।

আলাস্কার শুকনো পাহাড়, অত্যধিক ঠাণ্ডা বাতাস, গ্লেসিয়ার, চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি আর ফিওর্ডের জন্য সাধারণত মানুষের পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে ট্রান্সপোর্ট আর বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশনের অভাব নেই। আলাস্কার বিভিন্ন শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রয়েছে আলাস্কান হাইওয়ে। জলপথে রয়েছে অসংখ্য ফেরি বোট, কারগো বোট, লং ডিসটেন্স ওয়াটার ওয়ে। আকাশপথে রয়েছে রেগুলার এয়ার সার্ভিস, চার্টার্ড ফ্লাইটস, মাউন্টেন ফ্লাইটস, আর্কটিক ফ্লাইটস ইত্যাদি। ছোট ছোট প্লেন ও হেলিকপ্টারের অভাব নেই, তবে খরচ বেশি। আলাস্কার বেরিং স্ট্রেট রাশিয়া থেকে আমেরিকাকে বিভক্ত করেছে। আলাস্কা

১৮৬৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আসে। তার আগে এই অঞ্চলটা ছিল রাশিয়ানদের দখলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কাকে কিনে নেয় প্রায় জলের দামে। প্রতি একর মাত্র দুই সেন্ট দামে। তখন রাশিয়ানদের জানা ছিল না যে এই আলাস্কার মাটিতে আছে সোনা আর ভূগর্ভে আছে অপর্যাপ্ত তেলের খনি। আলাস্কার পাইপ লাইন আর গোল্ড রাশ আজ রূপকথার গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্লেসিয়ারের আকর্ষণেই এই অভিযান। অত্যধিক তুষারপাতের ফলে তৈরি হয় বরফের শক্ত পাহাড়। ঠাণ্ডা জলবায়ুর কারণে অত্যধিক তুষারপাত হয় আর সেই তুষারে যদি অপেক্ষাকৃত বেশি তাপমাত্রা না পায় তাহলে গলবার সুযোগ পায় না। নরম তুলোর মতো সেই তুষার আস্তে আস্তে ওপরের তুষারপাতের ফলে জমাট বরফে পরিণত হয় এবং অভিকর্ষের ফলে মাটির সঙ্গে পাথরের মতো লেগে যায়। ওপর আর নিচের চাপের ফলে বরফ পাথরের আকার ধারণ করে। এইভাবে বরফের নদী ও হিমবাহ সৃষ্টি হয়। তফাৎ হচ্ছে যে এই নদীর কোনও চঞ্চলতা নেই। অত্যধিক চাপের ফলে বা সূর্যের তাপে সেই বরফের মধ্যে, মাঝে মধ্যে ফাটল ধরে, আর ফাটল ধরার সময় বজ্রপাতের মতো শব্দ সৃষ্টি হয়। এই গ্লেসিয়ারের ফাটল উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে খুব সহজেই চোখে পড়ে। আলাস্কার অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুর থেকে এই গ্লেসিয়ার আর তার ফাটল দেখা ও শব্দ শোনার জন্যই আমাদের এই সফর।

বিমল দে। ১৯৪০ সালে কলকাতায় জন্ম।

ছোট বেলা থেকেই বাঁধন মুক্ত। বহুবার বাড়ী থেকে পালিয়ে ছুটে গেছেন সুদুর হিমালয়ের ডাকে, ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতের জানা অজানা তীর্থে তীর্থে। বহু সাধু ও যোগীদের সংস্পর্শে তাঁর জীবন হয়েছে ধন্য।

—১৯৫৬ সালে বিদেশীদের জন্য তিব্বতের দরজা তখন প্রায় বন্ধ। রাজনৈতিক কারণে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন, সেই সময় কোন রকম প্রস্তুতি না নিয়েই একদল নেপালী তীর্থযাত্রীর সাথে বিমল দে চলে গিয়েছিলেন সুদুর লাসায়। সেখান থেকে সেই দল ছেড়ে সম্পূর্ণ একা চলে যান মানস সরোবর ও কৈলাসে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। পরবর্তী কালে তাঁর সেই কৈলাস যাত্রার কাহিনী প্রকাশিত হয় 'মহাতীর্থের শেষ যাত্রী' নামক ভ্রমণ গ্রন্থে। বইটি ভ্রমণ সাহিত্যে একটি অমূল্য দান।

—১৯৬৭ সালে তিনি কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেন সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশ্যে। পকেটে মাত্র ১৮টি টাকা, মনে ছিল অদম্য সাহস। দীর্ঘ পাঁচ বছরে তিনি পৃথিবী পরিক্রমা করে দেশে ফিরে এলেন ১৯৭২ সালে। একটি সাংবাদিক সাক্ষাতে তিনি বলেন— 'বিশ্বই আমার বিদ্যালয়' জগতের মানুষ মাত্রেই আমার শিক্ষক, আমি ভারতীয় 'ভারতের দর্শন' রয়েছে ভারত দর্শনে। এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে সুখ দুঃখ আনন্দ বৈরাগ্য চারদিকে ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নাও যার যেমন রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে। ভূ-পর্যটক বিমল দে'র ডায়রী থেকে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতার কিছু অংশ 'সুদুরের পিয়াসী' নামক ভ্রমণ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে।

—"বিমল দে একজন সত্যিকারের পর্যটক, মানব দরদী এবং নিজগুণে দার্শনিক তো বটেই। তিনি বিশ্ব নাগরিক, মানবধর্মই তাঁর ধর্ম। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি বেশীরভাগ সময়ই ইউরোপে থাকেন এবং পর্যটন তাঁর নেশা ও পেশা। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি পরিপূর্ণ। পৃথিবীর চারদিক থেকে তাঁর ডাক আসে উপদেশ ও পরামর্শ পাবার জন্য। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত থেকে তিনি প্রায়ই পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। তিনি বহুগুণীর একাধারে পর্যটক, লেখক, দার্শনিক ও কর্মী। তিনি বার বার বলেন "এই পৃথিবীতে আমার জন্ম, এই পৃথিবীই আমার দেশ। দেশ দেখার 'ইচ্ছা শক্তি' যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জাগতিক বাধা, কিছুই তাকে বাধা দিতে পারেনা।"

—জিওগ্রাফিক্ সোসাইটি, সুইজারল্যান্ড
নিউজ্ লেটার থেকে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ

ফ্রাঁন্সের সামনি পার্বত্য শহরে ৫ই জুন। ২০০০ সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রী ও পর্যটক সম্বর্ধনা সভায় বিশ্ববরেণ্য এভারেস্ট বিজয়ী স্যার এড্‌মণ্ড হিলারী (৮১ বছর) ও ভূ-পর্যটক বিমল দে (৬০ বছর)

ছবি . সৌজন্যে "লা ডফিনে"